বিমল মিত্র

কলিকাতা-৯

এর নাম সংসার

বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা ভালো। তাতে এই একটা জিনিষ অন্ততঃ স্পষ্ট হয় যে আমরা এগিয়েছি না পেছিয়েছি। যদি এগিয়েই থাকি তো কতখানি এগিয়েছি, আর পেছোলেও তা কতখানি। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই একদিন সুরু করেছিলাম 'সাহেব বিবি গোলাম', তারপর তারই পরবর্তী যুগচিত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। আর তারপর সেই 'সাহেব বিবি গোলামে'র কলকাতাই আবার স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে কোথায় এসে পৌঁছুল তার পরিচয় 'একক দশক শতক'।

খণ্ডে খণ্ডে যখন ওই উপন্যাস-ত্রয়ী সমাপ্ত হলো তখনই আমার নজর পড়েছে গ্রাম-বাঙলার দিকে। যে-গ্রামবাঙলা আমরা বাল্যকালে দেখেছি, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সে-বাঙলার রূপটা কী রকম দাঁড়িয়েছে, তার একটা পরিচিতি থাকা দরকার মনে হয়েছে। সেই প্রয়াসের ফলই এই 'এর নাম সংসার'।

'এর নাম সংসার' লিখতে লিখতে অনেকবার মনে হয়েছে এই দুলালগঞ্জ বা কেষ্টগঞ্জ—যে গ্রামকে কেন্দ্র করে সেই গল্প গড়ে উঠেছে, সেও ঠিক স্বয়ম্ভূ নয়। কলকাতার যেমন একটা সুরু হওয়ার ইতিহাস আছে, দুলালগঞ্জেরও তাই। দুলালগঞ্জের আদি কাহিনী আগে লিখে নিয়ে 'এর নাম সংসার' লিখলেই অবশ্য ভালো হতো। কিন্তু তা হয়নি। তার প্রথম কারণ সে আদি কাহিনী অতি দীর্ঘ, সুতরাং তা সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বর্তমানে সেই আদি কাহিনীটি যন্ত্র-বদ্ধ। পরে যখন সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে তখন সেটি পটভূমিকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে শেষ দিয়েই সূত্রপাত সুরু হলো।

বিমল মিত্র

এবং
নর্ম
সংসার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্য জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি চার-পাঁচটি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকে।

এই সবে আরম্ভ হল। এই কেষ্টগঞ্জ থেকে আরম্ভ হল হরতনের গল্প। একদিকে হরতন আর কর্তামশাই, কর্তামশাই আর বড়গিন্নী, আর একদিকে দুলাল সাহা আর নতুন বৌ-এর গল্প। আর তাছাড়া এ বঙ্কুবিহারী আর অঞ্জনার গল্পও বটে। সবাই একলাই এসেছিল এখানে একদিন। একলাই সবাই এসেছিল আর কেষ্টগঞ্জে এসেই এ-গল্পের সব চরিত্র একদিন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কর্তামশাই, হরতন, বড়গিন্নী, দুলাল সাহা, আর নতুন-বৌ। এ তাদেরই গল্প।

বলতে গেলে কর্তামশাই-ই কেষ্টগঞ্জের আদি লোক। আদি এবং অকৃত্রিম। সাতপুরুষ আগেকার খবর কর্তামশাই-এর জানা নেই। কিন্তু তার পরের খবর আগে সকলকে ধরে ধরে শোনাতেন।

কর্তামশাই বলতেন—তোমরা তখন জন্মাও নি হে, আমরাও তখন জন্মাই নি, এ সেই যুগের কথা—

কথা বলতে গেলে কর্তামশাই-এর আর তালজ্ঞান থাকত না। আদি কুলজি ধরে টান দিতেন। আদিশূর কবে একদিন কাদের এনে বসতি করিয়েছিলেন এই গৌড়-বাংলায়। এ-বংশের মূল ছিলেন সেই ধর্মদাস দেবশর্মণঃ। তখন ইছামতী এইরকম ছিল নাকি? রাজ-পুরোহিত তিনি। তাঁর খাতিরই ছিল আলাদা। হাতীতে চড়ে রাজবাড়ি যেতেন। প্রতিদিন তাঁর বরাদ্দ ছিল একশো আটটি পদ্মপাতা। একশো আটটি পদ্মপাতার ওপর নৈবেদ্য সাজিয়ে তিনি তাঁর গৃহ-বিগ্রহ সিংহবাহিনীর পুজো করতেন। তারপর

রাজবাড়িতে গিয়ে শুরু হত ধর্মালোচনা। রাজা শুনতেন, পাত্র-মিত্ররা শুনতেন। রাত্রে ভাগবত-পাঠ হত। সেই ভাগবত-পাঠ হবার সময়ই একদিন এক কাণ্ড হল।

—কি কাণ্ড কর্তামশাই ?

যারা গল্প শুনত তারা অনেকবার শুনেছে ঘটনাটা। গৌড়েশ্বরের বুকটায় হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা করে ওঠে। আর তার পর থেকেই রাজ্যের দুর্দশা শুরু হয়। তারপর যুদ্ধ-বিগ্রহ মড়ক-মহামারী অতিক্রম করে কেমন করে কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্য-বংশ আবার ধনে-জনে বিলাসে-বৈভবে ভরে উঠেছিল কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য পর্যন্ত, সে-গল্পও সবাই শুনেছে অনেকবার। সেই কেদারেশ্বরের একমাত্র বংশধর কর্তামশাই। এই কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য। এ-গল্পের প্রধান বাহন।

আগে কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যের শ্রোতা ছিল। তখন সন্ধ্যেবেলা আসর বসত বৈঠকখানায়। পান, তামাক, দোক্তা, পিক্‌দানী থাকত। টানা-পাখা, আতরদান, দীপক-বাতি। সবই থাকত। এখন আর সে-সব কিছু নেই। কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য এখন আরও বুড়ো হয়ে পড়েছেন। নেহাৎ নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে এখনও, তাই বেঁচে আছেন বলা চলে। শুধু খড়মটা টেনে টেনে এখনও এসে বসেন ফরাসটার ওপর। তাও বিকেলের দিকে। একটু সন্ধ্যের আবছায়া নামতেই উঠে পড়েন। উঠে গিয়ে নিজের ঘরের পালঙটার ওপর শুয়ে পড়েন। আর হাঁপান। হাঁপানি ঠিক নয়। আর হাঁপানি হলেই বা কি করছেন! উপায় তো কিছু নেই? কোনও রকমে ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যান।

হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ হল। বড়গিন্নী নাকি ?

—কে ?

সেই সে-যুগের রাশভারি গলাটা তখনও ছিল। আগে গলার শব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে ভয় হত লোকের। আর তাছাড়া আগে

'কে' বলে ডাকলে সাড়া দেবার লোকও ছিল আশে-পাশে। হুকুম তামিল করবার হুকুম-বরদার ছিল। লোকে মানত। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে কর্তামশাই-এর কাছে পরামর্শ চাইতে আসত। আগে তাঁর ডাকে সাড়া না দিলে চাবুক খেতে হত দেউড়ির দারোয়ানের কাছে। এখন আর সে-সব নেই। বন-জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে। কাল-কাসুন্দির বন-জঙ্গল হয়ে গেছে সব জায়গায়। হাঁটা-চলা নেই। লোকজনের আনাগোনা নেই। যেন ভূতের বাড়ি হয়েছে ভট্‌চার্যি-বাড়ি। লোকে বলতো—হবে না, পুরুতগিরি করতে এসে রাজা হয়ে বসল। এ কী কপালে সয়? একটা ছেলে ছিল। কীর্তীশ্বর নিজের নামের ছন্দ মিলিয়ে তার নাম রেখেছিলেন সিদ্ধেশ্বর। কর্তামশাই ডাকতেন সিধে বলে। ভেবেছিলেন সিদ্ধেশ্বর বড় হয়ে মানুষ হবে।

—কে?

—আমি!

—ও! আমি ভাবলুম···

কী ভাবলেন কর্তামশাই কে জানে। সেটা আর মুখে উচ্চারণ করলেন না। বড়গিন্নী একেবারে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—তেল গরম করে এনেছিলুম—

—দাও, দিচ্ছ দাও, তবে ও আর ভাল হবে না।

বলে বুকের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন কর্তামশাই। রোজ শেষ রাত্রের দিকে কেমন যেন একটা টান ধরে বুকে। বড়-গিন্নী রোজই এই সময়ে আসেন। সরষের তেল গরম করে বুকের ওপর মালিশ করে দেন। তারপর যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখন দেয়াল-গিরিটা জ্বেলে দেন। তেল মালিশ করাতে করাতে অনেক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন কর্তামশাই। নাক ডেকে ওঠে। হয়তো স্বপ্ন দেখেন। সেই সব আগেকার দিনের স্বপ্ন। হঠাৎ যেন তাঁর চোখের

সামনে হাজার ঝাড়ের বাতিগুলো জ্বলে ওঠে। আবার গৌড়েশ্বরের রাজ-পুরোহিত ধর্মদাস ভট্চার্যির একশো আটটা পদ্মপাতার ওপর গৃহবিগ্রহের পুজোর নৈবেদ্য থরে থরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার শাঁখ বেজে ওঠে অন্দরমহলে। 'ছেলে হয়েছে।' 'ছেলে হয়েছে।' কেদারেশ্বর ভট্চার্যির বংশের একমাত্র শিবরাত্রির সল্‌তে। আবার কেষ্টগঞ্জের ঘাটে এসে নৌকো লেগেছে। কাশী থেকে এসেছেন শিরোমণি বাচস্পতি। পাইক-পেয়াদারা দৌড়ে গিয়েছে পাল্কি নিয়ে। পাল্কিতে করে তিনি এলেন রাজবাড়িতে। বিরাট পণ্ডিত। কাশীর রাজার পণ্ডিত। কেদারেশ্বর তাঁকেই ডেকে পাঠিয়েছেন ছেলের কোষ্ঠী গণনা করতে। তিনি জন্মপত্রিকা তৈরি করলেন। তারপর পাঠ। জাতকের কর্কটে বৃহস্পতি, লগ্নে চন্দ্র। এতচ্ছকীয় সৌরচৈত্রস্য পঞ্চমদিবসে সোমবাসরে অমাবস্যায়াংতিথৌ শুভযোগে চতুষ্পাদকরণে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রান্বিতে কুম্ভরাশৌ মঙ্গলস্য দ্বাদশাংশে যামার্ধে অশেষগুণালঙ্কৃত-পবিত্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভবস্য শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য মহোদয়স্য শুভাভিনব প্রথম কুমারঃ জাতঃ। শুভমস্তু!

কেদারেশ্বর তবু কিন্তু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন পণ্ডিত মশাই?

কাশ্মীর রাজার পণ্ডিত শিরোমণি বাচস্পতি। সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান। বললেন—এই সন্তান আপনার বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তবে চতুঃষষ্টি বৎসর বয়ক্রম কালে রাহুর দশা পড়বে। নীচ জাতীয় লোকের সংস্পর্শে সমূহ ক্ষতি, জাতককে সতর্ক থাকতে হবে—ওই বয়সেই যা কিছু অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

—কিসে অনিষ্ট রোধ হবে?

শিরোমণি বাচস্পতি বললেন—সে বহুদিন পরের কথা, তখন অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

কেদারেশ্বর আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—আর আয়ু? পরমায়ুর কথা বললেন না তো?

শিরোমণি বাচস্পতি বললেন—জাতক দীর্ঘায়ু।

কিন্তু সে তো চৌষট্টি বছর আগেকার কথা। তখন ভট্টাচার্য বংশের ধনদৌলতের প্রাচুর্য ছিল। সেই কেদারেশ্বর ভট্টাচার্যের একদিন কাল হল। তখন কীর্তীশ্বর শিশু। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিজন-গলগ্রহে পূর্ণ ছিল যে বাড়ি তা ধীরে ধীরে একদিন নির্জন হয়ে এল। কীর্তীশ্বর বিয়ে করেছিলেন। সন্তানও হয়েছিল। প্রাচীন ঐশ্বর্যের পুনরাবির্ভাব হবার আশাও ছিল। কিন্তু হয়নি তা। কেষ্ট-গঞ্জের বাজার যে আজকে ধনে-জনে মানুষ-জনের আনাগোনায় এমন গম্ গম্ করবে তা তখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ তাই-ই সম্ভব হয়েছে। এদিকটা দিনে দিনে নির্জন, নিরিবিলি, নিঃশব্দ, নিরানন্দ হয়ে উঠেছে, আর ওই বাজারের দিকটা কেবল দিনের পর দিন আরো সশব্দ, আরো শৌখীন, আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগেকার দিনে বাজারে চার-পাঁচটা দোকান ছিল। একটা মুড়কি-বাতাসার, একটা মাটির হাঁড়ির, একটা পাটের আড়ত। এমনি খুচরো কয়েকটা দোকান টিম্-টিম্ করে চলত। ওদিকে খেয়াঘাটে নৌকো এসে ভিড়ত ব্যাপারীদের। ধান, চাল, বাঁশ, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি আর খড়ের নৌকো। কোথায় কত দূরে যে সে-সব চালান যেত, তার ঠিক-ঠিকানা কেউ রাখত না। কীর্তীশ্বরও সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নায়েব-গোমস্তা ছিল, তারাই সে-সব খবর দিত। তাই তখন সব কানে আসত। আজকাল আর কিছুই জানতে পারেন না তিনি। নায়েব-গোমস্তা কেউই নেই। শুধু আছে নিবারণ সরকার। তা নিবারণও বুড়ো হয়ে গেছে। তারও চোখে ছানি পড়েছে।

নিবারণ দিনান্তে একবার করে আসে। ফরাসের সামনে একবার দাঁড়িয়ে দ্বিধা করে।

—কিছু বলবে ?

নিবারণ বলে—বলছিলুম, বাঁওড়টা জমা দেওয়ার কথা !

—কোন্ বাঁওড় ?

—হুজুর, পেঁপুলবেড়ের দরুন বাঁওড়।

—কে জমা নেবে ?

নিবারণ একটু ভয়ে ভয়ে মাথা নীচু করলে।

বললে—আজ্ঞে হুজুর, দুলাল সাহা—

বারুদের মুখে দেশলাই পড়লেও বুঝি এমন শব্দ করে ফেটে ওঠে না। দুলাল সাহার নামটার মধ্যেই বুঝি বারুদ লুকিয়ে ছিল। আর তর্ সইল না। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন কীর্তীশ্বর।

—সব খেয়েও এখনও বুঝি আশা মেটেনি নির্বংশের বেটার ! এখনও গরম মেটেনি ? আরো খেতে চায় ?

নিবারণ কী বলবে বুঝতে পারলে না। হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—যাও, সামনে থেকে দূর হয়ে যাও—

নিবারণ আর এক মুহূর্ত সামনে দাঁড়াতে সাহস পেলে না। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে কানের খাঁজে রাখা কলমটা ফস্ করে মেঝের ওপর পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিবারণ। তারপর বাইরের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা একেবারে একতলায় কাছারি ঘরে এসে ঢুকল।

নিতাই বসাক তক্তপোশের ওপর হাঁ করে বসে মিনিট গুণছিল, আর মাঝে মাঝে হাতঘড়িটা দেখছিল। নিবারণ ঘরে ঢুকতেই মুখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

বললে—কী হল ? কী বললেন কর্তামশাই ?

—রাজী হলেন না।

—তবু কী বললেন তিনি ? খুব ক্ষেপে গেলেন ?

নিবারণের হয়েছে জ্বালা। নিতাই বসাককেও চটাতে পারে না, কর্তামশাইকেও চটাতে পারে না। দুকূল বজায় রেখে চলতে হয় তাকে। আজ পনেরো বছর ধরে এমনি চালাতে হচ্ছে। অর্থাৎ সেই যেদিন কেষ্টগঞ্জের বাজারে দুলাল সাহা এসে আড়ত খুলেছে, সেই দিন থেকেই।

—তাহলে আমি সাহাবাবুকে ওই কথাই গিয়ে বলি, যে সাহা-বাবুর নাম শুনেই কর্তামশাই ক্ষেপে গেলেন ? বলি গিয়ে ওই কথা ?

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না, বসাকমশাই, ও-কথা বলবেন না, কর্তামশাই-এর এখন শরীরটা একটু খারাপ, তাই বললেন পরে বিবেচনা করে দেখবেন, আপনি একটু সা'বাবুকে বুঝিয়ে বলবেন আজ্ঞে, যেন কিছু না মনে করেন—

নিতাই বসাক বাজে কথা বলার লোক নয় অত। তারও সময়ের দাম আছে। সেই পনেরো বছর আগে যখন দুলাল সাহা বলতে গেলে রাস্তার ভিখিরি ছিল, অর্থাৎ রাস্তায় ঘুনসী ফিরি করে বেড়াতো, তখন থেকেই নিতাই বসাক দুলাল সাহাকে চিনতো। কতদিন দুলাল সাহার ভাত জোটেনি কপালে। দুটো মুড়ি চিবিয়ে ইছামতীর জল আঁজলা করে খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছে। সেই নিতাই বসাকই দুলাল সাহাকে মতলব দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এত বড় করিয়েছে। এই কেষ্টগঞ্জের বাজারে পাটের আড়ত খুলিয়েছে দুলাল সাহাকে দিয়ে। পাট থেকে তিসি, তিসি থেকে ধান। শেষকালে এবার চিনির কলও খুলতে চায়। সুগার-মিল। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা পেলে দুলাল সাহার একেবারে মনস্কামনা পূর্ণ হয় বোধহয়। এত পেয়েও আশা মেটেনি বেটার। এত খেয়েও পেট ভরে নি।

—কিন্তু একটা কথা আজকে তোমাকে বলে যাচ্ছি নিবারণ, ও বাঁওড় আমরা নেবোই।

নিবারণ হাঁ হয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বলল—আপনি রাগ করেন কেন বসাকমশাই, খামোকা রাগ করেন কেন ?

—রাগ করবো না ? ভালমানুষের মত একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলুম, তা তো তোমার কর্তামশাই শুনলেন না, শুনলে তোমার কর্তামশাই-এর ভালই হত, এই অভাব-গণ্ডার দিনে ছুটো কাঁচা টাকার মুখ দেখতে পেতেন, তা যখন তাঁর ইচ্ছে নয়, তখন আমরাও কী ব্যবস্থা করতে হয় তা জানি—

নিতাই বসাক উঠে যায় যায় প্রায়।

নিবারণ প্রায় শেষ চেষ্টার সুরে বললে—আপনি যেন এ-সব কথা আবার সা'বাবুর কানে তুলবেন না দয়া করে, আমি না হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখবো'খন—

—আর দেখতে হবে না তোমাকে নিবারণ, যা পারি আমরাই দেখাবো।

—আজ্ঞে, আপনারা দেখাবেন মানে ?

—মানে, আমরা পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নেবোই। তোমার কর্তামশাই-এর বাবার সাধ্যি নেই আমাদের আটকায়—এই তোমায় বলে রেখে গেলুম।

বলে হন্ হন্ করে নিতাই বসাক সদর দরজা দিয়ে একেবারে সোজা বাইরের দেউড়ির কালকাসুন্দির বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যিই, ছুলাল সাহা যেন কেষ্টগঞ্জের বাজারে ধূমকেতুর মত উদয় হয়েছিল। আর তার পর থেকেই কীর্তীশ্বরের বুকের এই টানটা

শুরু হয়েছে। সন্ধ্যে থেকেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় বুকের কাছটায়। তারপর যত রাত বাড়ে তত টানটাও বাড়ে। তখন বড়গিন্নী বুঝতে পারেন না। বড়গিন্নী মনে করেন বুঝি কর্তামশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আস্তে আস্তে মশারীটা খাটিয়ে চার পাশে ধারগুলো গুঁজে দেন ভাল করে। তারপর এক সময়ে নিজেও কর্তামশাই-এর পাশে শুয়ে পড়েন।

কিন্তু সেদিন কর্তামশাই একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

বললেন—ও কিসের গন্ধ আসছে বড়গিন্নী ?

—লুচি ভাজার।

লুচি ভাজার ! জিজ্ঞেস করলেন—এত রাত্তিরে আবার লুচি খাবার শখ হল কার ?

বড়গিন্নী বরাবরই কম কথার মানুষ। তিনি কিছু উত্তর দিলেন না।

কর্তামশাই আবার বললেন, কথা বলছ না যে ?

—কি বলব ?

—এই লুচি খাবার কার শখ হল এত রাত্তিরে ? আর লুচি যদি খাবার শখই হয় তো এত গন্ধ ছড়ায় কেন ? মনে হচ্ছে ঘি-টা ভাল—

বড়গিন্নী তবু কথা বললেন না। কিন্তু কর্তামশাই আর থাকতে পারলেন না। উঠলেন বিছানা ছেড়ে।

—আবার উঠছ কেন এই শরীর নিয়ে ?

কর্তামশাই রেগে গেলেন। বললেন—উঠব না তো কি করব ? দেখতে হবে না কার লুচি খাবার শখ হল ? এত রাত্তিরে এত ভাল ঘি পুড়িয়ে কোন্ বেটা লুচি খাচ্ছে ?

বলতে বলতে কর্তামশাই খড়ম পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে ডাকলেন—নিবারণ, অ নিবারণ—

কাছারি-ঘরের পাশেই নিবারণের শোবার ঘর। চটা-ওঠা মেঝে। চামচিকে আর আরশোলার রাজত্ব ঘরখানায়। আগে এ ঘরখানায় বৈঠকখানা ছিল। বড় বড় অয়েলপেন্টিং। তাও একটাও ভাল অবস্থায় নেই। মহারাজ ধর্মদাস ভট্টাচার্যের মুণ্ডুটা উইপোকায় কেটে ফুটো করে দিয়েছে। কেদারেশ্বরের সোনার গড়গড়ার নলের ওপর মরচে পড়ে আছে। মাকড়সার জাল জটিল হয়ে উঠেছে গৃহ-বিগ্রহ সিংহবাহিনীর পটের ওপর। ছেঁড়া তুলো-ওঠা গদির এক কোণে একটা ময়লা মশারী খাটিয়ে তখন শোবার উদ্যোগ করছিল নিবারণ। নিতাই বসাক দুপুর বেলাই বকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়াটা নিয়ে ক'দিন থেকেই আনাগোনা করছিল। সুগার-মিল করবে। দুলাল সাহা ক'মাস থেকেই বলছিল—কর্তামশাইকে বলেছ নাকি নিবারণ ?

নিবারণ বলেছিল—আজ্ঞে, বলতে আমার সাহস হয় না—

—কেন ? টাকা নেবে জমি বেচবে, চুকে গেল ল্যাটা ! এতে আর সাহসের কথা কি আছে ?

নিবারণ বলেছিল—আজ্ঞে সা'মশাই, আপনি তো কর্তামশাইকে চেনেন—

—তা জমি কি কর্তামশাই আগে বেচেন নি যে এত ভয় ? জমি বেচে-বেচেই তো তোমার কর্তামশাই পেট চালাচ্ছে এতদিন। আর আমি তো তোমার কর্তামশাইকে তার বাস্তুভিটে বেচতে বলছি নে—

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল—শেষকালে সেই-ই তো বেচতে হবে, তবু না-হয় একজন বাঙালীকেই বেচলেন তোমার কর্তামশাই।

তাতেও যখন কোন কাজ হয় নি তখন নিবারণের হাতে কিছু গুঁজে দিতে চেয়েছে দুলাল সাহা। টাকায় সব বেটা বশ হয় আর তুচ্ছ নিবারণ বশ হবে না ? টাকার মহিমার গোড়ার কথাটা

বুঝেছিল দুলাল সাহা অনেক দিন। সেই টাকা দিয়েই হাত করতে চেয়েছিল নিবারণকে।

—তুমি তো অনেক দিন চাকরি করলে নিবারণ, চাকরি করে চুল পাকিয়ে ফেললে। কিছু জমাতে পেরেছ এতদিনে? কিছু আখেরের কাজ করতে পেরেছ?

নিবারণ হেসেছিল শুধু। বলেছিল, আজ্ঞে, আমার আবার আখের। অনেক খেয়েছি কর্তামশাই-এর, অনেক ভোগ করেছি, এখন এ-বয়েসে আর আখেরের লোভ দেখাবেন না।

এমনি করেই এতদিন টানা-হ্যাঁচড়া চলছিল, আজ একেবারে কাটাকাটি হয়ে গেল। ভালই হল। এর পর আর দুলাল সাহাও ডাকবে না। নিতাই বসাকও দরবার করতে আসবে না। কেষ্টগঞ্জের বাজারের দিকে আর না গেলেই হল। নিবারণ মশারীটা খাটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ওপরে কর্তামশাই-এর ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়াল।

—নিবারণ, অ নিবারণ!

খড়মের শব্দটা নীচের দিকেই নামছিল।

নিবারণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

—যাই কর্তামশাই।

সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে কর্তামশাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—লুচি-ভাজার গন্ধ কোত্থেকে আসছে নিবারণ? এত রাত্তিরে কেষ্টগঞ্জে কার এত লুচি খাবার শখ হল জান?

—আজ্ঞে, দুলাল সাহার বাড়িতে।

—আমি ঠিক ধরেছি, দুলাল সা' বুঝি আজকাল পাড়ায় জানান্ দিয়ে লুচি খেতে শুরু করেছে? বড় বেয়াদপ তো!

নিবারণ বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, তা নয়। আপনাকেও নেমন্তন্ন করতে এসেছিল দুলাল সা'—আমি শরীর খারাপ বলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিই নি—

—ভালই করেছ। বেয়াদপদের সঙ্গে দেখা করার প্রবৃত্তি নেই আমার। তা কিসের নেমন্তন্ন ?

—আজ্ঞে দুলাল সা' দীক্ষা নিচ্ছে। গুরু করেছে যে! তাই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে—

কর্তামশাই হাসলেন কি ভ্রূকুটি করলেন বোঝবার উপায় নেই। বললেন, বেয়াদপের আবার দীক্ষা! চাষার আবার জামাই!

কথাটা বলে চলেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু কি ভেবে আবার দাঁড়ালেন। বললেন, তা ঘটা করে লোক খাওয়াচ্ছে কেন ? টাকা দেখাবার জন্যে ? টাকা না দেখাতে পারলে বুঝি ঘুম হচ্ছে না ? যত সব···

—আজ্ঞে না, ইনি মহাপুরুষ ব্যক্তি! শুনলাম দেবতুল্য মানুষ। এঁর দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

কর্তামশাই রেগে গেলেন।

—রাখ তোমার কথা। মহাপুরুষ আর লোক পেলেন না কেষ্টগঞ্জে, উঠতে গেলেন দুলাল সা'র বাড়ি! চামারের একশেষ! আসলে টাকা দেখানো। কেষ্টগঞ্জের লোককে দেখানো হচ্ছে—ওগো দেখ, আমার কত টাকা হয়েছে। আমি বুঝি নে কিছু ? আমাকে বোকা পেয়েছে ?

বলতে বলতে আবার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লেন। পড়েই হাঁপাতে লাগলেন। বড়গিন্নী চুপ করে বসে ছিলেন তখনও বিছানার পাশে। বললেন, জানালাটা বন্ধ করে দাও তো বড়গিন্নী, কি বিচ্ছিরি গন্ধ ঘি-এর, নাক জ্বলে গেল, যেন চামড়া পোড়াচ্ছে—

বলতে গেলে ভোরবেলা থেকেই দুলাল সা'র বাড়িতে উৎসব আরম্ভ হয়েছিল। উৎসব কাজে-অকাজে দুলাল সা'র বাড়িতে হয়েই থাকে। দুলাল সা'র বড় ছেলের বিয়েতেও কেষ্টগঞ্জের তাবৎ লোককে বলা হয়েছিল। এটা দুলাল সা'র নিয়ম।

দুলাল সা বলে—আরে, মানুষ দুটো ডাল-ভাত খাবে, তাতেই এই?

দুলাল সা হুকুম দিয়েছিল বাড়িতে এসে যে খেতে চাইবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। অতিথি নারায়ণ। মানুষকে অভুক্ত রেখে বিদায় দিলে নারায়ণ অসন্তুষ্ট হন। যত দিন যাচ্ছে, ততই দুলাল সা'র দেব-দ্বিজে ভক্তি বাড়ছে। আর ততই ফুলে-ফেঁপে উঠছে দুলাল সা'। একদিন ঘুন্‌সি ফিরি করে বেড়িয়েছে কেষ্টগঞ্জের ব্যাপারীদের কাছে। তখন আঁজলা করে জল খেয়ে পেট ভরিয়েছে। সে-সব দিন কেষ্টগঞ্জের বুড়ো মানুষেরা স্বচক্ষে দেখেছে। আর বটগাছতলাটায় শুয়ে থাকত। কতদিন রাস্তার কুকুরের সঙ্গে এক জায়গায় কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে রাতও কাটিয়েছে। তখন ক্ষিধে কাকে বলে জেনেছে। তখন ঘর-বাড়ি কাকে বলে তাও জেনেছে। কিন্তু দুলাল সা'র মনে আছে সব।

বলে—মনে থাকবে না? যে মনে না রাখে সে মহাপাতক, নরকেও তার ঠাঁই নেই হে—সে নরাধম।

দুলাল সা' কাছারি-ঘরের দাওয়ার বেঞ্চিতে বসে মালা জপ করে আর গল্প করে। আর এখন গল্প করা ছাড়া কাজই বা কী! সব

কাজ-কর্ম দেখাশোনার ভার নিয়েছে নিতাই বসাক। নিতাই বসাকও জুটে গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। নিতাই বসাকও তার মতন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত আর দু'টো পয়সার জন্যে দোরে দোরে হন্যে হয়ে ফিরত। লাজ-লজ্জার বালাই ছিল না নিতাই-এর। নিতাই-ই বলতে গেলে দুলাল সা'কে মহাজনী কারবারে নামিয়েছিল।

কিছু না। সামান্য তিরিশ টাকা মূলধন ছিল দুলালের। কেষ্টগঞ্জে যত ব্যাপারীদের নৌকো আসত তাদের কাছ থেকে এক আনা করে পয়সা জমা নিত দুলাল সা'। এক মাস পরে সেই ব্যাপারীই যখন আবার মাল নিয়ে আসত কেষ্টগঞ্জে, তখন আবার আর এক আনা। মাসে এক আনা পয়সা দিতে এমন আর কি?

মতলবটা নিতাই-এর। সবাইকে বলত—হরিসভার চাঁদা।

—হরিসভায় কি হবে?

—আজ্ঞে আপনারা আসেন এখানে, দিনমানে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, রাত্তিরবেলা একটু ভগবানের নাম হবে। পরকালের একটু কাজ হবে। পাপক্ষয় হবে।

কেউ-কেউ বলত—পাপ আর এমন কি করছি বলো না, জ্ঞানতঃ কিছু পাপ তো করি নি হে—

—বলেন কি ব্যাপারী মশাই? পাপ করছি না! অজান্তে কত মশা-মাছি মাড়িয়ে ফেলছি, কত নিরীহ পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলছি তার কি ঠিক আছে? এই তো সেদিন ঘরের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে একটা টিকটিকি চেপটে মারা গেল—তা এটা পাপ হল না? আর বেঁচে থাকাটাই তো পাপ সংসারে—

দুলাল সা'র অকাট্য যুক্তি। সেই হরিসভার চাঁদা তোলাটাই শেষকালে মূল ব্যবসা হল দুলাল সা' আর নিতাই বসাকের। দুলাল সা' ঘুম থেকে উঠে দু'টো মুড়ি চিবিয়ে জল খেয়েই ঘাটে গিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকত। আর ব্যাপারীদের নৌকো এলেই কোঁচার খুঁট খুলে দাঁড়াত। বলত—চাঁদাটা ছ্যান্ ?

মাত্র তো এক গণ্ডা পয়সা। কত দিকে কত পয়সা চলে যাচ্ছে ব্যাপারীদের। জল-পুলিসকেই এটা-ওটা কত দিতে হয়। কত অপচো-নষ্ট হয়। ইঁদুরে-বেরালে কত কী খেয়ে নেয়। আর বাক্যব্যয় না করে পয়সা চারটে দিয়ে দিত ব্যাপারীরা। কখনও কখনও জিজ্ঞেস করত—হরিসভা হল তোমাদের ?

দুলাল সা' বলত—আর দেরি নেই, এইবার ইঁট পোড়াতে হবে—

—আবার ইঁট কেন ? খড়ের আটচালা করলেই তো হয়।

দুলাল সা' জিভ কাটত—আজ্ঞে তা কি হয় ? ঠাকুর-দেবতার কাজ বলে কি অত অপগেরাহ্যি করতে আছে ? যা করবো ভালো করেই করবো আমরা—

ভালো করে হরিসভা করবে বলেই দেরি হতে লাগল। যত দেরি হতে লাগল তত চাঁদা উঠতে লাগল। যত চাঁদা উঠতে লাগল তত স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল দুলাল সা' আর নিতাই বসাকের। হরিসভার কাজ আরও জুতসই করে করবার জন্যে কর্তামশাই-এর জমির ওপর একটা চালাঘর করতে হল। কর্তামশাই হলেন প্রেসিডেন্ট। দুলাল সা' আর নিতাই বসাক হল সেক্রেটারি। রবার-স্ট্যাম্প হল। তখন কর্তামশাই-এর কাছে ঘন-ঘন যাতায়াত ছিল। কর্তামশাই-এর পায়ের ধুলো না পেলে জল গ্রহণই করত না দুলাল সা' আর নিতাই বসাক।

সে সব পনেরো বছর আগেকার কথা।

কর্তামশাই-এর কাছে গেলে আর ছাড়তে চাইতেন না তিনি। গৌড়েশ্বরের পুরনো ঐশ্বর্য, ধর্মদাস দেবশর্মণঃর কাহিনী, একশো আটটা পদ্মপাতার গল্প, হাতীতে চড়ে রাজবাড়ি যাওয়ার কথা—সব

কিছু শোনাতেন। শেষকালে বলতেন—তোমাদের যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে বলবে, আমি সব দেব—

বলতে গেলে এখন যেখানে দুলাল সা'র বাড়ি, এই জমিও কর্তামশাই-এর দেওয়া। হরিসভা করবার জন্যেই কর্তামশাই এই জমি দিয়েছেন।

কর্তামশাই বলতেন—ধর্ম লোপ পেয়েছে বলেই তো এখন বাঙালীর এই দুর্দশা—

দুলাল সা' কাপড়ের খুঁটটা গায়ে দিয়ে সামনে সবিনয়ে হাতজোড় করে বসে থাকত। বলত, আজ্ঞে, তা তো বটেই—

নিতাই বসাক বলত—সেই জন্যেই তো কর্তামশাই, ধর্ম নিয়ে পড়ে আছি দুই বন্ধুতে—

কর্তামশাই বলতেন—কত টাকা চাঁদা উঠল ?

দুলাল সা' বলত—এক আনা করে মাথাপিছু চাঁদা, কত আর উঠবে ? আজ পর্যন্ত সর্ব-সাকুল্যে পঁচাত্তর টাকা সাত আনা ত'বিলে জমা আছে—

—এত কম ?

—আজ্ঞে, কেউ কি দিতে চায়, জোর-জবরদস্তি করে ওই আদায় করেছি, তাই-ই ঢের বলতে হবে।

আর তার পরেই নিবারণের ডাক পড়ত। নিবারণকে বলতেন—কিছু টাকা এদের দিতে হবে নিবারণ। ত'বিল থেকে কিছু দাও তো এদের—

এমনি করে কত টাকা যে কর্তামশাই দিয়েছেন হরিসভার জন্যে, তার হিসেব কর্তামশাই-এর জানা না থাকলেও নিবারণের জানা আছে। শুধু কাঁচা টাকাই নয়, জমি বেচেছেন হরিসভার জন্যে। নিজের জবানীতে চিঠি লিখে দিয়েছেন কেষ্টগঞ্জের ব্যাপারীদের কাছে। কেষ্টগঞ্জের ক্ষেত-মজুররা, জোতদাররা পর্যন্ত এক আনা করে

মাসে-মাসে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হরিসভাও হয়েছিল একটা। পাঁচ বিঘে জমির এক কোণে একটা চালাঘর। সে এমন কিছুই না। টিম টিম করে দিন-কয়েক গান-টান হয়েছিল, অষ্ট-প্রহর হয়েছিল। একবার চব্বিশ-প্রহরও হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে সেই টাকা সুদে খাটিয়ে দুলাল সা' অত টাকার মালিক হয়ে যাবে তা কর্তামশাই কল্পনাও করতে পারেন নি। দুলাল সা' কেষ্টগঞ্জে হরিসভার চাঁদা তোলা নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকত, তখন নিতাই বসাক চাঁদা-তোলার নাম করে কলকাতায় যেত কাঁচা টাকা নিয়ে। সেখানে গিয়ে কি ফন্দী-ফিকির করে পাটের দালালীর ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হবার সুলুক-সন্ধান আবিষ্কার করে বসল তা কর্তামশাই জানতে পারেন নি। যখন জানতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একদিন কেষ্টগঞ্জের বাজারে পাটের আড়ত খুলে বসল দুলাল সা'। তার পর কোথা থেকে দু'জনে পরিবার ছেলে সব নিয়ে এল। পাঁচ বিঘে জমির ওপর বাড়ি হল পাকা। পাকা দালান উঠল তাদের কেষ্টগঞ্জে। কেষ্টগঞ্জের লোক হঠাৎ একদিন চোখ মেলে দেখলে, দুলাল সা' আর নিতাই বসাক লাখপতি হয়ে গেছে।

কর্তামশাই একদিন ডেকে পাঠালেন দুলাল সা'কে।

নিবারণ ফিরে এল। বললে, এখন পুজো করছেন দুলালবাবু, ওব্লা আসবেন—

কিন্তু ওবেলাও এল না দুলাল সা'। নিতাই বসাককেও ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। নিতাই বসাকও নেই কেষ্টগঞ্জে। সে-ও সেদিন কলকাতায় গেছে। এই রকম করে তাঁকে অপমান করেছে দু'জনেই। এমনি করেই দিনের পর দিন বছরের পর বছর কেটে গেছে। আর নিবারণের মুখ থেকেই দুলাল সা'র আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার খবর পেয়েছেন। দোতলার জানালা থেকে দুলাল সা'র দালানটা দেখা যায় বলে সে জানালাটাই বন্ধ করে দিয়েছেন পেরেক মেরে।

কিন্তু জানালায় পেরেক মারলে কি হবে, দুলাল সা'র খবর কেষ্টগঞ্জে চাপা থাকে না। দুলাল সা'র আড়তে হালখাতা হলে ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসি বাজে। দুলাল সা'র বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। গাঁয়ের একশো খানা বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়। দেখতে দেখতে দুলাল সা' আর নিতাই বসাক কেষ্টগঞ্জের গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল। কর্তামশাই-এর চোখের সামনেই সব ঘটল। আর কর্তামশাই এই পনেরো বছর ধরে কেবল ধাপে ধাপে নেমে চলেছেন। এখন তাঁর বাড়ির চারদিকে কালকাসুন্দির ঝোপ হয়েছে, একমাত্র ছেলে সিদ্ধেশ্বর নিরুদ্দেশ হয়েছে। পুত্রবধূটি মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত হরতন ছিল। তিন বছরের নাতনী কর্তামশাই-এর। সে-ও একদিন চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন হঠাৎ দুলাল সা' এসেছিল।

তখন দুলাল সা' বেশ ভারিক্কি হয়েছে। নতুন মোটরগাড়িতে চড়ে দুলাল সা' আর নিতাই বসাক এসেছিল কর্তামশাই-এর চণ্ডী-মণ্ডপে। এসেই দু'জনে কর্তামশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই কর্তামশাই পা সরিয়ে নিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, খবরদার, পা ছুঁয়ো না, বেয়াদবির আর জায়গা পাও নি?

দুলাল সা' মাথা নীচু করে বলেছিল, আপনি আমায় আজ যা বলবেন সব মাথা পেতে নেব, এই আপনার সামনে আমি মাথা পেতে দিলুম—

বলে দুলাল সা' সত্যি-সত্যিই মাথা পেতে দিলে।

কর্তামশাই বললেন, এবার কি মতলব বল তো? আবার হরিসভা?

—আপনার আর দশজনের চাঁদাতেই হরিসভা করেছিলাম

কর্তামশাই, সে-কথা আমি এখনও সকলকে বলি। বলি, কর্তামশাই না থাকলে আমার এই অগাধ ঐশ্বর্য, এই বাড়ি-গাড়ি কিছুই হত না—

কর্তামশাই বলেছিলেন, তুমি নির্লজ্জ আহাম্মক, তাই এমন করে বলতে পার, অন্য লোক হলে জিভ খসে যেত।

নিতাই বসাক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ চুপ করে। বললে, সবই তো আপনার আশীর্বাদে হয়েছে কর্তামশাই, আপনি কেন রাগ করেন ?

—রাগ করব না ? আবার বলছ রাগ করি কেন ? বেয়াদব কোথাকার ! সিদ্ধেশ্বরকে তোমরা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও নি ? সে যে আমার সঙ্গে কথা-বলা পর্যন্ত বন্ধ করেছিল, সে কাদের মতলবে শুনি ? আমার নাতনী মারা গেল, তাতেও আমি এক ফোঁটা কাঁদতে পারি নি, তা জান ?

দুলাল সা' বললে, আজ্ঞে সে-সব তো পুরনো কথা, চুকে-বুকে গেছে, এতদিন পরে সে-সব কথা আবার তুলছেন কেন ?

—তুলব না ? আমি কি সে-সব ভুলে গেছি মনে কর ? আমার এত সর্বনাশ করে আমার সামনে আবার মুখ দেখাতে এসেছ ? লজ্জা করে না তোমাদের ? দুটো টাকা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা জ্ঞান করেছ ?

নিতাই বসাক বললে, আজ্ঞে, আজকে দুলালের ছেলের বিয়ে, আপনি যদি গিয়ে না দাঁড়ান তো কে দেখবে ? আপনিই তো আমাদের সকলের ভরসা ?

—থাম, খুব হয়েছে।

বলে কর্তামশাই জোরে জোরে হাঁফাতে লাগলেন। তার পর নিবারণকে বললেন, নিবারণ, তুমি বলে দাও এদের, আমরা সারস্বত ব্রাহ্মণ, নীচ-জাতের বাড়িতে সারস্বত ব্রাহ্মণরা ভোজ খেতে যায় না,

ভোজ খাবার বামুন আলাদা পাওয়া যায়, তাদের বাজারে ভাড়া পাওয়া যায়।

বলে সেদিন কর্তামশাই তাদের মুখের ওপর খট্‌খট্‌ করে খড়ম পায়ে দিয়ে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সেদিনও লুচিভাজার গন্ধ এসেছিল হাওয়ায় ভেসে। সেদিনও ঘি-এর গন্ধে কষ্ট হয়েছিল কর্তামশাই-এর। হরিসভা করবার নাম করে চাঁদা তুলে লোক ঠকিয়ে যারা টাকা করে, তাদের টাকায় ধিক্, তাদের জীবনে ধিক্, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই কর্তামশাই-এর।

সেদিনও বড়গিন্নী পাশে শুয়েছিল চুপ করে। কর্তামশাই রেগে বলেছিলেন, জানালাটা বন্ধ করে দাও তো বড়গিন্নী, যেন চামড়া-পোড়া গন্ধ আসছে।

তা, কর্তামশাই সম্পর্ক রাখুন আর না রাখুন, তুলাল সা'র তাতে কিছু আসে যায় নি। নিতাই বসাকেরও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নি। লোকে ভুলে গেছে হরিসভার কথা। সেই ইছামতীর ধারে যেখানে তুলাল সা' কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে হরিসভার চাঁদা চেয়ে বেড়াত, সেখানেই এখন তুলাল সা'র মস্ত পাটের আড়ত হয়েছে। সেই সেদিনকার ব্যাপারীরাই এখন তুলাল সা'র সামনে হাত-জোড় করে থাকে। তুলাল সা' সারা কেষ্টগঞ্জের পাটের বাজার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি কিছুই বদলায় নি। এখনও সেই নদীর বাঁধানো ঘাটে রোজ ভোরবেলা তুলাল সা' যায়। সঙ্গে চাকর যায় গামছা-তেল-বালতি নিয়ে। প্রথমে পৈঠের ওপর বসে গায়ে মাথায় পায়ে সর্বাঙ্গে সরষের তেল মাখে। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা যে-কোনও ঋতুতে ভোর চারটের সময় ঘাটে গেলেই তুলাল সা'কে দেখা যাবে। নৌকোর ভেতর তখন সব ঘুমে অসাড়। সেই অত

রাত থাকতে দুলাল সা' সেখানে বসে ভাল করে সারা শরীরে তেল মাখবে। তার পর বালতি করে নদী থেকে জল তুলে নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে ঘাটের পৈঁঠেগুলো ঘষে ঘষে ধোবে। তার পর সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে নিজে নদীতে নেমে এক ঘণ্টা ধরে অবগাহন স্নান করবে। তারপর একে একে ব্যাপারীরা আসবে, কেষ্টগঞ্জের দোকানের লোকজন জাগবে। তখন স্নান শেষ হয়ে গেছে দুলাল সা'র।

—প্রাতঃপ্রণাম সা'মশাই।

—প্রাতঃপ্রণাম। কে? মুকুন্দ?

অন্ধকার ঝাপ্‌সা আলোয় ভাল করে দেখা যায় না। তবু গলা শুনেই বুঝতে পারে দুলাল সা'। কিন্তু দেখা হলেই সকলের খবরা-খবর নেওয়া চাই।

বলে, তোমার জামাই কেমন আছে মুকুন্দ? চিঠি পেয়েছ? হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার গাইটা বিইয়েছে নাকি? হরি, হরি, যাই, সবাই ভাল থাকলেই ভাল মুকুন্দ, হরি ছাড়া কোনও ভরসা নেই, জানলে হে মুকুন্দ, বিপদে আপদে ভবসাগরে হরিই একমাত্র কাণ্ডারী, যাই—হরি হরি।

তা দুলাল সা' মিথ্যে কথা বলে না। হরিই যে ভবসাগরে একমাত্র কাণ্ডারী এ-কথা দুলাল সা' নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে দিয়েছিল। নইলে, কি ছিল তার, আর কি হয়েছে। সেই হরিসভাটা এখনও আছে। সেটা লম্বা মানুষ-সমান ইটের পাঁচিল দিয়ে নিজের বাস্তুর সীমানার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। সেখানে এখন দুলাল সা'র গরু থাকে।

দুলাল সা' বললে, তোমরা তো বুঝবে না, তোমরা ভাববে সংসারে টাকাই সব, আরে সংসারে টাকাই যদি সব হত তো আমি ত্রিসন্ধ্যে হরিকে ডাকি কেন? না ডাকলেই তো পারতাম!

লোকে বলে, আজ্ঞে আপনি হলেন ভক্ত মানুষ! আপনার সঙ্গে কার তুলনা?

দুলাল সা' রেগে যায়। বলে, ওই তোমাদের এক কথা! ভক্ত হওয়া অত সোজা? ভক্তি-ভক্তি করে চেঁচালেই ভক্তি আসে? ভক্তির জন্যে কষ্ট করতে হয় না? ভক্তি কি গাছের ফল হে যে আঁকসি দিয়ে পাড়লাম আর খেলাম? ভক্তির জন্যে মেহনত লাগে না? তা হলে তো আমি হরিসভা করে কাজ-কর্ম ছেড়ে হরিনাম শুনলেই পারতাম। হরিসভা তুলে দিলাম কেন? বল তো হরি-বিলাস, তুমি বল তো, তুলে দিলাম কেন?

হরিবিলাস বলে, আজ্ঞে আপনার গরু রাখবার জন্যে!

—আরে দূর! তোমার হরিবিলাস নামটাই মিথ্যে! গরু রেখেছি কি দুধ খাবার জন্যে? গরুর দুধ আমি বাজার থেকে কিনতে পারি না? আমার পয়সা নেই?

—আজ্ঞে তা বলি নি আমি!

—দূর মূর্খ!

পাশেই কান্ত বসেছিল। সে অনেকবার কথাটা শুনেছে। উত্তরটাও তার জানা। সে বললে, আজ্ঞে গো-সেবা করার জন্যে।

দুলাল সা' হাসে। বলে, তুই মুখ্যু মানুষ, তুইও জানিস, আর হরিবিলাস জানে না। আরে, গো-সেবা আর হরিনাম-শোনায় কিছু তফাৎ আছে মূর্খ? দে, কত এনেছিস দে—

একদিকে ধর্মালোচনা চলে আবার মহাজনী কারবারও চলে। সুদের হিসেব-পত্র নিয়ে কড়া-গণ্ডা-ক্রান্তির হিসেবও চলে কাছারিতে। এটা দুলাল সা'র পরোপকার-বৃত্তি। কত দুঃস্থ লোক টাকার অভাবে ঘটি-বাটি বেচে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তাদের উপকারের জন্যেই এই মহাজনী ব্যবসা তার। নইলে এটাকে ব্যবসা বলাই ভুল। অন্যায়। দুলাল সা' রোজ রাত থাকতেই উঠে নদীতে

গিয়ে নিজের হাতে ঘাট ধুয়ে স্নান করতে নামে। তারপর চাকর বালতি নিয়ে ঝাঁটা নিয়ে উপরে দাঁড়িয়ে থাকে বাবুর জন্যে। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে তুলাল সা' সারা রাস্তা গঙ্গা-স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে বাড়ি আসে। তখন নতুন-বৌ পূজার যোগাড় করে তৈরি থাকে। বাড়িতে ফিরে তুলাল সা'কে আর ডাকতে হয় না। নতুন-বৌ তার আগেই ঘুম থেকে উঠে গরদের শাড়ি পরে ভিজা চুলে পুজোর ব্যবস্থা করে দেয়।

তুলাল সা' প্রথম প্রথম বলত, তুমি কেন মা আবার এত কষ্ট করে উঠতে গেলে? নিধু তো ছিল—

নতুন-বৌ সে-কথার উত্তর দিত না। শ্বশুরকে পূজায় বসিয়ে দিয়ে তাঁর সকালের জলযোগের ব্যবস্থা করে তবে তার মুক্তি। শুধু শ্বশুরের কাজই নয়। সারা বাড়িতে যে-যেখানে আছে সবাইকে দেখবার ওই একটা মানুষ নতুন-বৌ।

তুলাল সা' বলত, এই যে নতুন-বৌ, এই যে নতুন-বৌ না হলে কিছুই হয় না এ সংসারে, এও তো সেই হরির দয়ায়, হরির দয়া না হলে কি আমি নতুন-বৌকে পেতাম? তোমরাই বল না, পেতাম?

কান্ত বলত, আজ্ঞে, উনি মানুষ নন, মা-লক্ষ্মী আমাদের—

বলতে গেলে এ বাড়িতে নতুন-বৌ আসবার পর থেকেই তুলাল সা'র সংসারে লক্ষ্মী এসে আসন নিয়েছেন। বাড়ি আগেই হয়েছিল, ব্যবসা আগেই হয়েছিল, টাকাও আগেই হয়েছিল। কিন্তু সংসারে শান্তি বলতে যা বোঝায়, সুখ বলতে যা বোঝায়, সব এসেছে নতুন-বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। নতুন-বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তুলাল সা'র যেন বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। তিনখানা বাস্ করেছে তুলাল সা'। একটা ধানকল করেছে। বাস্তুভিটের পাশেই নতুন পাকা-দালান তুলেছে। এবার একটা সুগার-মিল করবার ইচ্ছে। পেঁপুলবেড়ের

বাঁওড়টা যদি পাওয়া যেত তো সুগার-মিলের পক্ষে জায়গাটা ভারি সুবিধের হত। জল, কয়লা, রেল-ইস্টিশনটা কাছে। কোনও দিকেই আর কোনও অসুবিধে থাকত না। কর্তামশাই-এর কাছে নিজেও গিয়েছে কতদিন। কতদিন নিবারণকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

বলেছে, এবার তো তোমার বয়স হল নিবারণ, এবার পরকালের কথা একবার ভাব—

নিবারণ বলেছে, আজ্ঞে, সা' মশাই, আমার আর পরকাল—

দুলাল সা' বলেছে—ভেবেছ চিরকাল কি এই রকমই কাটবে? এই দেখ না, ওই আমার কথাটাই ভাব না, আমি কি আর বাবুয়ানি করতে পারি না ভেবেছ? পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে গদির উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকলেই পারি। কিসের আমার গরজ ভোরবেলা ঘাটে গিয়ে নিজের হাতে ঝাঁটা ধরার? করি কার জন্যে? করি কিসের জন্যে শুনি?

—আজ্ঞে পরকালের জন্যে!

—তবে? তবেই বোঝ। আমার আর কি? আমার আর টাকার দরকার কিসের? আমি একলা কত খাব? সুগার-মিলটা হলে তোমাদেরই লাভ। দেশের দশজনের লাভ। দেশের লোক বড় গরীব। আমি এককালে গরীব ছিলুম, গরীবের দুঃখ আমি বুঝব না তো কে বুঝবে বল দিকিনি? তোমার কর্তামশাই বুঝবে?

—আজ্ঞে কর্তামশাইয়ের কথা ছেড়ে দিন।

—তা হলেই বোঝ, সুগার-মিলটা হলে দেশের লোকেরই লাভ। দেশের গরীব লোকরা কাজ পাবে, দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পাবে, পরতে পাবে, গরীবদের দুর্দশা দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে, তা জান?

নিবারণ কিছু কথা বললে না। চুপ করে রইল।

দুলাল সা' বললে, আর এই যে তুমি, তোমাকেও তো পনেরো

বছর দেখে আসছি, আগে তোমার কি চেহারা ছিল, আর এখন কি হয়েছে বল দিকিনি ? কিসের লোভে কর্তামশাই-এর কাছে পড়ে আছ বল তো ? পেট ভরে খেতে পাও ? মাইনে-টাইনে পাও ?

নিবারণ তবু কথা বললে না।

দুলাল সা' আবার বললে, যাক্ গে, তুমি খেতে পাও আর না পাও, তুমি মাইনে পাও আর না পাও, তা আমার দেখবার দরকার নেই। তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে, আমি কে ? আমি কেউ না। তবে কি জান, কারোর দুঃখ দেখলে মনের ভেতরটা যেন কেমন হু-হু করে। আমি না বলে থাকতে পারি নে। ভাবি, তুমিও তো মানুষ হে, তোমার ছেলে-মেয়ে-বউ না-ই বা রইল, তোমার সুখ-সুবিধে-আহ্লাদ বলেও তো একটা জিনিস আছে। তাই বলছিলাম, পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা যদি দিতে আমাকে তো তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যেত, তা তুমি যখন…

—বাবা !

হঠাৎ নতুন-বৌ ঘরে ঢুকল।

দুলাল সা' বললে, এই যে মা উঠি, এই নিবারণকে বলছিলাম ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টার কথা। বলছিলাম, আমার আর কি ! দেশের লোক দু'টো খেতে পায় তারই সুবিধে করার জন্যেই সুগার-মিলটা করা, নইলে—

নিবারণ নতুন-বৌয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমি উঠছি, আপনাদের দেরি হয়ে গেল—

দুলাল সা' বললে, তা হলে কথাটা মনে রেখো নিবারণ, আমি না হয় নিতাইকে একবার কর্তামশাই-এর কাছে পাঠিয়ে দেব'খন—

হঠাৎ নতুন-বৌ বললে, এত অপমান করার পরেও আবার কর্তামশাই-এর কাছে নিতাই কাকাবাবুকে পাঠাবেন বাবা ? যদি আবার অপমান করে ?

ছুলাল সা' বললে, ধর্মের পথে তো বাধা আসবেই মা, তা বলে অপমানের ভয়ে ধর্ম তো ছাড়তে পারি না—

—কিন্তু যে ছোটলোক, তার সঙ্গে সংশ্রব না-ই বা রাখলেন আপনি!

নিবারণের কথাটা গায়ে লাগল। বললে, আমার মুখের সামনে আর বুড়োমানুষকে গালাগালটা না-ই বা দিলে মা! তিনি তো কোনও অপরাধ করেন নি!

নতুন-বৌ বললে, দেখুন, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি, বাবা ধর্মভীরু মানুষ, তাই এর পরেও আপনাকে ডেকে ভদ্রভাবে কথা বলেছেন, আমি হলে অন্য রকম ব্যবহার করতাম।

নিবারণ বললে, তুমি সব জান না মা, তুমি নতুন এসেছ কেষ্ট-গঞ্জে, তাই এ কথা বলছ। কর্তামশাইকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তা যদি হত তো আমি এই অবস্থায় তাঁর কাছে পড়ে থাকতাম না—

ছুলাল সা' লুফে নিলে কথাটা। বললে, আমিও তো তাই বলি। তুমি কেন পড়ে পড়ে ঝাঁটা-লাথি খাচ্ছ নিবারণ? আমি তোমাকে ডবল মাইনে দিচ্ছি, তুমি আমার এখানে এস, সুগার-মিল খুললে তুমি আরও মোটা টাকার মাইনে পাবে।

নিবারণ হাসল। বললে, আপনি আর আমাকে লোভ দেখাবেন না সা' মশাই, ইহকালটা তো গেছেই, পরকালটা আর খোয়াতে চাই নে।

—এই কি তোমার শেষ কথা?

নতুন-বৌ বললে—আপনি উঠুন বাবা, বেলা হয়ে গেল, যার-তার সঙ্গে কথা বলে আপনি আর মেজাজ খারাপ করবেন না। নিতাইকাকা আছেন, পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় উনি কি করে রাখতে পারেন তাই দেখি!

বলে দুলাল সা'কে হাতে ধরে নতুন-বৌ অন্দরের ভেতর নিয়ে গেল।

নিবারণ চলেই আসছিল। ভেতরে কাছারি-ঘর থেকে কান্ত ডাকলে। বললে—সরকার মশাই, ইদিকে আসুন!

নিবারণ চেয়ে দেখলে, বললে—কী বলছ কান্ত?

—বলছি আপনার মত আহাম্মক মানুষ তো আমি আর দু'টো দেখি নি। এমন সুযোগ কেউ হেলা-ফেলা করে?

—কিসের সুযোগ? একটু বুঝিয়ে বল?

—বলি কর্তামশাই তো যেতে বসেছে। যেটুকু আছে তা-ও গেল বলে। এই তো গুছিয়ে নেবার সময়!

নিবারণ আবার হাসল। বললে—তুমি আমাকে আজও চিনলে না কান্ত! সবাই কি গুছিয়ে নিতে চায়, না পারে? না সকলের সে-প্রবৃত্তি থাকে?

বলে নিবারণও আর দাঁড়াল না সেখানে। খাঁ খাঁ করা রোদ উঠেছিল বাইরে। ছাতাটা খুলে বাইরের রাস্তায় পা বাড়াল।

কিন্তু যেদিন সেই রাত্রে লুচি ভাজার গন্ধে কর্তামশাই-এর ঘুমের ব্যাঘাত হল, তার আগের দিনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

কেষ্টগঞ্জের লোক সাধারণতঃ এমন ঘটনা কখনও দেখে নি। কখনও শোনে নি। দুলাল সা' ভোর রাত্রে যেমন রোজ চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ইছামতীতে স্নান করতে যায়, তেমনি সেদিনও গেছে। আবছা অন্ধকার। ভালো করে ভোর হয় নি তখনও। হঠাৎ

মনে হল অশথগাছটার তলায় কে যেন বসে আছে স্থির নিশ্চল হয়ে। দেখেই কেমন মনে হল, এতদিন যেন এঁকেই মনে-প্রাণে খুঁজছিল দুলাল সা'।

এ সেই রাত চারটের সময়কার ঘটনা। আর বেলা দশটার মধ্যে সারা কেষ্টগঞ্জে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে দুলাল সা'র বাড়িতে এক সাধুপুরুষ এসেছেন। দুলাল সা' মশাই দীক্ষা নেবে।

ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সুকান্ত আধুনিক ছোকরা। কলকাতা থেকে নতুন এসেছে কেষ্টগঞ্জে। সাইকেল চড়ে অফিসে যাচ্ছিল। হঠাৎ সা' মশাই-এর বাড়ির সামনে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হয়েছে এখানে? ভিড় কেন এত?

নিতাই বসাক সুকান্তবাবুকে দেখেই দৌড়ে কাছে এসেছে। বললে –আসুন স্যার, আসুন—

—কি হয়েছে নিতাইবাবু? ব্যাপার কি?

—আজ্ঞে, আপনারা সাহেব মানুষ, আপনারা তো আবার এ-সব বিশ্বাস করবেন না। তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু, একেবারে ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ধাঁ ধাঁ করে বলে দিচ্ছেন। আমি তো স্যার চমকে গেছি, যা যা আমায় বললেন সব মিলে গেল।

সুকান্ত তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কে? লোকটা কে? কোত্থেকে এল?

—লোক-টোক নয়, খাঁটি মহাপুরুষ। হিমালয় থেকে এসেছেন, আবার কালই হিমালয়ে চলে যাবেন।

সুকান্ত পকেট থেকে একটা সিগারেট-কৌটা বার করে তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল। বললে—দূর মশাই, কি যে বলেন আপনারা, এ-সব আপনাদের সুপারস্টিশন্, এ-সব বলবেন না কাউকে, লোকে হাসবে।

নিতাই বসাক সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলে। বললে—না স্যার, আপনি তা হলে শুধু একবার ওঁর চেহারাটা দেখে যান, দেখবেন চোখ দিয়ে কি রকম জ্যোতি বেরোচ্ছে—

—না মশাই, শেষকালে যদি জ্যোতির ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে যাই, কাজ নেই, আমি চলি—

বলে ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সাইকেল চড়ে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল। কিন্তু ভিড় কমলো না তা বলে। যত বেলা বাড়তে লাগল ততই ভিড় বেড়ে গেল। রটে গেল যে, তুলাল সা'র বাড়িতে এক সাধু এসেছেন। তুলাল সা' তাঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছে। তুলাল সা'র পাটের আড়তে যারা এসেছিল তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলে নিতাই বসাক।

—আজ রাত্রে কিন্তু আসা চাই হাজরা মশাই! গুরুদেবের প্রসাদ পাবেন।

যারা নৌকোর ব্যাপারী, তারা সারা রাত নৌকোয় কাটিয়ে ভোর ভোর কেষ্টগঞ্জ থেকে রওনা দেয়। একদল যায়, আর একদল আসে। এই রকমই নিয়ম। কেউ কেউ কেষ্টগঞ্জের বাজারে গিয়ে এখানে-ওখানে রাত কাটায়। কিন্তু সেদিন শুধু হাজরা মশাই-ই নয়, পোদ্দার মশাই, পাল মশাই, দাস মশাই, সকলে প্রসাদ পেলে। ভাল খাঁটি ঘি-এ ভাজা গরম গরম লুচি, কুমড়োর ছক্কা, ছোলার ডাল, দই, পায়েস সবই খেলে। এমন খাওয়া নতুন নয়। যারা ব্যাপারী, তারা এমন সা'মশাই-এর বাড়িতে বরাবর পাত পেড়ে খেয়ে গেছে অনেকবার। কেষ্টগঞ্জের গাঁয়ের লোকেরাও খায়। ব্রাহ্মণদের জন্যে আলাদা, শূদ্রদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

সুকান্তবাবুর বাংলোতে গিয়ে নিতাই বসাক নিজেই নেমন্তন্ন করে এসেছিল।

সুকান্ত বলেছিল—খেতে আর আমাদের কিসের আপত্তি,

কিন্তু ভক্তি-টক্তি আমাদের নেই মশাই, আমরা ও-সব বুজরুকিতে ভুলি না।

—কিন্তু ভক্তি না থাক, আপনাকে স্যার যেতেই হবে, ছুলাল অনেক করে বলে দিয়েছে—আর আপনার স্ত্রীকেও—

সুকান্ত কিন্তু-কিন্তু করছিল। নিতাই বসাক বললে—আপনার কিচ্ছু কষ্ট হবে না, আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আপনি যাবেন আর সাধু দর্শন করে চলে আসবেন—

সুকান্ত হেসে বললে—কিন্তু দর্শনী দিতে হবে নাকি আবার আপনাদের সাধুকে ?

—না, না, সে-রকম সাধু নয় স্যার। একটা পয়সা নেন না তিনি। ফল-মূল ছাড়া কিছু আহারই করেন না। নইলে ছুলাল কি আর সাধে দীক্ষা নিচ্ছে তাঁর কাছে !

তারপর একটু থেমে বললে—আর বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, যাকে যা বলে দিচ্ছেন সব ডাহা মিলে যাচ্ছে। আমি কবে পেয়ারাগাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে পা মচকে পড়ে গিয়েছিলুম, সব বলে দিলেন। আর ছুলালের তো কথাই নেই স্যার, সে সাধু বাবার পা জড়িয়ে ধরে বসে আছে সমস্ত দিন—

—সে কি ? ছুলালবাবুরও কিছু বলে দিয়েছেন নাকি ?

—আজ্ঞে, সব সব স্যার, কিছু বাকি নেই আর বলতে। ছুলালকে বলে দিয়েছেন, এখন থেকে গুড্-টাইম পড়ল। এইবার ছুলাল ধুলো-মুঠো ধরবে আর সোনা-মুঠো হবে।

সুকান্ত বললে—আমার হাত দেখে আমার ফিউচার বলতে পারবেন আপনাদের সাধু ? আমার তো কুষ্ঠি নেই।

—কি বলেন স্যার, হাত দেখতেও হবে না, আপনার মুখ দেখেই ভূত-ভবিষ্যৎ গড়-গড় করে বলে দেবেন। আপনি কি জানতে চান, বলুন ?

সুকান্ত বললে—আমার কনফার্মেশনের ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম আর কি! রাইটার্স বিল্ডিং-এ এত ক্লিক্ চলছে, আমার পেপারটা চাপা দিয়ে রেখেছে মশাই সবাই। অথচ দেখুন, আমি সকলের চেয়ে সিনিয়র।

নিতাই বসাক বললে—সে কি? আপনার প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আলাপ নেই?

সুকান্ত বললে—না, আপনার আছে?

—আরে, কার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তাই বলুন? আগে বলতে হয় আমাকে!

সুকান্ত বললে—অতুল্য ঘোষ? তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে?

—অতুল্যদা?

নিতাই বসাক মিটি মিটি হাসতে লাগল। বললে—আগে এ-সব কথা বলতে হয় আমাকে! দেখুন দিকিন স্যার, এ-সব কথা আমাকে আপনি একদম বলেন নি! আগে বললে আপনি যা চাইতেন সব করে দিতাম! মিনিস্টাররা তো আমার সব হাত-ধরা! এই দেখুন, সুগার-মিল করব, মেশিনারি পাচ্ছিলাম না, কলকাতা থেকে চিঠি নিয়ে একেবারে সোজা দিল্লী চলে গেলাম, সেখানে যেতেই কাজ ফতে।

সুকান্ত সেন নিজে গভর্ণমেণ্ট অফিসার। কিন্তু তবু সে-ও অবাক্ হয়ে গেল। বললে—দিল্লীতে গিয়ে কাকে ধরলেন?

নিতাই বসাক বিজ্ঞের মত রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল আবার।

বললে—সব বলব আপনাকে স্যার, সব বলব। আমি যখন আছি তখন আপনার কিছু ভাবনা নেই। দিল্লীর কাকে আপনি ধরতে চান বলুন না? লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জগজীবন রাম, যাকে আপনি বলবেন, সবাই আমার এই মুঠোর মধ্যে।

সুকান্ত যেন ভরসা পেলে। বললে—ঠিক আছে, আমি যাবো'খন সন্ধ্যেবেলা—

নিতাই বসাক উঠল। বললে—আমি আপনাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব স্যার, আপনি সস্ত্রীক চলে আসবেন, তার পর খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব।

বলে নিতাই বসাক উঠল।

রাত তখন অনেক। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুর-ভুর করছে। দুলাল সা'র বাড়ির সামনের পুকুরের পাড়ে এঁটো কলাপাতের ডাঁই জমে গেছে। এ-গ্রামের ও-গ্রামের সব লোক এসে খেয়ে গেছে পাতা পেতে। দুলাল সা' মশাই এতদিন পরে গুরু পেয়েছেন। কোনও কার্পণ্য করেন নি লোক নিমন্ত্রণের ব্যাপারে। সবই হরির ইচ্ছে। ভবসাগরে হরি ছাড়া কারোর কোনও ভরসা নেই। এক-একজন করে লোক এসে দুলাল সা'র গুরুকে দর্শন করেছে, আর যার যা-খুশি প্রণামী দিয়ে গেছে। একটা রুপোর মস্ত বড় থালা পাতা ছিল, তার ওপর টাকা, আধুলি, পয়সা, নোট, মোহর পড়ে পাহাড় হয়ে আছে। সাধু-মহারাজ বসে আছেন ডানলোপিলোর তৈরি ভেলভেটের ওয়াড় লাগানো গদিতে। গরদের থান দিয়ে সাধুমহারাজকে মুড়ে দিয়েছে দুলাল সা'। সাধু-মহারাজ নিজে কিন্তু নির্বিকার। দুলাল সা'র চাকর চার পাশে দাঁড়িয়ে বিকেল থেকে চামর হেলিয়েছে কেবল মাথার ওপর। মাথার ওপর ইলেকট্রিক-পাখা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, তবু গরম কাটে না। সামনে ধুপধুনো গুগ্‌গুল জ্বলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে ঘরটা। সাধু-মহারাজের চেহারাটাই ঝাপসা হয়ে গেছে ধোঁয়ার চোটে। ভালো করে নজর করলে দেখা যায়, দুলাল সা' সাধু-মহারাজার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে আছে আর দু'হাতে সাধু-মহারাজের পা-জোড়া ছুঁয়ে আছে।

সন্ধ্যা থেকেই এই রকম। যে আসছে সে-ই দুলাল সা'র ভক্তি

দেখে আর চোখের জল রাখতে পারছে না। ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সুকান্ত সস্ত্রীক এসেছিল। প্রথমে এত বিশ্বাস-টিশ্বাস ছিল না। একটু নাস্তিক গোছের লোক বরাবরই। সাধু-সন্নিসী কিংবা ভগবান-টগবানে এত বিশ্বাস কোনকালেই নেই। নেহাত নিতাই বসাকের কথায় এসেছিল। কিন্তু এসে সাধু-মহারাজের চেহারা দেখে আর কথা শুনেই অবাক্।

শেষকালে চলে যাবার আগে কি জানি কি হল, পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার আস্ত নোট বার করে রুপোর থালার ওপর রেখে দিলে।

বাইরে আসতেই নিতাই বসাক ধরলে। বললে—কি স্যার, আমি যা বলেছিলাম, সব মিলেছে তো ?

সুকান্তর স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—বড় অদ্ভুত, সত্যি !

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, সাধু-মহারাজ কি কাল ভোরবেলাই চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ স্যার, ভোর চারটেয় নৌকোয় তুলে দিতে হবে। কিছুতেই আর থাকতে রাজী করান গেল না, একেবারে নির্লোভ পুরুষ তো, সংসারে থাকতেই চান না। তুলালের অনেক পুণ্যবল তাই অমন গুরু পেয়েছে। একটা ফোটো তুলে নিয়েছি, সেইটে বাঁধিয়ে পূজা হবে এবার থেকে—

আবার দু'জনকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলে নিতাই বসাক। ওদিকে ব্যাপারী মশাইরাও একে একে দর্শন করে প্রণামী দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। হাজরা মশাই, পোদ্দার মশাই, পাল মশাই, সবাই খুশী। তুলাল সা' ভক্ত মানুষ। ভক্তি না থাকলে এমন গুরু ক'জন পায় ? সবাই বলতে লাগল—কলিযুগে ভক্তিই একমাত্র সার দ্রব্য।

যখন সবাই চলে গেছে, যখন বাড়ি খালি হয়-হয়, নতুন-বৌও

তখন শুতে যাচ্ছিল। নতুন-বৌয়েরই বেশী খাটুনী গেছে। দুলাল সা' সারাদিন উপোস করেছে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট যা-কিছু সব গেছে নতুন-বৌয়ের ওপর দিয়ে। এতগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়া, এতগুলো টাকাখরচ। সা'-বাড়ির যে-যাই করুক, নতুন-বৌয়ের কাছেই সকলের চাবি-কাঠি। দুলাল সা'র সিন্দুকের চাবি থাকে নতুন-বৌয়ের কাছে। সৌরভী দৌড়তে দৌড়তে এল।

বললে—নতুন মা, ভাঁড়ারের চাবি দাও, মিষ্টি বার করতে হবে।

মিষ্টি! এত রাত্রে আবার মিষ্টি কে খাবে? সমস্ত লোকের খাওয়া-দাওয়া সারা হবার পর ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে নতুন-বৌ দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছিল, এমন অসময়ে আবার কে খেতে এল?

—কে? খাবে কে? সবাই তো খেয়ে চলে গেছে! খেতে বাকি আছে কেউ?

সৌরভী বললে—ভস্চায্যি বাড়ি থেকে কর্তামশাই এয়েচেন—

—কর্তামশাই? কোন্ কর্তামশাই?

—আবার কোন্ কর্তামশাই? কেষ্টগঞ্জের বুড়ো-কর্তামশাই। আর সঙ্গে আছে নিবারণ সরকার। দুজনের খাবার বন্দোবস্ত করতে বললেন নীচেয়—

—তুই ঠিক জানিস? ঠিক জানিস কর্তামশাই এসেছেন?

নতুন-বৌয়ের তবু বিশ্বাস হল না। বললে—চল, আমিও যাচ্ছি, দেখে আসি গে। কর্তামশাই এ বাড়িতে আসবে, এ বাড়িতে খাবে, এ তো হয় না, তুই ভুল শুনেছিস।

নতুন-বৌ আর থাকতে পারলে না, তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নীচেয় নেমে এল। এসে দেখলে, সৌরভী যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। কর্তামশাই নিজেই এসেছেন। তাঁর পেছনে পেছনে নিবারণও রয়েছে।

কর্তামশাই আসবার আগে অনেকবার ভেবেছিলেন। দুলাল সা'র বাড়িতে আসবার আগে ভাল করে অনেকবার ভাবাটাই উচিত। দুলাল সা' তো শুধু পাটের আড়তদারই নয়, সে যে কর্তামশাই-এর জীবনে মূর্তিমান্ দুর্গ্রহ একটা।

নিবারণ বলেছিল—আপনি আর কর্তামশাই না-ই বা গেলেন, লোক তো দুলাল সা' ভাল নয়—

লোক যে দুলাল সা' ভাল নয়, তা কি আর কর্তামশাই জানেন না? ভাল করেই জানেন। সে কথা কর্তামশাই-এর চেয়ে ভাল করে আর কেউই জানে না এই কেষ্টগঞ্জে।

তবু বলেন—না নিবারণ, আমাকে নিজে না গেলে হবে না—চল—

—কিন্তু তা বলে এত রাত্তিরে?

কর্তামশাই বলেছিলেন—কাল দিনমানে তো সাধু থাকছে না তোমার!

তা সত্যি! কালকে ভোরবেলাই চলে যাবে যে। আজ রাত্রে না গেলে হবে কি করে? নিবারণ তখন প্রায় শুতে যাবার যোগাড় করে ফেলেছিল। হঠাৎ কর্তার কি খেয়াল হল, তিনি সেই দোতলা থেকে আবার খড়মের শব্দ করতে করতে নেমে এসেছিলেন।

বড়গিন্নী সেদিনও সরষের তেল গরম করে এনেছিল বাটিতে। কিন্তু হঠাৎ কর্তামশাইকে ঘরে না দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন তো হয় না। বরাবর খাওয়া-দাওয়ার পরই

নিজের বিছানাটায় এসেই শুয়ে পড়েন কর্তামশাই। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই ব্যতিক্রম কেন তা বুঝতে পারেনি বড়গিন্নী। পাশের ঘরে আওয়াজ শুনে আরও অবাক হয়ে গেল।

—তুমি এখেনে!

কর্তামশাই তখন নিজেই সিন্দুকটা খুলেছেন। বহুদিনের পুরনো সিন্দুক। কর্তামশাই-এর বৃদ্ধ প্রপিতামহ কালিকেশ্বর দেবশর্মণঃর আমলের সিন্দুক। চিরকাল বন্ধই থাকে। সিন্দুকটা খুলতেই যেন অনেক যুগের জমানো অতীত একসঙ্গে দাঁত বার করে হেসে উঠল। লোহার ডালা। কয়েকটা পেতল-কাঁসার বাসন ওপরে, তাও বেশির ভাগ সব বার করে নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের বিয়ের সময় অনেক বাসন বেরিয়েছিল। তার পর কোথায় সে সব গেল। একটা একটা করে সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্তামশাই-এর চোখের সামনে সব ভাসছে এখনও। বিয়ে তো ভালই দিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরের। কিন্তু ওই যে দুলাল সা'। দুলাল সা'ই দিনরাত মতলব দিত। কানে ফুস্-মন্তর দিত। ওদের সঙ্গেই মেলামেশা করত সব সময়।

একদিন বকে দিয়েছিলেন কর্তামশাই। সেদিনও অনেক রাত হয়েছে। তখনও বাড়ি ফেরেনি সিদ্ধেশ্বর। বিয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে। তবু বাউণ্ডুলে স্বভাব সিদ্ধেশ্বরের। নিবারণকে সেদিন বলে রেখেছিলেন কর্তামশাই। বলেছিলেন—সিধু এলেই আমাকে ডেকে দেবে তো নিবারণ—

বৌমাকেও বলে রেখেছিলেন।

নলহাটির গগন চাটুজ্জের মেয়েকে পুত্রবধূ করেছিলেন কর্তামশাই।

কর্তামশাই বলেছিলেন—তুমি একটু কড়া হতে পার না বৌমা?

বৌমা মাথার ঘোমটা আরও টেনে নীচু করে দিয়েছিল শ্বশুরের সামনে।

—আমার ছেলে হয়ে সে ওই বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে আড্ডা দেবে ? আমার মুখে চুণ-কালি দেবে, আর আমাকে তাই দেখতে হবে ?

এক-একদিন নিবারণকেও জিজ্ঞেস করতেন—আচ্ছা, ওদের সঙ্গে সিধে কোথায় যায় বলতো নিবারণ ?

নিবারণ জানত সব কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস হত না। কতদিন নিবারণ দেখেছে দুলাল সা' আর নিতাই বসাকের সঙ্গে ছোটবাবু চণ্ডীতলার বাঁধাঘাটে বসে বড়-কলকে টানছে। বলতে গেলে নিতাই বসাকই ছিল ছোটবাবুর প্রাণের সাঙ্গাত। সারাদিন গুজ গুজ ফিস্ ফিস্ চলত তার সঙ্গেই। তার পর এক-একদিন কোথায় থাকত, কোথায় খেত কেউ জানতে পারত না। যখন রাত দুপ্রহর পেরিয়ে যেত তখন চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকত।

—তুমি একটু কড়া হতে পার না বৌমা ? ওরা সব ডাকাত। ওই দুলাল সা', নিতাই বসাক, সবাই ডাকাত এক-একটা !

বৌমা কোনও দিন শ্বশুরের সামনে মুখ তুলে চায় নি পর্যন্ত, ওই কথাগুলোই তার কানে যেত কি না তাও বোঝা যেত না। বড়গিন্নীও কিছু বলত না বৌমাকে।

কর্তামশাই বড়গিন্নীকেও জিজ্ঞেস করতেন—সিধে যায় কোথায়? তুমি কিছু জান ? কি করে এত রাত পর্যন্ত ?

বড়গিন্নী বলত—আমি তো কিছু জানি নে।

—তা তুমি যদি না জানবে তো ছেলের মা হয়েছিলে কেন শুনি ?

শেষকালের দিকে কর্তামশাই যেন উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে একদিন বৈঠকখানার সামনেই বসে রইলেন। বললেন—আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার—

ক্রমে রাত অনেক হল। কর্তামশাই বসে, নিবারণও ঠায় বসে।

নিবারণ শেষকালে বললে—আপনার শরীর খারাপ, আপনি এবার শুতে যান কর্তামশাই—

কর্তামশাই বললেন—তুমি থাম নিবারণ, তোমার যদি ছেলে থাকত তো তুমি বুঝতে পারতে যে ছেলে থাকার কি জ্বালা! এমন যার ছেলে তার ঘুম আসে? ঘুমিয়ে তার শান্তি হয়?

এর পর আর নিবারণের কথা বলার সাহস হয় নি।

তার পর রাত বারোটা বাজল। একটা বাজল। কর্তামশাই ঠায় বসে রইলেন। কারোর কথাতেই আর নড়লেন না। তার পর ভোরের দিকে কর্তামশাই-এর কেমন মাথাটা ঘুরে গেল। তিনি সেইখানে বসে বসেই ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তার পর দিন ডাক্তার এসেছিল, কবিরাজ এসেছিল। তার পর ছ'মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। যখন বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন মাথায় আরও বড় টাক পড়ে গেছে। যেন ছ মাসের মধ্যেই দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে।

এও সেই পনেরো বছর আগেকার ঘটনা।

পনেরো বছর আগে যখন দুলাল সা' আর নিতাই বসাক সবে এই কেষ্টগঞ্জে হরিসভা খোলার মতলব করছে। কর্তামশাই-এর সাত বিঘে জমির ওপর দুলাল সা' বাড়ি তুলবে-তুলবে করছে। সেই সময় থেকেই সিদ্ধেশ্বর ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল।

একদিন সিদ্ধেশ্বরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলেন কর্তামশাই —তুমি ওদের সঙ্গে মেশো কেন শুনি?

কর্তামশাই-এর সামনে সিদ্ধেশ্বরের কথা বলার সাহস হত না কোনও কালে।

—কথা বলছ না কেন? ওদের সঙ্গে কেন মেশো? ওরা তোমার মেশার যুগ্যি?

তবু সিদ্ধেশ্বর কথা বলে নি কিছু।

কর্তামশাই আবার কড়া সুরে বলেছিলেন—যত সব বাউণ্ডুলে ফেরব্‌বাজের দল, জাতের ঠিক নেই যাদের, তারাই হল তোমার ইয়ার-বক্সি? তোমার বাপকে যারা অপমান করে যায়, তাদের সঙ্গে মিশতে তোমার লজ্জা করে না? বেকুব কোথাকার!

তারপরে একটু থেমে বলেছিলেন—এর পর ফের যদি ওদের সঙ্গে মেশো তো বাড়ি থেকে তোমাকে দূর করে দেব; তা মনে রেখ—

হঠাৎ যেন বারুদে কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে। সিদ্ধেশ্বর এমনিতে নিরীহ গোবেচারী মানুষ। ছোটবেলা থেকে কখনও কর্তামশাই-এর সামনে মুখ তুলে কথা বলে নি। কিন্তু সেদিন কি হয়েছিল কে জানে। সিদ্ধেশ্বর এই প্রথম মাথা তুলল।

বললে, আপনার বাড়িতে আমি আর থাকতে চাইও নে।

—কি? কি বললে? কি বললে তুমি?

সেয়ানা জোয়ান ছেলে। কিন্তু কর্তামশাই-এর তখন রাগে কর্তব্যজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। বললেন, কি বললে তুমি, আবার বল?

কথাগুলো চিৎকার করেই বলছিলেন কর্তামশাই। চিৎকার করে সব কথা বলা অভ্যাস তাঁর। চিৎকার শুনে ভেতর থেকে বড়গিন্নীও এসে পড়েছিল। বৌমার কানেও কথাটা গিয়েছিল। কর্তামশাই-এর চিৎকারে সে ফাঁকা বাড়িটা তখন হাহাকার করে উঠেছে। নিবারণ সামনে দাঁড়িয়েও কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

—আপনার বাড়িতে আমি আর থাকতে চাইও নে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে এক চড় কষার শব্দ হল। কর্তামশাই-এর বুড়ো হাড়ের চড় জোয়ান সিদ্ধেশ্বরের গালে বসে ফেটে চৌ-চাক্‌লা হয়ে গেল।

নিবারণ ভয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠেছে। বড়গিন্নীও ঘরের মধ্যে ঢুকে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক।

কর্তামশাই তখন থর থর করে কাঁপছেন। বলছেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বাড়িতে থাকতে চাস নে তো বেরিয়ে যা। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা—

বড়গিন্নী আর কথা বাড়াতে দেয় নি সেদিন। সিদ্ধেশ্বরের হাতটা ধরে সোজা ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে যতদিন সিদ্ধেশ্বর বাড়িতে ছিল, ততদিন বাপের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। কোনও রকমে আসত একবার বাড়িতে। তাও অনেক রাত্রে। কখন আসত সে, আর কখন ঘুমোত, কখন খেত, কিছু টের পেতেন না কর্তামশাই। ছেলের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন না প্রথম প্রথম।

অনেক দিন পরে আর থাকতে পারেন নি। বড়গিন্নীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সিধু কোথায় ?

বড়গিন্নী বলেছিল, বাড়িতে।

কর্তামশাই বলেছিলেন, এখনও বেটাদের সঙ্গে মেশে ?

—তা জানি নে।

ওই পর্যন্ত।

তার পর বহুদিন কোনও খবরই রাখতেন না ছেলের। ছেলে বাড়িতে আসে, ঘুমোয়, খায়, আর কিছু নয়। নিবারণের সঙ্গে কর্তামশাই হাজারো-ব্যাপার সম্পর্কে কথা বলতেন, ঘুণাক্ষরে একবারও সিদ্ধেশ্বরের নাম মুখে আনতেন না।

তারপর আস্তে আস্তে দুলাল সা', নিতাই বসাক দুর্জনেই কর্তামশাই এর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলে। নিজের চোখেই সব দেখতে লাগলেন, নিজের কানেই সব শুনতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একদিন সেই সিদ্ধেশ্বরও আর ফিরে এল না। রাত কেটে গেল, পরদিন সকাল হল। তার পরদিনও কেটে গেল। তখনও আসে নি সিদ্ধেশ্বর।

বড়গিন্নী কাছে গিয়ে বসল সেদিন। বললে, সিধুর খোঁজ করলে না তুমি ?

—কেন ? সিধু আসে নি ?

—না।

—কাল কখন বেরিয়েছে ?

—কালও আসে নি। আজ তিনদিন তার দেখা নেই। বৌমা বড় কান্নাকাটি করছে।

কর্তামশাই গুম্ হয়ে গেলেন। আর সেই যে সিদ্ধেশ্বর চলে গিয়েছিল, আর তার কোনও খোঁজ নেই। কেউ খুন করল, না কি কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল, তারও কোনও হদিস নেই এই এত বছর।

কর্তামশাইও আর তার খোঁজ করেন না। খোঁজ করতে চেষ্টাও করেন না কখনও। যাক, যে যাবে তাকে কে ধরে রাখতে পারে ?

এত বছর ধরে এ-সব ঘটনা ঘটে গেছে তবু এ নিয়ে কখনও কর্তামশাই হা-হুতাশ করেন নি। চতুঃষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর একটা ফাঁড়া আছে ; একথা বলেছিল কাশীর পণ্ডিত শিরোমণি বাচস্পতি। এখন এই চৌষট্টি বছর বয়স হল তাঁর। এখন আর কিসের ফাঁড়া থাকবে ? আর ফাঁড়া থাকলেই বা কি ? এই কেষ্টগঞ্জে এত কাণ্ড হল। দুলাল সা' আর নিতাই বসাকই তো তাঁর জীবনে দু-দুটো মস্ত ফাঁড়া ! তারাই বা তাঁর কি এমন ক্ষতি করতে পারলে ? সাত বিঘে জমি নিয়েছে, নিক। তাঁকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে, নিক ! তাতে তিনি এমন কিছু গরীব হয়ে যান নি। তা ছাড়া দেশেও তো কত কাণ্ড হয়ে গেল। ইংরেজরা চলে গেল। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি হল। অমন ভাতের দুর্ভিক্ষ হল দেশে। পদ্মার পার থেকে লোকজন এসে কেষ্টগঞ্জের

বাজারে ছাউনি করল—তখনও তো তিনি খেতে পেয়েছেন। তখনও তো তাঁকে ভিক্ষে করতে হয় নি। এখনও তো তিনি ছাদের তলায় ঘুমোন, এখনও তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় নি তাঁকে।

কিন্তু দুলাল সা'র বাড়িতে সাধুর খবরটা শোনার পর থেকেই কেমন যেন বিচলিত হয়ে গেছেন। নিবারণকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কিছু শুনেছ নিবারণ ?

নিবারণের খেয়াল ছিল না। জিজ্ঞেস করলে, কিসের কি কর্তামশাই ?

—যাকে যা বলছে, সব মিলে যাচ্ছে নাকি ? সাধুর কথা বলছি। দুলাল সা'র বাড়িতে যে সাধু এসেছে।

নিবারণ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই। হুবহু। আমি বাজারে গিয়েছিলাম, সেখানে পাল মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি তো একেবারে অবাক। আর দেখা হল সুকান্তবাবুর সঙ্গে—

—সেটা কে ?

—আজ্ঞে ওই যে নতুন সরকারী আপিস হয়েছে, সেই আপিসের বড়সায়েব।

—বড়সায়েব মানে ?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, অনেক টাকা মাইনে পায়, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, বউ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—

—বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ? কেন ?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, কলকাতার লোক তো। এখানে বন-জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকেন, কি করবেন, তাই কেষ্টগঞ্জের বাজারের দিকে মাঝে মাঝে কেনা-কাটা করতে আসেন—

—সে কি বলছিল ?

নিবারণ বলেছিল, তিনিও তো অবাক। তিনি বলছিলেন,

তোমার কর্তামশাইকে বল একবার সাধুকে দেখে আসতে, সাধু সব বলে দেবেন, বড় ভাল গুরু পেয়েছে দুলাল সা' মশাই—

—হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি ওই চাঁড়ালের বাড়িতে, আমি ওই নেমক-হারামের বাড়িতে যাচ্ছি, যেতে আমার বয়ে গেছে।

তার পর উঠে যাবার আগে বোধহয় আর একবার লুচি-ভাজার গন্ধটা নাকে এসে লাগল। নাকটা একবার হাত দিয়ে টিপে ধরলেন, তার পর জিজ্ঞেস করলেন, সাধু বেটা কবে যাবে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, কাল সকাল বেলায়। এই দুদিন ধরে তো কেবল খাওয়া-দাওয়া উৎসব চলছে, আজকেই শেষ খাওয়া—আপনি যাবেন?

—তুমি থাম! আমি কখনও লুচি খাই নি জীবনে?

বলতে বলতে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়া আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল। বড়গিন্নী তখনও ঘরে আসে নি। বিছানায় শুতে গিয়েও আবার কি ভাবলেন। জানালাটা খোলা ছিল। অনেক আলো, অনেক উৎসবের আয়োজন হয়েছে ওদিকে। কর্তামশাই একবার সেই দিকে চাইলেন। তার পর আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেলেন। তার পর কোমরের ঘুন্‌সী থেকে চাবিটা বার করে লোহার সিন্দুকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কতদিনকার সিন্দুক, আর কতদিনকার তালা। ইতিহাসের পলি পড়ে পড়ে সব ঢেকে গিয়েছে। একদিন কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য এই সিন্দুক খুলেই টাকা বার করেছেন, হীরে মুক্তো সোনা বার করেছেন। তখন এ-সিন্দুক ভর্তি ছিল। তখন জমিদারীর আমদানী হলেই সে-সব এর ভেতরে এসে ঢুকত। প্রথম যুদ্ধের সময় চালের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে, যা-কিছু লাভ হয়েছে সবই জমেছে এই সিন্দুকে। সিন্দুকটার সামনে গিয়ে কীর্তীশ্বর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথাকার কোন্ কর্মকারের হাতে-গড়া সিন্দুক যেন

হঠাৎ বড় মুখর হয়ে উঠল। ছোটবেলায় এই সিন্দুকেই রোজ মা সিঁদুর লাগিয়ে দিতেন নিজের হাত দিয়ে। তারপর গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতেন। এ সেই সিন্দুক। এই সেদিনও আর একটা বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। কোথায় জার্মানীতে না আমেরিকায়। কীর্তীশ্বর তার খবরও রাখেন নি। শুধু মাঝে মাঝে দেখেছেন কেষ্টগঞ্জের ওপর দিয়ে উড়ো জাহাজ উড়ে যাচ্ছে। লোকে বলত—বোমা ফেলতে যাচ্ছে বর্মা-মুলুকে। যুদ্ধ যেখানেই হোক, সেবারের মত একটা পয়সাও আমদানী হয় নি তাঁর। একটা পয়সাও এর ভেতরে এসে ঢোকে নি। জমিগুলো বেচে যা টাকা পেয়েছেন তা পেটে খেতেই ফুরিয়ে গেছে। কীর্তীশ্বর সেইখানে দাঁড়িয়েই একটা একটা করে চাবি খুঁজে খুঁজে তালার গর্ততে লাগাবার চেষ্টা করলেন। অতীতের স্বপ্নরা যেন এই রাত্রে আবার পাখী হয়ে তাঁর মাথার ওপর এসে উড়তে লাগল।

—তুমি এখানে?

চমকে উঠেছেন কীর্তীশ্বর। হঠাৎ পেছন ফিরেই দেখলেন বড়-গিন্নী। তার পর আর দ্বিধা না করে হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন সিন্দুকের অন্ধকারের ভেতর। যেন অনেকগুলো আশা এক সঙ্গে বস্তু হয়ে তাঁর হাতে ঠেকল। আশাগুলো যেন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী হতে চাইছে। অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না। অন্ধকারে তাদের চেনা যায় না। অন্ধকারে শুধু তাদের অনুভব করা যায়। তাই যতগুলো পারলেন ততগুলো তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। তার পর আবার সিন্দুকের ডালাটা নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড়গিন্নী জিজ্ঞেস করলে, ওগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ এখন?

কীর্তীশ্বর কথা বললেন না।

বড়গিন্নী পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এসে আবার জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছ, বলছ না যে?

কীর্তীশ্বর তখন নাগালের বাইরে চলে গেছেন। তাঁর কানে কথাটা গেল কি গেল না, তাও বোঝা গেল না। শুধু তাঁর খড়মের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীচের বারান্দার পাশে বৈঠক-খানার ভেতরে অস্পষ্ট হয়ে মুছে গেল।

সেই অত রাত্রে কর্তামশাই নিবারণকে নিয়েই এসেছিলেন এ বাড়িতে। উৎসব-অনুষ্ঠান যা-ই হোক না কেন, চেহারা দেখে মনে হয় যেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। কেউ দেখতে না পেলেই হল। কর্তামশাই এই এতদিন পরে এসেছেন এখানে। নিজেরই দেওয়া জমি। হরিসভার নামে দান করেছিলেন দুলাল সা'কে। কিন্তু তখন কি জানতেন এখানে এত বড় প্রাসাদ গড়ে তুলবে দুলাল সা'? আর প্রাসাদ গড়ে নিজের বসত-বাড়ি করবে সেটাকে?

—তুমিই আগে ভেতরে যাও নিবারণ, বল গিয়ে কর্তামশাই এসেছেন।

—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেটা কি ভাল দেখাবে?

কর্তামশাই রেগে গেলেন, বললেন, যা বলছি তুমি তাই কর না—

এর পরে আর নিবারণের দাঁড়ানো চলে না। নিবারণ ভেতরেই ঢুকছিল। কর্তামশাই বাইরে থেকে বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ইলেকট্রিক লাইট নিয়েছে দুলাল সা'। ইলেকট্রিক লাইটের তলায় শ্বেত-পাথরের পৈঠেগুলো চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে। একটু দূরেই কলাপাতা মাটির খুরি-গেলাস পড়ে আছে। সেখানে নেড়ি কুকুরের জটলা। লুচি-ভাজাটা বোধহয় বন্ধ হয়েছে। সেই গন্ধটা আর নেই তেমন। শুধু এঁটো কলাপাতার গন্ধেই জায়গাটা ভরে আছে।

কিন্তু নিবারণকে আর বেশি দূর যেতে হল না। সামনে বুঝি নিতাই বসাক আসছিল। একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে।

আর দূরে কর্তামশাইকে দেখে দৌড়ে এসেই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছে।

—থাক, থাক নিতাই, থাক থাক—

নিতাই বসাক কিন্তু তবু ছাড়ে না। বললে, না কর্তামশাই, পায়ে হাত না দিতে পারলে আমি এখান থেকে উঠছি নে—

শেষে কর্তামশাই নিতাই বসাককে ধরে তুললেন। বললেন, দুলালের বাড়িতে নাকি কোন্ সাধু এসেছে শুনলাম নিতাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই, দুলাল তখন থেকে দুঃখু করছিল আপনি এলেন না বলে! আমাদের যে আজ কি সৌভাগ্য!

কর্তামশাই বললেন, আর স্বাস্থ্য তো তেমন নেই নিতাই, তাই কোথাও বড় বেশি বেরুই নে।

—চলুন চলুন—ভেতরে চলুন—

কর্তামশাইকে ধীরে-সুস্থে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে চলল নিতাই। বললে, এই বাড়ি হবার সময়ও আপনাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তখন আপনি আসতে পারেন নি, তারপর দুলালের বড়ছেলে বিজয়ের বিয়ের সময়ও আপনাকে বলেছিলাম, তখনও আপনি আসতে পারেন নি, এ কি আমাদের কম আপসোস কর্তামশাই?

কর্তামশাই চলছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আর চারদিকের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। এত বড় বাড়ি করেছে দুলাল সা'। সব সেই চুরির পয়সায়! এতদিন যা শুনেছিলেন সব যেন অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। চুরির পয়সায় কি এত কিছু হয়? শুধু ঐশ্বর্য নয়, এই সুখ, এই শ্বেত-পাথর, এই ইলেকট্রিক লাইট, এই উৎসব! সব মিথ্যে শুনেছিলেন তাহলে?

নিবারণও পেছন পেছন আসছিল। কর্তামশাই পেছন ফিরে বললেন—নিবারণ, এস—

যেন নিবারণ সঙ্গে না থাকলে তিনি জোর পাবেন না।

সঙ্গে নিবারণ থাকা চাই। তারপর আবার বললেন—ওগুলো আছে তো ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে—

তারপর যেন নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যেই নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে বললেন—কতগুলো কুষ্ঠি এনেছিলাম—

নিতাই বসাক বললে—তা কুষ্ঠি আনবার কি দরকার ছিল ? বাবা তো মুখ দেখেই ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিচ্ছেন—

কর্তামশাই যেন আশা পেলেন। বললেন—সব ? সব ঠিক-ঠিক বলে দিচ্ছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের সকলকে। দুলাল তো কাল থেকে একেবারে বাবার পা আর ছাড়ে নি—

হঠাৎ সামনে কে যেন এসে দাঁড়াল। এসে কর্তামশাইকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল।

নিতাই বসাক বললে—এই হল আমাদের নতুন-বৌ—

নতুন-বৌ ? কর্তামশাই চিনতে পারলেন না।

—আজ্ঞে, বিজয়ের বৌ। দুলালের পুত্রবধূ।

বিজয় ! কাউকেই চেনেন না কর্তামশাই ! কবে বিজয় হল, কবে তার বউ এল বাড়িতে, সে খবর শুধু কানেই এসেছে এতদিন। দেখেন নি কাউকেই।

তবু বললেন—বিজয় ! বিজয় বুঝি দুলালের বড় ছেলে ?

নিতাই বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিজয় তো এখানে নেই এখন, সে আপনাকে দেখলে খুব খুশী হত !

—কোথায় সে ?

—আজ্ঞে, বিলেতে। বিলেতে ডাক্তারি পড়ছে।

কথাটা যেন তীরের মত বিঁধল কর্তামশাই-এর কানে। দুলাল

সা শুধু বাড়ি-গাড়ি ঐশ্বর্য করে নি, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকেও মানুষ করেছে। এ সমস্তই কি চুরির টাকায়? সমস্তই কি মিথ্যের দাবিতে?

—এস নতুন-বৌ, এঁকে প্রণাম কর!

কর্তামশাই চমকে উঠলেন। বললেন—থাক, থাক, আর প্রণাম করবার দরকার কি?

নতুন-বৌ কিন্তু এক-পাও এগোয় নি। সেখানে দাঁড়িয়েই বললে—কাকে প্রণাম করতে বলছ তুমি কাকাবাবু? তোমাদের যিনি অপমান করেন, যিনি তোমাদের দেখলে গালাগালি দেন, তাঁকে তুমি কোন্ আক্কেলে প্রণাম করতে বলছ আমাকে শুনি?

নিতাই বসাকও একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—দেখছেন তো কর্তামশাই, আজকালকার মেয়েদের কথা বলার ধরন-ধারণ?

নতুন-বৌ তবু থামল না। তার জিভের ধার তখনও তেমনি তীক্ষ্ণ করে বললে—আজকালকার মেয়েদেরও মান-অপমান জ্ঞান কর্তামশাই-এর মতই টন্‌টনে কাকাবাবু, তারা অত সহজে ভোলে না—

—তুমি থাম তো নতুন-বৌ। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় জান না। চলুন কর্তামশাই, সামনে, সামনের ঘরেই বাবা আছেন—চলুন—

বলে নিতাই বসাক কর্তামশাইকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলল।

মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল বন্ বন্ করে। তবু পাশেই চামর নিয়ে একজন চাকর বাবার মাথার ওপর দোলাচ্ছে। দুলাল সা' উপুড় হয়ে পড়ে আছে বাবার পায়ের সামনের গদির ওপর। বাবার হাত দুলালের মাথায়। নিতাই বসাককে বেশি কিছু বলতে হয় নি। সে একেবারে কর্তামশাইকে বাবার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কর্তামশাই-এর পেছনে নিবারণও বসে আছে। নিতাই

বসাক একতাড়া কুষ্ঠি সামনে ফেলে দিয়েছে। তা প্রায় খান পনেরো হবে। গোল করে পাকানো হলদে রঙ-এর কাগজের বাণ্ডিল।

নিতাই বসাক ঢুকেই বাবার সামনে বাণ্ডিলটা রেখে দিয়েছিল। আর যা বলবার তাও বলেছিল।

তারপর ধূপ আর ধুনোর গন্ধের ভারে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন কেমন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছিল। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলে কার্তীশ্বর ভট্টাচার্য আজ নিজে এসেছেন দুলাল সা'র বাড়ি—এও যেন একটা ঘটনা। কত লোকই তো এসে খেয়ে-দেয়ে বাবাকে প্রণাম করে সাধ্যমত প্রণামীও দিয়ে গেল। কর্তামশাই আসেন নি বলে কেউই তো আপসোস করে নি। কেষ্টগঞ্জের বর্তমান ইতিহাসে কর্তামশাই কতটুকু! তাঁর আসা-না-আসার জন্যে কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়? কিন্তু তবু কেন তিনি এলেন? এও কি তাঁর দুর্বলতা? দুলাল সা' লোক ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছে বলে কি তাঁর হিংসে? নইলে এতবার খোসামোদ করার পরেও তিনি যখন একবারও আসেন নি, তবে আজ কি করতে এলেন? কুষ্ঠি দেখাতে? তাঁরও ভাল সময় আছে কিনা তাই জানতে? কিন্তু সে তো শিরোমণি বাচস্পতি বলেই দিয়েছিলেন চৌষট্টি বছর আগে, তাঁর জন্মের সময়। আজই তো তাঁর চৌষট্টি বছর বয়েস হল! নীচ জাতীয় লোকের সংস্পর্শে তাঁর বিপদ আছে। তবে কি এখানে এসে তাঁর কোনও বিপদ হবে?

কর্তামশাই পাশে নিবারণের দিকে চাইলেন।

একটার পর একটা দুর্যোগ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গিয়েছে। কই, তখন তো তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েন নি। কেন তিনি এখানে এলেন? নিজের পিঠে নিজেরই তাঁর চাবুক মারতে ইচ্ছে হল। অথচ কত লোককে তিনি নিজেই চাবুক মেরেছেন একদিন। সিদ্ধেশ্বরকেই তো একদিন চড় মেরেছিলেন! কই, সেদিন তো তিনি এমন ভেঙে পড়েন নি। আর বৌমা? বৌমাও যদি

একটু শক্ত হত তখন তাঁর মত। বৌমাও একদিন চলে গেল। বড় আঘাত পেয়েছিলেন কর্তামশাই সেদিন। নিজে দেখে বেছে পুত্রবধূ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভট্টাচার্য-বংশের কুললক্ষ্মী আবার ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠবে পুত্রবধূর আবির্ভাবে। অথচ এই এখনই দুলাল সা'র পুত্রবধূকে দেখে তাঁর নিজের পুত্রবধূর কথাই আবার মনে পড়ে গিয়েছিল।

পাশের নিবারণের দিকে ফিরে বললেন—কেমন কাটা-কাটা কথা দেখলে তো নিবারণ ?

নিবারণ বুঝতে পারলে না। বললে—আজ্ঞে, কার কথা বলছেন ?

—ওই দুলাল সা'র বেটার বউয়ের।

কর্তামশাই বললেন, একবার ভাবলাম বউটার গালে ঠাস্ করে চড় মারি—

—আজ্ঞে, কথাগুলো ভাল নয় তো! আমাকেও অমনি করে কথা বলে।

কর্তামশাই বললেন, নেহাত এদের বাড়িতে এসেছি তাই কিছু বললাম না—

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, না বলে ভালই করেছেন। পরস্ত্রী তো।

কর্তামশাই বললেন, রেখে দাও তোমার পরস্ত্রী! নিজের মেয়ে হলে আমি কেটে দু'খান করে ফেলতাম না ?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, দুলাল সা' বলে ওই নতুন বউই নাকি এ সংসারের লক্ষ্মী!

—কি রকম ?

কর্তামশাই যেন ভুলে গেলেন কোথায় বসে আছেন তিনি। বললেন, বলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেই তো। ওই বউ আসার পর থেকেই তো

দুলাল সা'র অবস্থা ফিরল। ছেলে বিলেত গেল, আগে টিমটিম করে চলছিল, এখন রমারম অবস্থা। ওই নতুন-বউই এ বাড়ির সব কর্তামশাই—দুলাল স'ার নিজের তো বউ নেই। সে আগেই গত হয়েছে।

কর্তামশাই-এর কথাগুলো ভাল লাগছিল না শুনতে। এখানে এসে এতক্ষণ বসে থাকতে থাকতে যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আশে পাশে দু'চার জন ভক্ত তখনও হাতজোড় করে চোখ বুঁজে বসে আছে। কারও মুখেই কোনও কথা নেই। এমনি চুপ করে দুলাল সা'র ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখবার জন্যেই এসেছিলেন নাকি তিনি?

কর্তামশাই নিবারণকে আবার ডাকলেন, নিবারণ—

—আজ্ঞে?

কর্তামশাই বললেন, চল, চলে যাই, মোহরটা দিয়ে দাও—

নিবারণ নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে একটা মোহর বার করে কর্তামশাই-এর দিকে এগিয়ে দিতে গেল। জাহাঙ্গীরের আমলের সোনার মোহর। খাঁটি সোনার তৈরি।

কর্তামশাই বললেন, না, তুমিই দাও—

বাবার সামনে একটা রূপোর থালা পাতা ছিল। তার ওপর রূপোর টাকা, কাগজের নোট পড়ে আছে। নিবারণ মোহরটা তারই ওপর ফেলে দিলে। ফেলে দিতেই একটা ঝনাৎ করে শব্দ হল।

কর্তামশাই বললেন, এবার নিতাইকে ডাক নিবারণ, বল আমরা যাব—

নিতাই শুনতে পেয়েছে। শুনেই কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে, সে কি কর্তামশাই, আর একটু বসুন, কুষ্ঠিটা দেখা হোক—

কর্তামশাই বললেন, কিন্তু রাত বাড়ছে, আর তো থাকতে পারি না আমরা, আমার বুকের ব্যথাটা যে বাড়ছে—

—আচ্ছা, আর একটু বসুন।

বলে নিতাই বাবার সামনে নীচু হয়ে হাতজোড় করে কি যেন সব বললে। বাবা ধ্যানস্থ ছিলেন। এবার চোখ খুললেন। বললেন, ভাগ্যফল? কার?

নিতাই বসাক কর্তামশাই-এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বাবা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কর্তামশাই-এর দিকে। তারপর নিজের মনেই যেন বললেন—হতভাগ্য! ভাগ্য আপনাকে পরাস্ত করেছে, আমি তার কি করব? আমার কি হাত আছে?

কর্তামশাই-এর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই নিতাই বসাক সামলে নিলে। বললে, আজ্ঞে, উনি এই কুষ্ঠিগুলো এনেছিলেন, যদি একটু দয়া করে দেখতেন—

বাবা সামনের বাণ্ডিলটা খুলে একটা কুষ্ঠি খুলে ধরলেন। তারপর কি দেখলেন কে জানে। বাবার চোখজোড়া যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

এতক্ষণে কর্তামশাই বললেন, ওটা দেখবেন না, ও মারা গেছে—

বাবা যেন আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মারা গেছে?

—হ্যাঁ, মারা গেছে, পনেরো বছর আগেই মারা গেছে!

—কার কুষ্ঠি এটা? এ আপনার কে?

কর্তামশাই বললেন, ও আমার নাতনী। হরতন।

—আপনি ঠিক জানেন এ মারা গেছে?

নিবারণও চুপ করে শুনছিল। এবার বললে, হ্যাঁ, বহুদিন আগেই মারা গেছে, আজ বেঁচে থাকলে অনেক বয়েস হত—পনেরো বছর আগের কথা।

—কত বয়েসে মারা গেছে?

নিবারণই উত্তর দিলে। বললে, তিন বছর বয়েসে।

বাবা যেন আরও মনোযোগ দিয়ে কুষ্ঠিটা দেখতে লাগলেন এবার। কর্তামশাই নিবারণের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর সেখান থেকে নিতাই বসাকের মুখের দিকেও দৃষ্টি ফেরালেন। কেমন? তোমাদের মহাপুরুষের বিদ্যে ধরা পড়েছে এবার। নিবারণও যেন মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। নিতাই বসাকই একটু বিব্রত হয়ে উঠল। বাবার পরাজয় যেন নিতাই বসাকেরই পরাজয়। দুদিন ধরে এত লোক এসে পরীক্ষা করে গেছে, কেউ ধরতে পারে নি। এতক্ষণে কর্তামশাই-ই যেন প্রথম ধরে ফেললেন। অথচ নিতাই বসাক খবরটা যে জানে না, তা নয়। দুলাল সা' জানে, নিতাই বসাক জানে। কেষ্টগঞ্জের তাবৎ লোক সবাই জানে। সিদ্ধেশ্বরের প্রথম সন্তান। তার অন্নপ্রাশন ঘটা করেই করেছিলেন কর্তামশাই। কর্তামশাই-এর বাস্তুভিটে নতুন করে আবার সাজিয়েছিলেন। কত লোক এসেছিল, কত লোক খেয়ে গিয়েছিল। তখন তো এমন দশা হয় নি কীর্তীশ্বরের। তখন সিদ্ধেশ্বরও ছিল।

দুলাল সা'র যেন এতক্ষণে ধ্যান ভাঙল।

সে উঠে বসল। 'বাবা' বলে একটা ভক্তির হুঙ্কার ছাড়ল। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখলে।

নিতাই বসাক দুলালকে বললে, কর্তামশাই এসেছেন, চেয়ে দেখ দুলাল—

দুলাল সা' বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে কর্তামশাই-এর দিকে। তারপর আবার শিবনেত্র হয়ে বাবার পায়ের সামনে ডান্‌লোপিলো-গদির উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কর্তামশাই ইঙ্গিত করলেন নিবারণকে। বললেন, চল নিবারণ, উঠি—

নিবারণ কুষ্ঠিগুলো গুছিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ বাবার মুখে কথা ফুটল। বললে, এ মরে নি। মারা যেতে পারে না এ। জাতিকার পরমায়ু এখনও আছে—

নিতাই বসাকও একটু মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল।

বললে, কিন্তু বাবা, হরতন যে মারা গেছে, আমরা যে সবাই জানি!

তখনও বাবা কুষ্ঠিটা নিয়ে একমনে দেখছিলেন। এবার নিবারণের দিকে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, অষ্টমে বৃহস্পতি, এ জাতিকা অল্পায়ু নয়, দশমে শুক্র, চতুর্থে লগ্নপতি বুধ তুঙ্গী—

কুষ্ঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে নির্বিকার হয়ে গেলেন বাবা।

কিন্তু কর্তামশাই উঠতে গিয়েও আর উঠতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু তাকে যে চণ্ডীতলার শ্মশানে সৎকার করে আসা হয়েছে।

বাবা মাথা নাড়তে লাগলেন।

—না, এ নাতনী আপনার এখনও জীবিতা। আপনার বংশের লক্ষ্মীই ছিলেন ইনি। এঁকেই আপনি গৃহ থেকে দূর করে দিলেন? গৃহলক্ষ্মীকে কেউ ত্যাগ করে?

কর্তামশাই-এর মুখখানা শিশুর মত সরল হয়ে গেছে। এ আজ কি কথা শুনছেন তিনি! তিনি একবার নিতাই বসাকের মুখের দিকে চাইলেন। নিবারণ কর্তামশাই-এর দিকে চেয়েছিল। সে-ও যেন হতবাক হয়ে গেছে। এই পনেরো বছর পরে এ কি শুনছেন তিনি!

—এঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আন্নুন আপনি। আপনার গৃহে নিয়ে আসুন। আবার আপনার গৃহ ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে, আবার আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে।

—কিন্তু সে যে মারা গেছে। আমি যে চণ্ডীতলার শ্মশানে গিয়ে তাকে সৎকার করে এসেছি।

বাবা হাসলেন।

—আপনি নিজে তার সৎকার করেছেন? আপনি ভাল করে স্মরণ করে দেখুন তো!

কর্তামশাই কিছু ভাবতে পারছেন না আর তখন। নিবারণের দিকে ফিরলেন তিনি আবার। নিবারণও তখন হতভম্ব দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। পনেরো বছর আগের কথা। এতদিন পরে সে স্মরণ করা কি অত সহজ। তখন সিদ্ধেশ্বর ছিল। কর্তামশাই-এর বড় আদরের নাতনী ছিল হরতন। সেই হরতন এখনও বেঁচে আছে? সেই হরতনই তাঁর গৃহলক্ষ্মী? সে ফিরে এলে আবার তাঁর গৃহ ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে?

কর্তামশাই যেন সব মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন আবার।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন—আপনি নিজেই তার সৎকার করেছিলেন?

কর্তামশাই বললেন, না।

—তবে? তবে কে সৎকার করতে শ্মশানে গিয়েছিল?

কর্তামশাই বললেন, আমার ছেলে সিদ্ধেশ্বর গিয়েছিল। আমি নিজে যাই নি। আমার বড় আদরের নাতনী ছিল হরতন, তার সৎকার করতে আমি যেতে পারি নি, তাই···

তারপর হঠাৎ নিবারণের দিকে ফিরে বললেন, নিবারণ, তুমি গিয়েছিলে? তোমার কিছু মনে আছে?

নিতাই বসাক এবার নিবারণের মুখের দিকে চাইলে।

দুলাল সা' হঠাৎ ভক্তির আধিক্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—বাবা, তুমিই সত্য···তুমিই সত্য, ভব-সংসারে আর সব মিথ্যে বাবা···

ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরখানা তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে আরও। কে বুঝি ধুনুচিতে আরও খানিকটা ধুনো গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরটা সব মন দিয়ে শুনছিল। তার হাতের চামরটাও যেন থেমে গেছে হঠাৎ। যারা এতক্ষণ হাতজোড় করে চোখ বুঁজে বাবার ধ্যান করছিল, তারা এবার চোখ খুললে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া চারদিকে। এই বিংশ-শতাব্দীর কেষ্টগঞ্জে হঠাৎ যেন আবার মধ্যযুগ ফিরে এল রাতারাতি।

দুলাল সা' এবার আর পারলে না। সেই উপুড় অবস্থাতেই হাউ-মাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠল, ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠল—ভক্তি দাও বাবা, ভক্তি দাও—

কর্তামশাই-এর মুখখানার দিকে চেয়ে নিতাই বসাকও চেঁচিয়ে উঠল—জয় বাবা গুরুদেব—

আর কর্তামশাই-এর মনে হল তিনি যেন পাগল হয়ে যাবেন। নিবারণের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন—কি হল, তোমার মনে পড়ছে না?

বিপদ হল নিবারণের। সে প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। তারও বয়স হয়েছে। এ বয়সে কি আর সেই আগেকার স্মরণশক্তি আছে? না কি, নিবারণ সেই আগেকার নিবারণই রয়েছে? তারও তো মাথায় টাক পড়েছে। তারও তো চুল পেকেছে। তারও তো দাঁত নড়ছে।

—বাবা!

হঠাৎ দরজার দিক থেকে মেয়েলি গলার শব্দ শুনে সবাই চেয়ে দেখলে সেখানে নতুন-বৌ এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন-বৌ বললে, রাত অনেক হল, বাবার শরীর খারাপ, সারাদিন জলগ্রহণ করেন নি, সকলকে এবার উঠতে বলুন কাকাবাবু—

অন্ধকার পথ। আর কর্তামশাই-এরও চোখের দৃষ্টি আগেকার মতন নেই। বাড়ি যাবার পথে কর্তামশাই আর থাকতে পারলেন না। বললেন, এর মধ্যেই তুমি সব ভুলে গেলে?

নিবারণও তো বুড়ো হয়েছে। তারও তো স্মরণশক্তি কমে আসতে পারে, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হতে পারে। কিন্তু কর্তামশাই যেন তা আর মানতে চান না। সেই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যেমন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা ছিল, এখন কি করে সে-ক্ষমতা থাকবে? এই যে এতগুলো বছর মাথার ওপর দিয়ে গেল, চেহারায় তার ছাপ রেখে যাবে না? নিবারণের চোখের-ওপর দিয়েই তো ভট্টাচায্যি-বাড়ির ঐশ্বর্যের ইঁট একটা একটা করে খসে পড়ল। তারই চোখের ওপর দিয়েই তো কর্তামশাই-এর অহঙ্কার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অথচ ওই তুলাল সা', ওই নিতাই বসাক একদিন নিবারণকে দেখেই খাতির করত।

কর্তামশাই অন্ধকারে হোঁচট খাবেন বলে নিবারণ হাতটা ধরতে গেল।

কর্তামশাই হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, ছাড়ো, হাত ধরতে হবে না—

—আজ্ঞে, এইখানটায় একটা গর্ত আছে।

—থাক্ গর্ত, আমি তোমার মত কানা নই।

তারপর যেন নিজের মনেই গজ্-গজ্ করতে লাগলেন, আমারও হয়েছে জ্বালা, কপালের গেরো, নইলে এমন সর্বনাশ হবে কেন?

এমন জানলে আমি তো নিজেই শ্মশানে যেতাম। তোমাদের ওপর ভার দিয়ে এই তো সর্বনাশ হল। এখন কি করি? এখন যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।

নিবারণের নিজেকেই যেন অপরাধী করতে ইচ্ছে হল।

বললে—আমার যেন মনে হচ্ছে আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। আমিই তো ছোটবাবুকে ডেকে আনলাম।

—তা, সেই কথাটা তখন সাধু-বাবার সামনে বলতে পারলে না? তখন তো তোমার মুখ বোবা হয়ে গেল!

—আজ্ঞে, আমি তো ভাবছিলাম সেই কথাই বলব। কিন্তু আমি বোধহয় সৎকারের সময় ছিলাম না। ছোটবাবু আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। বললে, তুমি ফিরে যাও সরকার-কাকা, তুমি বাবাকে দেখ গিয়ে একবার—

কর্তামশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন। বললেন—তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত থাক নি?

—আজ্ঞে, থাকব কি করে? ছোটবাবু অমন করে বললে, আর আপনার শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না।

—রাখ আমার শরীরের কথা! শরীরের আমার কি হয়েছে শুনি? আজ হরতন বেঁচে থাকলে আমার শরীরের এমন দশা হত! না, দুলাল সা'ই এই রকম করে আমার চোখের সামনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠত?

নিবারণ বললে—আমি কি এমন হবে জানতাম কর্তামশাই? জানলে কি আর মরতে চলে আসি?

কর্তামশাই থামিয়ে দিলেন। বললেন—থাম, তোমার আর মড়াকান্না কাঁদতে হবে না। তার পর কি হল বল?

—আজ্ঞে, তার পর আর কি হবে? আমি চলে এলাম।

—তার পর?

—তার পর এসে দেখলাম আপনি অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলাম শ্রীনাথপুর থেকে।

কর্তামশাই এবার ক্ষেপে গেলেন। বললেন—আমার কথা তোমায় কে জিজ্ঞেস করেছে? বলি, সিধু কখন ফিরে এল? সিধু ফিরে এসে তোমায় কিছু বলেছিল?

নিবারণ তখন আকাশ-পাতাল করছে। অত দিনের কথা কেমন করে মনে থাকবে তার? সেই পনেরো-ষোল বছর আগেকার ঘটনা। তখন এই কেষ্টগঞ্জই এ রকম ছিল না। দুলাল সা' আর নিতাই বসাক তখন সবে হরিসভার চাঁদার খাতা নিয়ে এর-ওর কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর তাদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল ছোটবাবু। কর্তামশাই-এর নাতনী তখন হেসে-খেলে বেড়ায়।

তখন হরতন-অন্ত প্রাণ কর্তামশাই-এর। কর্তামশাই বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকেন। লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। কথাও বলেন তাদের সঙ্গে। দেশের হাল-চাল নিয়ে সবাই পরামর্শও নেয় তাঁর কাছে। তখন কর্তামশাই-এর পরামর্শ না নিয়ে কেষ্টগঞ্জের কোনও কাজই হত না বলতে গেলে। ইংরিজী কাগজই হোক্ আর বাংলা কাগজই হোক্, সবগুলোই এসে জড় হত তাঁর বৈঠকখানায়।

খবরের কাগজ শুনতে শুনতে কর্তামশাই বলতেন, ওইখানটা আর একবার পড়তো ভানু?

ভানু কলকাতা থেকে লেখাপড়া শিখে গরমের ছুটিতে আসত দেশে। দেশে এলেই খবরের কাগজের লোভে কর্তামশাই-এর বৈঠকখানায় এসে বসত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর পড়ে শোনাত সবাইকে। ইংরিজী সবাই বুঝত না। ভানুই ইংরিজীর মানে বুঝিয়ে দিত।

—ওইখানটা আর একবার পড় তো ভানু, কথাটা যেন ভাল মনে হচ্ছে হে!

ভানু পড়তে লাগল, জেনারেল অকিন্‌লেক্ বলেছে :

'All political matters will be in the hands of the new War Member under whom I shall serve, just as the Commanders in Britain serve under Civil Ministers.'

কর্তামশাই বললেন, ভাল কথা। তাহলে তোমার কি মনে হয় ভানু, ইংরেজ বেটারা তাহলে সত্যি সত্যিই দেশ ছেড়ে চলে যাবে মনে কর ?

ভানু বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, তাই তো মনে হচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশন তো ওই জন্যেই এসেছে। আর গান্ধীও তো তাই বলছেন।

গান্ধীর নাম শুনেই কর্তামশাই ক্ষেপে যেতেন একেবারে। বলতেন, আরে রাখ তুমি গান্ধীর কথা। ওর কথা আর বলো না ! ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ভানু বলত—আজ্ঞে, গান্ধী তো কিছু অন্যায় বলেন নি।

—অন্যায় বলে নি মানে ?

রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন কর্তামশাই। গান্ধীর প্রশংসা শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। ঘরশুদ্ধ লোক জানত কর্তামশাই গান্ধীর নাম সহ্য করতে পারতেন না।

কর্তামশাই বলতেন, চরকা কাটতে কে বললে শুনি ?

সবাই বলত—আজ্ঞে গান্ধী !

—আর বোম্বাইতে কে কাপড়ের কল খুললে শুনি ?

এবার সবাই বিপদে পড়ত। এ ওর মুখের দিকে চাইত ফ্যাল ফ্যাল করে।

কর্তামশাই বলতেন, বাঙালীদের বললে চরকা কাটতে আর বোম্বাইতে গুজরাটীদের গিয়ে গান্ধী বললে কাপড়ের কল খুলতে ! এতেও তুমি সাঁচ্চা লোক বলবে গান্ধীকে ?

গান্ধী কবে কোথায় চরকা কাটতে বলেছেন বাঙালীদের, আর কবে কোথায় গুজরাটীদের কাপড়ের কল খুলতে বলেছেন, তা কেউ মনে করতে পারলে না।

কর্তামশাই সকলের মুখের দিকে চাইতেন, বলতেন—কই হে, বছিরুদ্দি শেখ, তুমি কিছু বলছ না যে ?

বছিরুদ্দি শেখ্ কর্তামশাই-এরই পুরনো প্রজা। বলত—আজ্ঞে, কর্তামশাই আপনি যখন বলছেন তখন কি আর মিথ্যে বলছেন ?

কর্তামশাই বলতেন—তা বাপু, তোমাদের জিন্না সাহেবও লোক ভাল নয়, এও বলে দিচ্ছি—

—আজ্ঞে তা তো নয়ই—

কর্তামশাই বলতেন—ও আমাদের গান্ধীটাও লোক ভাল নয়, তোমাদের জিন্নাটাও লোক ভাল নয়, সব বেটা পাজির পা-ঝাড়া !

তারপর সকলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতেন—কি, তোমরা সব কথা বলছ না যে ? ঠিক বলি নি ?

সবাই বলত—আজ্ঞে কর্তামশাই, আপনি ঠিকই বলেছেন—

কর্তামশাই বলতেন—আসলে ভাল লোকই আজকাল কমে আসছে সংসারে। দেখছ না, যত ভাল-ভাল লোকগুলো সব একে একে পট্ পট্ করে মরে যাচ্ছে।

তারপর বলতেন—এই দেখ না, সুভাষ বোসটা ভাল লোক ছিল, পট্ করে মরে গেল।

বলেই ভানুর দিকে চেয়ে বলতেন—পড় হে, তুমি থামলে কেন ? তারপর আর কি খবর আছে পড় না—

ভানু পড়তে লাগল। বললে—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, পড়ব ?

—ওই আর একটা খারাপ লোক। বুঝলে হে ! বড্ড কথা বলে। আরে বাপু, যারা কাজের লোক তারা কি এত কথা বলে ?

কাজের নামে অষ্টরম্ভা, কেবল কথার জাহাজ। ওর বাবা লোকটা ভাল ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাম শুনেছ দ্বিজপদ? দ্বিজপদ যে একেবারে কথাই বলে না, কি হল হে তোমার দ্বিজপদ?

দ্বিজপদ বললেন—আজ্ঞে কর্তামশাই, আমি তো শুনছি—

—তা শুনছ কি না আমি বুঝব কি করে? একটু মাঝে মাঝে 'হুঁ' দেবে তো?

এমনি করেই বৈঠকখানা গুলজার হয়ে থাকত সারাদিন। কর্তামশাই সকলকে নিয়ে আসর জমাতেন। সেই ভানু। কলকাতায় পড়ত। শহরের খবরাখবর রাখত আর এখানে এসে কর্তামশাইকে খবরগুলো শোনাত। ভানুকে দেখলেই কর্তামশাই বলতেন—কি গো ভানু, কলকাতার খবর কি বল?

ভানু বলত—আজ্ঞে খবর আর কি বলব, শুনছি নাকি ক্যাবিনেট মিশন আসছে ইণ্ডিয়ায়—

—তার মানে?

কর্তামশাই ক্যাবিনেট মিশন কথাটার মানে বুঝতে পারতেন না।

ভানু বলত—আজ্ঞে তারা আসছে ইণ্ডিয়াকে স্বরাজ দেওয়ার জন্যে। এবার জহরলাল নেহরুকেই বোধহয় ভাইসরয় করে দেবে।

—অ্যাঁ? বল কি? কর্তামশাই চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে, কলকাতায় সেই রকমই তো শুনে এলাম।

কর্তামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন—দেশে আর ভাইসরয় করবার লোক পেলে না? তা হঠাৎ ইণ্ডিয়ার ওপর এত দরদ কেন হল ইংরেজ বেটাদের?

দুলাল সা', নিতাই বসাকও তখন এসে বসত আসরে। তখন তাদের অত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা হয় নি।

কর্তামশাই বলতেন—কি গো, তোমরা কথা বলছ না যে? আমি অন্যায় কিছু বলছি?

দুলাল সা' বরাবরই বিনয়ের অবতার, দুটো হাত জোড় করে বলত—আজ্ঞে, আপনি তো ন্যায্য কথাই বলেন বরাবর—

কর্তামশাই বলতেন—তা তোমরা সেটা আমার দোষই বল, আর গুণই বল, আমি অন্যায্য কথা বলতে পারি নে। আমি খাঁটি কথার মানুষ। তা তার পর ? তারপর পড় ভানু—তুমি চুপ করলে কেন ? পড়ে যাও—

হঠাৎ ভেতর থেকে নাতনীর কান্নার শব্দ আসতেই কর্তামশাই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—হরতন কাঁদে না ?

তারপর নিবারণকে ডাকলেন—নিবারণ, দেখ তো হরতন কাঁদে কেন ?

নিবারণ তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে হরতনকে নিয়ে এল কোলে করে।

—দাও দাও, আমার কোলে দাও—বলে কর্তামশাই হাত বাড়ালেন।

কর্তামশাই-এর কোলে উঠেই হরতন একেবারে চুপ। আহা, কি রূপই ছিল মেয়েটার ! তখনও কর্তামশাই-এর বেশ বয়েস। সেই বয়েসেই কর্তামশাই নাতনীকে একেবারে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—কে মেরেছে মা ? কে বকেছে তোমাকে ?

বলে সেই আসরের মধ্যেই নাতনীকে আদর করতে লাগলেন।

হরতন তখন কর্তামশাই-এর গড়গড়ার নলটা ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

কর্তামশাই দেখে অবাক হয়ে গেছেন, বললেন—দেখছ ভানু, সিধুর মেয়ে কি রকম চালাক হয়ে গিয়েছে—

ভানু বললে—আজ্ঞে, বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে হরতনের—

দুলাল সা' বললে—আহা, ভারি চমৎকার নামটি রেখেছেন কর্তামশাই—

বছিরুদ্দি শেখ বললে—আল্লাতালার দোয়া কি সবাই পায় কর্তামশাই ?

নিতাই বসাক বললে—এর কলকাতায় বিয়ে দেবেন কর্তামশাই—কলকাতায় আজকাল ভাল ভাল সব পাত্র বেরোচ্ছে—বি. এ. এম. এ পাস দেখে নাতজামাই করবেন আপনি—

কর্তামশাই তখন হরতনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কি রে, শুনছিস ? নিতাই বসাক কি বলছে ?

তারপর নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললেন—বুঝলে নিতাই, নিজের বাপের কাছে এ বেটি থাকবে না, রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে কেঁদে ওঠে, তখন বলে দাদুর কাছে যাব। শেষে আমার কোলের কাছে শুয়ে চুপ।

ভানু বললে—তাই তো বলছিলাম কর্তামশাই, খুব বুদ্ধি হবে ওর—

কর্তামশাই বললেন—আসলে হয়েছে কি জান, আমার মা এ জন্মে এই নাতনী হয়ে বউমার পেটে এসেছে। এই মুখখানা দেখ আর ওই আমার মায়ের ফটোখানা দেখ, ঠিক এক রকম মুখ নয় ?

সবাই চেয়ে দেখলে। ভানু দেখলে, বছিরুদ্দি শেখ দেখলে, নিতাই বসাক, দুলাল সা', সবাই দেখলে।

দুলাল সা' বললে—অবাক কাণ্ড তো !

কর্তামশাই বললেন—বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না দুলাল, যেদিন বৌমার ব্যথা উঠল, আমি কিচ্ছু জানি নে, আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হল মা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—কীর্তি, আমি এলাম—আর 'এলাম' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেছে—

এ গল্পও সবাই অনেকবার শুনেছে। কতবার কথা-প্রসঙ্গে কর্তামশাই এ সব গল্প বলেছেন। তখন বক্তা ছিলেন একমাত্র কীর্তীশ্বর আর

শ্রোতা ছিল কেষ্টগঞ্জের সব গ্রামের লোক। তারা নিয়ম করে সবাই আসত যেত, তারপর এক সময়ে কর্তামশাই হরতনকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেন।

বলতেন—এবার উঠি হে, হরতন আবার আমি সঙ্গে না খেলে ভাত খাবে না—

শুধু এক সঙ্গে খাওয়াই নয়, এক সঙ্গে শোওয়া, এক সঙ্গে বসা, গল্প করা, সবই কর্তামশাই-এর হরতনের সঙ্গে। শেষকালে এমন হল, হরতন আর বাপ-মার কাছে যায়ই না, কর্তামশাই-এর কাছেই থাকত দিনরাত। বড়গিন্নী হরতনকে বিছানায় নিয়ে এসে শুইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কর্তামশাইও ছটফট করতেন।

তা এসব সেই পনেরো বছর আগেকার ঘটনা।

এতদিন পরে অন্ধকার রাস্তায় চলতে চলতে দু'জনেরই যেন সেই পনেরো বছর আগেকার ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। পনেরো বছর আগে হলে কি কর্তামশাই এমনি করে এত রাত্রে দুলাল সা'র বাড়িতে অযাচিত হয়ে যেতেন। এই পনেরো বছরে কত কি বদলে গেল। দুলাল সা' উঠল, কর্তামশাই নামলেন। নিবারণের মনে হল কর্তামশাই-এর হাতটা যেন থর থর করে কাঁপছে। নিবারণ আরও জোরে হাতটা চেপে ধরলে। বললে, এখানটা একটু আস্তে, নর্দমা আছে—

কর্তামশাই কিছু কথা বললেন না এবার। নিবারণের হাতে নিজের হাতটা ছেড়ে দিয়ে অবশ হয়ে চলতে লাগলেন।

অথচ আজ সিধু থাকলে কি তাঁকে এই অবস্থায় পড়তে হত! সিদ্ধেশ্বরটাই বা গেল কোথায়।

কর্তামশাই ডাকলেন, নিবারণ!

—তোমার কি রকম মনে হল?

নিবারণ হঠাৎ কথাটার মানে বুঝতে পারল না।

বললে, কার কথা বলছেন ?

—আবার কার কথা ? ওই সাধুর। ও কি সত্যি মনে কর তুমি, না সব বুজরুকী ?

নিরারণ আমতা আমতা করে বললে, আজ্ঞে, আমি তো ঠিক বুঝতে পারলাম না—

কর্তামশাই বললেন, ও-সব কাক-চরিত্র, আমার তো মনে হয় স্রেফ কাক-চরিত্র ! আমার অবস্থা তো বুঝতে পেরেছে। দেখতে পাচ্ছে তো আমার বয়েস হয়েছে, তাই একটু ফষ্টি-নষ্টি করলে আর কি।

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, ফষ্টি-নষ্টি কেন বলছেন ? চেহারা দেখে তো মনে হল মুখে বেশ পবিত্র ভাব—

কর্তামশাই বললেন, তা, তুমি তাকে সৎকার করে এলে, তারপর এখন বেঁচে থাকে কি করে শুনি ?

নিবারণ কিছু উত্তর দিতে পারল না এ-কথার।

—আর তা ছাড়া বেঁচে যদি থাকেই তো এতদিন পরে তো আর তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

খানিকক্ষণ দু'জনের মুখেই আর কোনও কথা বেরোল না। ঘটনার সাক্ষী যদি কেউ থাকে তো সে সিদ্ধেশ্বর, আর সিদ্ধেশ্বরই যে বেঁচে আছে তারই বা ঠিক কি ! অত বড় জোয়ান ছেলে, বি-এ পাস করে বামুনের ঘরে অমন আহাম্মক ছেলে কেন জন্মালো কে জানে ! বউকে বাপের ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে যেতে হয় !

ততক্ষণে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছেন।

সামনের কালকাসুন্দির ঝোপ পেরিয়ে পোড়ো উঠোন। তার পরেই চকমিলান রাজবাড়ি। রাত অনেক হয়েছে। দুলাল সা'র বাড়ির মত এ বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। দেখে-শুনে হাঁটতে

হয়। এককালে হাতী থাকত এখানে। ছুটো বড় বড় হাতী। সে হাতী দেখেন নি কর্তামশাই, শুধু শুনেছেন বাবার কাছে। আর শুধু হাতী নয়। গরু, মোষ, ঘোড়া, ময়ূর এইখানে ঘুরে বেড়াত। আজ অন্ধকার চারদিকে। ভটচায্যি-বাড়ির ঐশ্বর্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্তামশাই-এর নাতনীও কোথায় অন্তর্ধান করল। শেষ ছিল বৌমা। সেই বৌমাও আর আজ নেই। বৌমা থাকলেও না হয় কথাটা তাকে গিয়ে বলা যেত।

সামনেই সিঁড়ি।

নিবারণ সাবধান করে দিলে।

—এইখানটায় সিঁড়ি, সাবধানে উঠবেন।

দরদালান পেরিয়ে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার ভেতরে তখনও নিবারণের তক্তপোশের উপর মশারীটা টাঙানো রয়েছে। তার পাশ দিয়ে সন্তর্পণে কর্তামশাই-এর হাতটা ধরে দোতালার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল নিবারণ। তারপর কর্তামশাই-এর পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগল।

কর্তামশাই বললেন, তুমি আবার উঠছ কেন? তুমি যাও শোও গে যাও, রাত অনেক হয়েছে, আমার চোখ আছে, আমি একলাই যেতে পারব—

বলে একলাই পায়ে পায়ে ওপরে উঠতে লাগলেন কর্তামশাই। কিন্তু সিঁড়ির বাঁকের কাছে গিয়ে হঠাৎ ডাকলেন।

—শোন নিবারণ!

নিবারণ দাঁড়িয়েই ছিল। বললে, বলুন—

—ও সাধু ভোরবেলাই চলে যাবে, না?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, সেই রকমই তো কথা!

হাতে কর্তামশাই-এর সেই কুষ্ঠির বাণ্ডিলটা তখন ধরা রয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলেন খানিক। তারপর সেখানে

সেইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, কুষ্ঠি পড়তে জানে এমন কেউ কেষ্টগঞ্জে আছে তোমার জানা? মানে বেশ পণ্ডিত হওয়া চাই। ওপর ওপর জানলে চলবে না। তেমন আছে কেউ?

নিবারণ বললে, কেষ্টগঞ্জে তেমন তো কেউ নেই—

—তবে কোথায় আছে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে কাশীতে কেউ থাকতে পারে!

—কাশীতে আছে সে তো সবাই জানে! কিন্তু কাশীতে এখন যাচ্ছে কে? তোমার যেমন কথা! লঙ্কায় সোনা সস্তা বলে তো আর···

কথাটা আর তিনি শেষ করলেন না। যেমন উঠছিলেন তেমনি উঠতে লাগলেন আপন মনে।

বড়গিন্নী তখনও জেগে। কর্তামশাই ঘরে ঢুকলেন। তখন বড়গিন্নী কিছু বললে না। কর্তমশাই আস্তে আস্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে গেলেন। সিন্দুকটা কোণের দিকে ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেখানে গেলেন। তারপর অতি কষ্টে লোহার ভারি ডালাটা প্রাণপণে খুলে কুষ্ঠির বাণ্ডিলটা ভেতরে ফেলে দিলেন। আর তারপর ডালাটা আবার আগের মত বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এতখানি পরিশ্রমের পর হাঁফিয়ে গিয়েছিলেন। বুকের ভেতরে যেন দমটা আটকে আসছিল।

—তেলটা বুকে মালিশ করে দেব?

কর্তামশাই বুঝতে পেরেছিলেন, বড়গিন্নী তখনও ঘুমোয় নি। কর্তামশাই না-ঘুমোলে বড়গিন্নী ঘুমোতে পারে না, এটা তাঁর জানা ছিল।

বললেন—থাক, গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না—

এ-সব কথায় বড়গিন্নী কখনও রাগ করে না। আস্তে আস্তে

বিছানা ছেড়ে উঠে কুলুঙ্গী থেকে তেলের বাটিটা নিয়ে এল। তারপর কর্তামশাই-এর বুকে মালিশ করতে লাগল।

দুলাল সা'র বাড়িতে আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত উৎসব গেছে। কর্তামশাই আর নিবারণ যখন চলে গেছে তখন দুলাল সা'র জাপানী ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে গেছে। অত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাম-মাত্র একটু বিশ্রাম করেছে সবাই। তারপরই ভোর চারটে বাজতে-না-বাজতে আবার উঠেছে। ভোরবেলাই যাত্রা।

কেষ্টগঞ্জের লোক তখন সবাই ঘুমিয়ে। আগের দিন দশখানা গ্রামের লোক এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে। তারপর আর অত ভোরে ওঠবার ক্ষমতাই ছিল না কারো। যারা চালানী-কারবারের ব্যাপারী তারাও যে-যার নৌকোয় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে নাক ডাকিয়েছে। কখন দুলাল সা'র নৌকো লেগেছে ঘাটে, কখন গুরুদেবকে নৌকোয় তুলে দিয়েছে দুলাল সা', তা কেউই টের পায় নি। কেষ্টগঞ্জ থেকে গুরুদেবকে নিয়ে নৌকো সোজা যাবে গঙ্গার মোহানায়। সেখান থেকে গুরুদেব নিজের খুশিমত যেখানে ইচ্ছে চলে যাবেন। তারপর নৌকো ফিরে আসবে আবার কেষ্টগঞ্জে। সঙ্গে গেছে দুলাল সা'র নিজের কাছারির লোক। তার হাতে হাজার টাকা দেওয়া আছে। যেখানে যেমন দরকার হবে, খরচা করতে পেছপা করবে না। দুলাল সা', নিতাই বসাক, এমন কি নতুন-বৌ পর্যন্ত ঘাটে এসে গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছে। তারপর যথাসময়ে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে।

তারপর দুলাল সা' নিত্য-নৈমিত্তিক ঘাটের কাজ শুরু করে দিয়েছে। গোবিন্দ বালতি-তেল-গামছা নিয়ে হাজির ছিল। দুলাল সা' সারা ঘাট ঝাঁটা দিয়ে নিজের হাতে ঝাঁট দিয়েছে। তেল

মেখেছে। স্নান করেছে। তখন পূবদিকের আকাশটা একটু একটু ফুন-ফরসা হতে শুরু করেছে।

—কে গো, মুকুন্দ নাকি ?

মুকুন্দ পাল সবে ঘুম থেকে উঠে গাড়ু নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দুলাল সা'কে দেখেই প্রাতঃপ্রণাম করলে। বললে—এ কি সা'মশাই, আজকেও বাদ দেন নি ? আজকেও এত ভোরে উঠেছেন ?

দুলাল সা' হাসতে লাগল মিটি-মিটি।

—এটা তুমি কি কথা বললে মুকুন্দ ? তুমি বিবেচক লোক বলে জানতাম।

—আজ্ঞে, কাল অত রাত অবধি উপোস কাটিয়েছেন, তাই বলছিলাম !

দুলাল সা' হাসতে হাসতে বললে—তা ভাত খেতে তো ভুলে যাই নে মুকুন্দ, আর মা-গঙ্গাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাব ?

—আজ্ঞে, আপনি পুণ্যাত্মা লোক ! আপনার মত ভক্তি যদি পেতাম !

দুলাল সা' বললে—পাবে, মুকুন্দ পাবে। এ আর এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। চেষ্টা করলেই পাবে।

—চেষ্টা তো করি সা'মশাই। কিন্তু আমরা পাপী লোক, আমাদের আর কত হবে ?

দুলাল সা' বললে—কেন হবে না মুকুন্দ ? হবে না বলে কোনও কথা আছে দুনিয়ায় ? একটু লোভ কমাও দিকি নি ! লোভ জিনিসটা বড় নচ্ছার—

মুকুন্দ বললে—আজ্ঞে লোভ তো করি না—

—তা লোভ যদি না কর তো আবার বাড়ি করতে যাচ্ছ কেন ? বাড়ির লোভ কেন তোমার ? টিনের বাড়িতে তোমার শানাচ্ছে না ?

এই আমার দিকে চেয়ে দেখ না, আমার লোভ বলে কোনও জিনিস দেখেছ ? আমার যা কিছু আছে সব তো ঝেড়ে-ফেলে সন্নিসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এত বড় বাড়ি করেছি, কিন্তু শান্তি পেয়েছি ? অত টাকা করেছি, তাতে শান্তি পেয়েছি ? নইলে নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে এই ঘাট ধুই ?

কি কথায় কি কথা এসে গেল। মুকুন্দ তখন আর পালাবার পথ পায় না। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে বললে—আমি তাহলে আসি সা' মশাই এখন—

বলে হন্ হন্ করে ফাঁকা মাঠের দিকে চলে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখে কাছারি-ঘরে নিবারণ বসে আছে বেঞ্চির ওপর।

—কি নিবারণ, এত ভোরে ? কি সংবাদ ?

অত ভোরে নিবারণকে দেখে দুলাল সা' মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, কর্তামশাই ভোরবেলাই পাঠিয়ে দিলেন। গুরুদেব কি চলে গেছেন ?

তখনও গত রাত্রের উৎসবের টুকরো-টুকরো চিহ্ন ছড়ান রয়েছে আশে-পাশে। দুলাল সা'র পোষা ছাগল ফুলের পাপড়িগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। বাড়ির চাকর উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। কাছারি-ঘরের ভেতরে তখনও রাত্রের বিছানা এলোমেলো পড়ে আছে। গুটিয়ে তোলা হয় নি।

নিবারণ আবার বললে—কাল সারারাত কর্তামশাই ঘুমোন নি।

দুলাল সা' বললে—আহা, বুড়ো বয়েসে কি দুর্ভোগ দেখ তো ! তাই তো বলি, তোমার কর্তামশাইকে একটু লোভ ত্যাগ করতে বল তো—দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে !

—আজ্ঞে, লোভ তো তেমন কিছু নেই।

দুলাল সা' বললে—লোভ নেই ? তাহলে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা

আমাকে বেচে দিতে বুক এত ফেটে যাচ্ছে কেন তোমার কর্তামশাই-এর ?

নিবারণ এর উত্তরে কি বলবে বুঝতে পারলে না।

—এত লোভ ভাল নয়, বুঝলে নিবারণ। তোমার কর্তামশাই-এর অনেক বয়েস হল, এখন একটু ধর্ম-কর্ম করতে পরামর্শ দিও। এই আমাকেই দেখ না। আমায় তুমি কখনও লোভ করতে দেখেছ ? লোভ যে কি বস্তু তা এ-জন্মে জানলাম না। তাই কত শান্তিতে আছি দেখ। তোমার কর্তামশাই কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে তা জানবার জন্যে আমার কখনও মাথা-ব্যথা হয় নি নিবারণ—আর এখন তো দীক্ষা নিয়ে সন্নিসী হয়ে গেলাম।

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাকগে, গুরুদেবের সঙ্গে কর্তামশাই-এর কিসের দরকার ছিল ?

নিবারণ হয়তো জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নতুন-বৌ ভেতর-বাড়ি থেকে বাইরে এস পড়তেই তুজনেই সেই দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল।

নতুন-বৌ নিবারণকে দেখে নিয়ে বললে—বাবা, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দিয়েছি, উঠুন—গল্প পরে হবে। উঠুন—

তারপর নিবারণের দিকে চেয়ে নতুন-বৌ বললে—আপনি কি রকম মানুষ সরকার মশাই, সবাইকেই কি আপনার কর্তামশাই-এর মত মনে করেন ? দেখেছেন সকাল বেলা বাবা স্নান করে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, এখন একটু আহ্নিক করতে বসবেন, এখনি আপনার কথা বলবার সময় হল ?

সরকার মশাই আড়ষ্ট হয়েই গিয়েছিল। নতুন-বৌ-এর কথাতে উঠে দাঁড়াল। বললে—আমি তো সা' মশাইকে আটকে রাখি নি—

—তা, কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে বাড়িতে এসে বসে থাকলে কেউ চলে যেতে বলতে পারে ?

—আর বেশি কথা বলতে হবে না মা, আমি নিজেই যাচ্ছি।

বলে নিবারণ উঠল। উঠে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু সা'মশাই ডাকলে।

বললে—রাগ করলে নাকি নিবারণ?

—আজ্ঞে না।

—না রাগ করো না, আমার নতুন-বৌ তোমার মেয়ের মতন, ওর কথায় আমি রাগ করি নে—

নিবারণ বললে—আর রাগ করলে তো আমার চলবে না সা'মশাই, আমি কে? আমি তো হুকুমের চাকর বই কেউ নই? আমার হুকুম হয়েছিল আপনার কাছে আসতে তাই এসেছিলাম, আপনি তাড়িয়ে দিলে আমি চলে যাব—

সা'মশাই বললে—কে কাকে তাড়ায় নিবারণ! এই দেখ না, এই বিজয়ের মা-র কথাই বলছি, আমিই কি তাকে তাড়িয়েছি? তবু সে চলে গেল কেন? কার হুকুমে চলে গেল? কে তিনি? কোথায় থাকেন তিনি? বল, কোথায় গেলে তাঁকে পাই?

বলে প্রশ্নটা নিবারণের দিকে ছুঁড়ে দিলে।

কিন্তু নিবারণের মুখে উত্তরটা যোগাল না। দুলাল সা'র মুখেও যোগাল না। দুলাল সা একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। বললে—বলতে পারলে না তো? কেউ বলতে পারে না। কেউ না। সেই জন্যেই তো দীক্ষা নিলাম নিবারণ! নইলে কি আমার খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই দীক্ষা নেবার জন্যে এত পাগল হই?

নতুন-বৌ আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। কথার মাঝখানেই বাধা দিলে।

বললে—বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার—

বলে জোর করে শ্বশুরকে ভেতরের দিকে নিয়ে গেল।

চণ্ডীতলার দিকেই আগে ছিল শ্মশান। এখনও শ্মশানটা আছে। শুধু একটু দূরে সরে গেছে। তেঁতুলগাছ দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। চণ্ডীতলায় আগে লোকের আনাগোনা বিশেষ ছিল না। যারা মড়া পোড়াতে যেত, তারা দিনমানেই কাজটা সেরে ফেলত। সন্ধ্যের পর বড় একটা কেউ যেতে চাইত না ওদিকে।

কিন্তু এখন হাওয়া বদলে গিয়েছে। তখন কেষ্টগঞ্জ থেকে চণ্ডীতলা পর্যন্ত যেতে রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। এখন পিচ-ঢালা রাস্তা হয়েছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ওই রাস্তার ওপর চাষারা ধান শুকোতে দেয়। সাইকেল টাইকেল সব সেই ধানের ওপর দিয়েই চলাচল করে। তাতে কেউ কিছু আপত্তি করে না। তবে রাস্তার পাশে রাখালরা লাঠি নিয়ে পাহারা দেয়। গরু-ছাগলে না খায়। গরু-ছাগল এলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে—য়্যাই, হুস, হুস—

গরু-ছাগলের উৎপাতটাই বেশি।

চণ্ডীতলায় যেখানে রাস্তাটা শেষ হয়েছে, সেখানেই ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিস। সার সার অনেক বাড়ি হয়েছে নতুন-নতুন। এ-অঞ্চলে এ-রকম বাড়ি এই প্রথম। বেশ সিমেণ্ট-কন্‌ক্রিটের মজবুত দালান। কন্‌ক্রিটের ছাদ সামনের দিকে বাড়ানো। সামনে একটু করে বাগান। রাণাঘাট কলকাতা থেকে ছেলে-মেয়েরা এসে এখানে চাকরি করছে। জেলে-মালো চাষাভূষোদের স্কুল হয়েছে। সেখানে বইখাতা-শ্লেট নিয়ে পড়তে আসে। আগে যারা রাস্তায় ঘাটে-জঙ্গলে খেলা করে, মাছ ধরে, পাখি-শিকার করে বেড়াত, তারা

এখন স্কুলে এসে মন দিয়ে পড়ে। এখন জামা-কাপড় পরে বাপ মা-র কথা শোনে।

এ যেন একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছে এখানে।

ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার নিজের বাড়ির সামনে বাগান তৈরি করে নিয়েছে ভাল করে। প্ল্যানে ছিল তিন-কামরা ঘর। কন্ট্রাকটারকে বলে চার-কামরা করে নিয়েছে। বেশি বয়েস নয় সুকান্ত রায়ের।

নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করেছিল—চাকরিটা যে পেলেন, কারুর সঙ্গে জানাশোনা ছিল?

সুকান্ত রায় বলেছিল, না মশাই, বলতে গেলে স্রেফ লাক—

—আশ্চর্য তো! নিতাই বসাক সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল উত্তরটা শুনে।

—কারুর সঙ্গে আলাপ ছিল না? প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ, কারুর সঙ্গে নয়?

—আজ্ঞে না—

—তাহলে কি করে চাকরিটা পেলেন শুনি? শুধু দরখাস্ত করে?

—না।

সুকান্ত রায় বললে, তাও না—

নিতাই বসাক আরও অবাক! সুকান্ত রায় বললে, আমি মশাই এম-এ পাস করে ফ্যা ফ্যা করে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময়ে এক কাণ্ড হল।

—কি কাণ্ড?

সুকান্ত রায় বললে, কিরণশঙ্কর রায়ের নাম শুনেছেন?

নিতাই বসাক বললে, আ রে কিরণশঙ্কর রায়ের নাম শুনব না? অত বড় কংগ্রেস লীডার, অ্যাণ্টি-সুভাষ বোস—

সুকান্ত রায় বললে, তাঁর মরবার খবর পেয়েই আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির, তখন তাঁর ডেড্-বডি বার করা হচ্ছে, আমি তাঁর সেই খাটের একটা মাথা ধরে শ্মশান পর্যন্ত সারা রাস্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—

—তার পর ?

—খবরের কাগজে সেই প্রসেশনের ছবি বেরিয়েছিল। আমার ছবিটা স্পষ্ট উঠেছে। আমি বুদ্ধি করে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস থেকে সেটা কিনে রেখেছিলাম, যখন চাকরির খবরটা কাগজে বেরুল, আমি সেই ছবিটা নিয়ে সোজা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে খোদ-কর্তার সঙ্গে দেখা করলাম—

—তারপর ?

সুকান্ত রায় বললে, তারপর একটা নমিন্যাল অ্যাপ্লিকেশন করতে হল, আর সঙ্গে সঙ্গে এই চাকরি।

এই হল সুকান্ত রায়ের গভর্নমেণ্ট-চাকরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চাকরিটাই শুধু হল না, বিয়েও হল চাকরির দৌলতে। সুন্দরী বউ পেয়েছে। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ। অজ পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে থাকতে ভাল লাগে না। নিতাই বসাক কলকাতায় যায়। সেক্রেটারিয়েটে দহরম-মহরম আছে। তার সঙ্গে মনের কথাগুলো বলে সুকান্ত রায়। সুকান্ত রায়ের সাজানো বৈঠকখানায় বসে চা খায় নিতাই বসাক। সুকান্ত রায়ের বউও সঙ্গে থাকে। কিছু দরকার হলে নিতাই বসাক বলে—আমাকে বলেন নি কেন, আমি যোগাড় করে দিতাম—

নিতাই বসাক সুকান্ত রায়ের ডান হাত হয়ে গিয়েছিল। নিতাই বসাক গাড়ি পাঠিয়ে দিত। বলত—যেখানে খুশি আপনারা বেড়াতে যান্, গাড়ি তো আমার পড়েই থাকে, আর তা ছাড়া মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন তো আমি কলকাতাতেই থাকি—

গাড়ি ছিল, নিতাই বসাক ছিল, দুলাল সা' ছিল, তাই ব্লক্-ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের কোনও ভাবনা ছিল না। নতুন কাঁচা বয়েস, নতুন বউ, সস্তা গণ্ডার দেশ, কিছুই পাওয়া যেত না, তাই খরচও কিছু ছিল না। কিন্তু বউ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না।

বউ বলত—পাড়াগাঁয়ে আর ভাল লাগছে না—

আসলে এইটেই হয়েছিল মুশকিল। এই মুশকিলের জন্যেই সুকান্ত রায়েরও ভাল লাগত না। নিতাই বসাক কলকাতা থেকে এলেই জিজ্ঞেস করত—কি হল নিতাইবাবু, সেক্রেটারিয়েটের খবর কি ?

নিতাই বসাক এসে চেয়ারে বসে বলত—এবারে গিয়ে কোনও কাজ হল না স্যার, স্রেফ পয়সা নষ্ট—গিয়েছিলাম আপনার জন্যে একটু তদ্বির করতে, কিন্তু সব ভেস্তে গেল—

—কেন ?

—আবার কেন কি ? আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম, সেই দিনই মিনিস্টার হেম নস্কর মারা গেলেন। তখন কি আর কাজ-কর্ম কিছু হয় ?

—তা সাত দিন তো ছিলেন। সাত দিন ধরে থেকেও কিছু কাজ হল না ?

নিতাই বসাক বললে—না, একজন মিনিস্টার মারা গেলে কি করে কাজ-কর্ম হবে বলুন স্যার ? অন্ততঃ পনেরো দিন লাগবে তো শোকের ঘোর কাটতে, তাই চলে এলাম—

এমনি করেই দিন কাটছিল। নিতাই বসাকও আশা দিয়ে যাচ্ছিল, সুকান্ত রায়ও চাকরি করে যাচ্ছিল। এমনি করেই বছর কেটে যাচ্ছিল। টেম্পোরারী ডিপার্টমেণ্ট, কবে আছে কবে নেই। নিতাই বসাককে ধরে যদি অন্য কোনও ডিপার্টমেণ্টে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করত সুকান্ত রায়। কিংবা যদি কলকাতার হেড অফিসে

চাকরিটা ট্র্যানস্‌ফার করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসে কারও সঙ্গে জানা-শোনা নেই। একমাত্র সেই ফটোটা ভরসা। সেই কিরণশঙ্কর রায়ের মরদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাঁধে করে—সেইখানা। সেই ফটোখানা বাঁধানো ছিল ঘরে। দেয়ালে টাঙানো ছিল। সেই পুরনো খবরের কাগজখানাও ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিল। জীবনে ঐ একটিমাত্র মূলধন। ঐ মূলধনটি খাটিয়েই যদি ভবিষ্যতে আরও কিছু কাজে লাগানো যায়।

লোককে সুযোগ পেলেই সুকান্ত রায় দেখাত। বলত—ওই দেখুন, আনন্দবাজারে আমাদের ছবি বেরিয়েছিল।

গ্রামের লোকেরা অবাক্‌ হয়ে যেত। তারা ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসারকে দেখছে না, যেন দেবদর্শন করছে।

স্ত্রীও মেয়েদের বলত—কিরণশঙ্কর রায় ওঁকে খুব স্নেহ করতেন কিনা—

ঠিক এমনি সময়ে দুলাল সা'র বাড়িতে সাধুবাবা এসে হাজির। নিতাই বসাক এসে নেমন্তন্ন করে গেল। আর তারপর দিনই মেজাজ বদলে গেল। নিতাই বসাক তার পরদিন সকাল বেলাই এসেছে।

বললে—কি রকম স্যার, কি রকম সাধু দেখলেন বলুন?

সুকান্ত ছিল, সুকান্তর স্ত্রী ছিল। সুকান্ত বললে—মিরাকুলাস—

—কি রকম?

সুকান্ত বললে—আমার বাবা কবে মারা গেছেন তার ডেট্‌টা পর্যন্ত বলে দিলেন সাধুবাবা—

—আর চাকরি? চাকরির কথা কিছু বলেন নি?

সুকান্ত বললে—আর তিন বছর বাকি আছে—

—কিসের বাকি?

সুকান্ত বললে—উন্নতির। তখন আমার এমন উন্নতি নাকি হবে যে, আমি এখন কল্পনাই করতে পারব না—

নিতাই বসাক বললে—তখন যেন আমাদের ভুলে যাবেন না স্যার, যদি মিনিস্টার হয়ে যান তো যেন কিছু পারমিট-টারমিট্ পাই—

—আমার তো মশাই বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

সুকান্তর স্ত্রী বললে—অনেক সময় কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়—

নিতাই বসাক বললে—এমন অলৌকিক সব ব্যাপার আমার শোনা আছে যা শুনলে আপনারা চম্‌কে উঠবেন—

সুকান্ত বললে—আমি তো তাই আসবার সময় পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে এলাম নিতাইবাবু—তা সাধুবাবা চলে গেছেন ?

—হ্যাঁ, ভোর চারটের সময় নৌকোয় তুলে দিয়ে এলাম। প্রণামী যত পেয়েছিলেন সব দিতে গেলাম একটা পাই-পয়সা পর্যন্ত ছুঁলেন না, তা দুলালকে বললাম—সব হরিসভার ফাণ্ডে জমা করে দিতে—

সুকান্ত বলল—হরিসভা কি এখনও আছে আপনাদের ?

নিতাই বসাক বললে—কি বলছেন আপনি ? হরিসভা নেই ? হরিসভার আটচালার ভেতরে একদিন গিয়ে দেখবেন, এখনও রোজ ঝাঁটপাট দেওয়া হয়, রোজ কেউ আর আসে না বলে একপাশে দুলালের গর্রুগুলো রাখা আছে—

তার পর হঠাৎ রাস্তার দিকে নজর পড়তেই দেখলে—নিবারণ যাচ্ছে।

—ওই দেখুন, ওকে চেনেন ?

সুকান্ত বললে—ওই তো কার্তীশ্বর ভট্টচায্যির সরকার—

নিতাই বসাক সেখানে বসে বসেই ডাকলে—নিবারণ, অ নিবারণ, ও সরকার মশাই—

সরকার মশাই ডাক শুনে দাঁড়াল। তারপর এদিকে ফিরে চাইলে।

—এস এস, ভেতরে এস—

নিবারণ আস্তে আস্তে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকল।

—এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, বসাক মশাই, একটু চণ্ডীতলার দিকে যাব—কর্তামশাই-এর হুকুম—

—কেন, চণ্ডীতলায় কি করতে? কোন্ পাড়ায়?

—আজ্ঞে মালো-পাড়ায়।

—মালো-পাড়ায় এখন কি করতে? মাছের চেষ্টায়?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে না, সকাল বেলা সা' মশাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, তিনি আহ্নিক করতে গেলেন, তাই কথা হল না, এখন যাচ্ছি কেষ্ট মালোর কাছে, কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করতে। শুনেছি এখনও বেঁচে আছে কেষ্ট মালো—

নিতাই বসাক বললে—বেঁচে আছে বৈ কি। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বেঁচে আছে, তোমার কর্তামশাই-এর মত অথর্ব হয়ে পড়ে নি—

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, কর্তামশাই-এর মত শোক-তাপ ক'জন পেয়েছে বলুন, ছেলে গেছে, ছেলের বউ গেছে, নাতনী গেছে—নিজের স্বাস্থ্যও···

—তা সাধুবাবা যে বললেন নাতনী যায় নি, বেঁচে আছে?

নিবারণ বললে—সেই শোনার পর থেকেই তো কর্তামশাই কেমন হয়ে গেছেন—

—কি রকম?

—আজ্ঞে, কাল চৌপর-রাত বুকের ব্যথায় ভুগেছেন। কর্তামশাইও জেগে, আর আমিও জেগে। তিনজনেই জেগে কাটিয়েছি। এই ভোরবেলাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন সা'মশাইয়ের বাড়িতে।

তা সাধুবাবা তো চলে গেছেন শুনলাম, এখন কেষ্ট মালোর কাছে যাচ্ছি, সে যদি কিছু বলতে পারে—

যে-পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে অত দর-কষাকষি চলেছে, সেই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের ওপারেই দেখা গেল কুলি-কাবারি লোকজন সেদিন কোদাল-শাবল নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। মাঠের দিকে ভোরবেলা কারো নজরে পড়েনি। বাঁওড়ের দিকে ভোরবেলা কে-ই বা যাবে।

কেষ্টগঞ্জ থেকে মাইল আড়াইটাক দূরের পথ। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্যের আমলে ওখান থেকে মোটা আয় হত। জলকর থেকেও বার্ষিক মোটা আয়ের বন্দোবস্ত ছিল। কর্তামশাইও সে জলকর ভোগ করেছেন। চণ্ডীতলার মালোরা ওখানে মাছের কারবার করত। বার্ষিক ডাক হত। এক একজন মালো-সর্দার সব সম্প্রদায়ের হয়ে জায়গাটা জমা নিত। সে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন ইছামতীতে জল ছিল। বর্ষার সময় যখন নদীতে ঢল নামত তখন দু'পাশের পাড় ভেঙে যেত। জায়গায় জায়গায় পাড়ের মাটিতে ধস্ নামত। সেই জল পাড় ছাপিয়ে সময়-সময় ডাঙায় এসেও উঠত। ধান-ক্ষেত পেরিয়ে জলের তোড় নাবাল জমির ওপর দিয়ে ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের গর্তে গিয়ে পড়ত। একটানা তিন দিন বৃষ্টি হলে আর দেখতে হত না। ইছামতী আর বাঁওড় একাকার হয়ে যেত। তখন পোলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মালোরা। কেষ্টগঞ্জের মানুষ-জনও ঝুড়ি-গামছা নিয়ে মালকোঁচা মেরে নেমে পড়ত ধান-

ক্ষেতের ওপর। কার ধান-ক্ষেত কার বাঁওড়, তখন আর তার হিসেব থাকে না। মালোপাড়ার লোকেরা তখন সমস্ত রাত ধরে চারধারে বাঁধ দেবার চেষ্টা করে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর মাটি ফেলে ফেলে মাছ আটকে রাখবার চেষ্টা করে। সে ক'দিন কেষ্টগঞ্জে মাছের গন্ধে বাতাসও আঁশটে হয়ে ওঠে।

কিন্তু তার পর কি যে হল ইছামতীর সে তেজও ক্রমে কমে এল। কেষ্টগঞ্জের দক্ষিণে চাঙড়িপোতার দিকে রেলের নতুন পুল তৈরি হল আর জলের তোড় কমে এল। তখন এক নাগাড়ে দশ দিন বৃষ্টি হলেও পাড় ছাপিয়ে জল আর ডাঙায় ওঠে না। বাঁওড়টা শুকোতে শুকোতে একেবারে ফুটিফাটা হয়ে উঠল। চোত-বোশেখ মাসে রাখালরা গরু, মোষ, ছাগল চরাতে নিয়ে যেত ঐ পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে। বেশ বড় বড় মানুষ-সমান গজাল ঘাস জন্মায় ওখানে। পেট পুরে খেয়ে বাঁচে গরু-ছাগল।

কিন্তু সেই সময় থেকেই কর্তামশাই-এর খারাপ সময় পড়ল।

আর জলকর দেয় না কেউ। কেউ আর জমা নেয় না বাঁওড়। এককালের সেই জম-জমাট্ গা ছম-ছম-করা বাঁওড় ফাঁকা আকাশের নীচে ধূ ধূ করে। আর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে কর্তামশাই-এর বুকটা হু হু করে ওঠে। ঐ বাঁওড়টাই ছিল যেন কর্তামশাই-এর হৃৎপিণ্ড। সেই হৃৎপিণ্ডটাই শুকিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে হরতনও চলে গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বরও নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। বউমা একজন ছিল— সে-ও একদিন সব মায়া ত্যাগ করে চলে গেল। থাকবার মধ্যে তিনি একলাই রইলেন।

নিবারণ যথারীতি সকালবেলা বাজারে গিয়েছিল। বাজারেই খবরটা প্রথম শোনা গেল।

হলধর পশ্চিমপাড়ার চাষী, সে-ও বাজারে এসেছে।

বললে—সরকার মশাই, কর্তামশাই কি বাঁওড়টা বেচে দিলেন?

নিবারণ অবাক্ হয়ে গেল। বললে—কেন? বেচতে যাবেন কেন?

—তা হলে পথ ঘেরাও করে দিচ্ছে যে সা' মশাইয়ের লোক। আমি বাজারে আসবার পথে দেখে এলাম—

পথ ঘেরাও করে দিচ্ছে! কথাটা যেন বাঁকা বাঁকা মনে হল। আর দাঁড়াতে পারলে না এক মুহূর্ত। হাঁফাতে হাঁফাতে আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে যখন পেঁপুলবেড়েতে পৌঁছল নিবারণ, তার আগেই সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাঁওড়ের একটা দিক পুরো বেড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নিতাই বসাকবাবুর ম্যানেজার সদানন্দ তদারক করছে আর অমন শ'তিনেক মজুর পুরোদমে হেঁইও হেঁইও করে কাজ করছে।

নিবারণ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েই দম নিলে।

সদানন্দ ছাতার আড়ালে দূর থেকেই দেখেছিল নিবারণকে। কাছে আসতেই বললে—আসুন সরকার মশাই, ছাতার তলায় আসুন—ঘেমে নেমে উঠেছেন একেবারে—

ছাতার তলায় নিবারণ গেল না। তার মুখ দিয়ে কথাও যেন আর বেরোতে পারছে না।

সদানন্দ আবার বললে—আহা, কি রকম মাটি দেখছেন, যেন সোনা—বলে নীচু হয়ে হাতের আঁজলায় ধুলো তুলে নিলে।

নিবারণ সেদিকে দেখলে না। বললে—তুমি কার হুকুমে বাঁওড়ে মজুর লাগিয়েছ শুনি? কে এখানে আসতে হুকুম দিয়েছে তোমাদের?

সদানন্দ বললে—তার মানে?

—তার মানে তুমি ভালো করেই জানো সদানন্দ। এ বাঁওড়ের মালিক তোমার কর্তা নয়, মালিক এখনও বেঁচে আছেন, তিনি এখনও মারা যান নি—তা তো জানো?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে সরকারমশাই, আমি তো তা জানতাম না—

—তুমি জানো না যে কর্তামশাই বেঁচে আছেন ?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে সে কথা বলছি না, আমি বলছি বাঁওড় তো হাত-বদল হয়ে গেছে।

—হাত-বদল হয়ে গেছে কি রকম ?

—আজ্ঞে এ বাঁওড় তো সা' মশাই কিনে নিয়েছেন।

কথাটা সদানন্দ নিরাসক্ত হয়েই বললে। কিন্তু নিবারণ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

বললে—দেখ সদানন্দ, দেশে অরাজক হয়েছে বটে কিন্তু তা হলেও এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠছে, তা জানো ? আদালতে গেলে সা' মশাইয়ের দশাটা কি হবে, তাও বোধহয় ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে না তোমাকে। এখনও বলছি, তোমার লোকজনদের থামতে বলো, নইলে শেষে কেঁদে কূল পাবে না তোমার বাবু—এই বলে রাখছি।

সদানন্দ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বললে—আদালতই যদি দেখাবেন তো কষ্ট করে আর এই রোদ্দুরে কেন মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আছেন, যান না, আদালতেই যান না—

নিবারণও সচরাচর এমন উত্তেজিত হয় না কখনও।

বললে—ভাল কথা বললাম আমি আর তুমি আমাকে আদালত দেখালে সদানন্দ ? আদালতে যেতে পারিনে ভেবেছ ? কর্তামশাই-এর অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে কি আদালত করবার ক্ষমতাটুকুও নেই মনে করেছ ?

সদানন্দ আর পারলে না। বললে—যান্ যান, যা পারেন করুন গে যান, মেলা বকবেন না—

—কি বললে ?

ওদিকের লোকজনদেরও বোধহয় শেখানো ছিল। হঠাৎ নিবারণ চারদিকে চেয়ে কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। হঠাৎ নজরে পড়ল, তার আশে-পাশে চারদিকে অসংখ্য লোক যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে যেন তার মাথাটা ঘুরে গেল বন্ বন্ করে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মাথার তালু ফেটে যাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার যেন তা ফুটিফাটা হয়ে গেল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ মনে আছে যেন সবাই তার সামনে একেবারে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না, আর কিছু বুঝতেও পারছে না। সব একাকার হয়ে গিয়েছে···

এমনিতে কর্তামশাই-এর কাছে যা-কিছু খবরাখবর আসে তা নিবারণের মারফতই আসে। আগে যখন চোখ ভাল ছিল তখন তিনি খবরের কাগজ কিনতেন, লোককে দিয়ে তা পড়িয়ে নিতেন। আর কেষ্টগঞ্জের নানারকম লোক এসে এটা-ওটা নানা খবর মুখেও বলে যেত। ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকজন এখন সবাই যায় ত্রুলাল সা'র বাড়িতে।

নিবারণ সেই সকালবেলা বাজারে গিয়েছিল, তার পর বেলা হতে চলল, তখনও দেখা নেই।

বড়গিন্নী যথারীতি উনুনে আগুন দিয়েছিল। তিনটে মানুষের তো ভারি রান্না। ফুস্ করে দেখতে না-দেখতে রান্না হয়ে যায়। তার পর আর কোনও কাজ থাকে না। একটা কথা বলবার লোকও নেই বাড়িতে। বড়গিন্নীরও তো বয়েস হয়েছে। ছেলে-বউ-নাতনী সব গেছে। একটা মেয়ে এসে কাজ-কর্ম একটু করে দেয়। বাটনাটা বেটে দিলে। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। কিংবা কাপড় ক'টা সেদ্ধ করে দিয়ে গেল। তার পর একথালা ভাত নিয়ে আবার নিজের বাড়ি চলে যায়।

রাত্রে সরষের তেল গরম করে নিয়ে কর্তামশাই-এর কাছে এসেও বড় একটা কথা হয় না। বড় কম কথার মানুষ। সেদিন কেষ্ট মালোর খোঁজ করতে যাওয়ার পর থেকেই কর্তামশাই একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। নিবারণের কাছে কথাটা শুনে পর্যন্ত মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।

নিবারণ বলেছিল, সে বলেছে সে নিজে আপনার কাছে আসবে একবার—আপনাকে যেতে হবে না—

কর্তামশাই বলেছিলেন, তা তুমি তাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—আজ্ঞে সে তখন নাতির বাড়িতে যাচ্ছিল, তাই আসতে পারলে না। নাতির বাড়ি সেই মোহনপুরে। মোহনপুর থেকে এসেই দেখা করবে বলেছে—

—তা এতদিন হয়ে গেল, এখনও আসছে না কেন?

—আজ্ঞে মোহনপুর তো এখানে নয়, সেখানে যাবে, নতুন জায়গায় গেলে কি একদিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারে? সে বলেছে হরতনের সৎকারের সময় সে হাজির ছিল, ছোটবাবু চণ্ডীতলার শ্মশানে গিয়ে কেষ্ট মালোকে খবর দিয়েছিল—কেষ্ট মালোই লোক-জন ডেকে কাঠ যোগাড় করেছিল—

—তার পর? সৎকার হয়েছিল?

নিবারণ বলেছিল, কেষ্ট মালো কাঠের ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে, তার পর বুড়ো মানুষ ঝড়-জল আসছে দেখে আর থাকে নি, নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল—

—তা হলে সৎকার হয় নি?

নিবারণ বলেছিল—তার বেশি কিছু বলতে পারলে না সে। কেষ্ট মালো বললে, আর কে কে ছিল তা তো মনে পড়ছে না, আর বুড়ো মানুষ, সব মনেই নেই তার—

—তা তুমি বললে না কেন আর কাউকে জিজ্ঞেস করে খবরটা নিতে? মালো-পাড়ার আরও তো অনেকে ছিল সেদিন—

—তাও বলেছিলাম। তা তখন যাবার জন্যে তৈরি, আমি আর কিছু বললাম না।

—তা তুমি নিজেই কাউকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? মালো-পাড়ায় তো গিয়েই ছিলে—

নিবারণ বলেছিল—কেষ্ট মালো নিজেই বললে, সে মোহনপুর থেকে ফিরে এসে খোঁজ-খবর নেবে, তাই আর আমি কিছু বললাম না, ফিরে এলাম।

কর্তামশাই-এর মনঃপুত হল না কথাটা। এতটুকু আক্কেল যদি থাকে। কোনও মানুষকে দিয়ে একটা কাজ হবার নয়। তবু দু'দিন অপেক্ষা করলেন। ভাবলেন, কেষ্ট মালো বুঝি এল বলে। রোজ ভোর-বেলা ঘুম থেকে উঠেই বাইরের দিকে চেয়ে দেখেন। চোখে তেমন নজর নেই। রাস্তার লোকজনদেরও চিনতে পারেন না। তবু চেষ্টা করেন। নীচেয় নেমে এসে জিজ্ঞেস করেন—কই, কেষ্ট মালো এল?

—আজ্ঞে না, এখনও তো এল না।

—এলে আমাকে ডাকবে।

—আজ্ঞে তা তো ডাকবই। আপনার সঙ্গেই তো সে দেখা করতে আসবে।

—সে তো আসবে, কিন্তু আসছে কই?

নিবারণ বলত—আজ্ঞে সে মোহনপুরে গেছে, ফিরে এলেই আসবে—কথা যখন দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আসবে, কেষ্ট মালো সে রকম লোক নয়—

কর্তামশাই রেগে যেতেন।

বলতেন—কেষ্ট মালো কি রকম লোক সে আমাকে তোমায় আর শেখাতে হবে না. কিন্তু আসছে না কেন শুনি?

বেশিক্ষণ কথা বললে পাছে মাথা গরম হয়ে যায় তাই আর কথা বলতেন না কর্তামশাই। সোজা আবার ওপরে গিয়ে উঠতেন। দিনের মধ্যে বার তিন-চার ওঠা-নামা করতে করতেই বুকটা টন্ টন্ করে উঠত। তার পর সমস্ত চোটটা গিয়ে পড়ত বড়গিন্নীর ওপর। যেন বড়গিন্নীরই সব অপরাধ। বলতেন—না না, আর তেল-মালিশ দরকার নেই।

তবু হাতটা বাড়িয়ে দিত বড়গিন্নী। সারা জীবন কর্তামশাই-এর চোটপাট সহ্য করে এসেছে। মানুষটাকে চেনা হয়ে গিয়েছে তার। বলত—একটু মালিশ করি, দেখবে ঘুম আসবে—

—ঘুম এসে কি হবে আর? একেবারে মরণ ঘুম এলেই বাঁচি আমি!

তার পর একটু নরম হতেন যেন। বলতেন—এই দেখ না, কেউ কোনও কম্মের নয়। নিবারণকে পাঠালাম কেষ্ট মালোর কাছে, তা একটা কাজ যদি হয় নিবারণকে দিয়ে। লোকটা বলে গেল সে বেঁচে আছে, আর একটু চেষ্টা-চরিত্র করে দেখলে ক্ষতিটা কি? সবাইকে যা-যা বলেছে সমস্ত মিলে গেছে, আর এটা মিলবে না? বেঁচে যদি থাকে তো এখন আঠারো বছর বয়েস হয়েছে তার, তা জান? তোমারও তো একটু ভাবনা-টাবনা কিছু নেই! যত ভাবনা সব একলা আমি ভাবব? তোমার কি একটু মায়া-দয়াও হয় না মেয়েটার জন্যে?

অন্ধকারে বড়গিন্নির মুখটা দেখা গেল না।

শুধু বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও—

—তা তো ছেড়েই দিয়েছি, আমার আর কে আছে! আমার কথাটা কেউ ভাবে না। এই যে চোখের ওপর দুলাল সা' জমি-জমা টাকাকড়ি হরিসভার নাম করে আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে নিলে, কে তার জন্যে ভাবছে? সে-কথা আমি তোমায় বলতে গেছি? না তুমিই কোনও দিন শুনতে চেয়েছ?

বড়গিন্নী এ কথারও উত্তর দিলে না।

—বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে। জাহান্নামে যাক্ সব। আমার কি? আমি তো ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাব। তখন তোমরাই বুঝবে! আমি তো আর জমি-জমা কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না। আমি যাবার পর তোমার খাওয়া-পরার কষ্ট যাতে না হয়, তাই এত ভাবি! নইলে ছুনিয়াতে কে কার?

এই রকম আবোল-তাবোল কত কি বলতেন রোজ।

কিন্তু সেদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার ধপ্ ধপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচেয় নেমে এলেন। নিবারণ সবে তখন মুখ-হাত-পা ধুয়ে জামা গায়ে দিচ্ছে। কর্তামশাই এসেই জিজ্ঞেস করলেন—কি? আবার সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছ? কোন্ রাজকার্য করতে যাচ্ছ শুনি?

নিবারণ বললে—কোথাও যেতে বলছেন আমাকে?

কর্তামশাই বললেন—কোথায় আবার যেতে বলব তোমাকে? কোন্ কাজটা তোমার দ্বারা হয় শুনি? কোন্ উপ্কারটা হয় তোমাকে দিয়ে?

—আজ্ঞে, আপনি বলুন কোথায় যেতে হবে?

—আমি বলব তবে তুমি যাবে? তোমার নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা নেই? সেই যে কেষ্ট মালোর কাছে গিয়েছিলে, তার পর এতগুলো দিন কেটে গেল তবু সে আসছে না। তা তুমি একবার যেতে পারলে না তার কাছে? একবার গিয়ে দেখে আসতেও পারলে না যে সে মোহনপুর থেকে ফিরে এসেছে কি না!

নিবারণ একটু বিব্রত বোধ করলে।

বললে—এই এক্ষুনি যাচ্ছি কর্তামশাই—

—আমি মনে করিয়ে দেব, তবে তুমি যাবে! কেন? তোমার মনে একবার কথাটা উদয় হয় না যে, কর্তামশাই ভেবে ভেবে অস্থির

হয়ে যাচ্ছেন, দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, যাই, একবার মালো-পাড়ায় গিয়ে দেখে আসি কেষ্ট মালো ফিরে এল কি না!

এর পর আর দাঁড়ায় নি নিবারণ। বাজারের থলিটা নিয়ে বেরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কেষ্টগঞ্জের বাজারটা সেরে তার পর ফেরবার পথে মালো-পাড়াটা ঘুরে বাড়ি ফিরে আসবে। বড়গিন্নীও উনুনে আগুন দিয়ে বসে ছিল। মেয়েটা বাটনা বেঁটে দিয়েছে। দু' বালতি জল তুলে দিয়েছে রান্নাঘরে। তখনও সরকারমশাই ফিরছে না।

পাড়ার মেয়ে। বহুদিন থেকে কাজ-টাজ করে আসছে। আগে মা কাজ করত, এখন মেয়েটা। হাত-নুড়বুড় একটা লোক না হলে চলেই বা কি করে!

বড়গিন্নী বললে, তুই এবার বাড়ি যা গৌরী, তোর মা আবার ভাববে—

গৌরী বললে, তুমি রান্না চড়াবে না মা?

—বাজারই এখনো আনে নি সরকারমশাই, রাঁধব কি?

তা গৌরী আর কতক্ষণ থাকবে! সে-ও একসময়ে চলে গেল। ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে বড়গিন্নী বসে ছিল। ভাত নামল। বড়গিন্নী ভাতের ফ্যান গাললে। তারপর ডাল চড়াল। ডালও হয়ে গেল। তার পর রান্নার আর কিছু নেই। তার পর রান্নাঘরে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। সামনের উঠোনটায় রোদ বেঁকতে বেঁকতে পূবের দালানে গিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। ছায়া-ছায়া হয়ে এল জায়গাটা। তখনও সরকারমশাই-এর দেখা নেই। সমস্ত বাড়ি তখন রাত-দুপুরের মতন নিঃঝুম হয়ে টা-টা করছে।

হঠাৎ বাড়ির সদরে কাদের যেন গলা শোনা গেল। হৈ-চৈ করতে করতে কারা এসেছে সদরে।

কর্তামশাইও চম্‌কে উঠেছিলেন। ঝাপ্‌সা চোখে স্পষ্ট দেখতে

পান নি প্রথমে। সামনের কালকাসুন্দির বন ঠেঙিয়ে সরু পায়ে-চলা পথটা ধরে যেন অনেক লোক আসছে সদরে। কাছে এলেও চিনতে পারলেন না।

—কে ? কে তোমরা ?

আজকাল তো তেমন কেউ আগেকার মতন আসে না। তাই একটু অবাক্ই হয়ে গিয়েছিলেন।

—আমি হলধর, কর্তামশাই।

হলধরকে চিনতেন কর্তামশাই। কর্তামশাই-এর খাস প্রজা। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন কর্তামশাই। নিবারণের সারা গায়ে রক্তের ছিটে লেগে আছে। কর্তামশাই চোখ দুটো আরো নামালেন।

—নিবারণ না ? কি হল এর ?

আরো অনেক লোক জমে গিয়েছিল ঘরের ভেতর। তারা সবাই সরকারমশাইকে শুইয়ে দিলে তক্তপোশটার ওপর। নিবারণের মুখ দিয়ে তখন কথা বেরোচ্ছে না। মাথাতেই বোধহয় চোট্টা লেগেছিল বেশি। চিঁ চিঁ করে একটু কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হলধর বললে, কেষ্টগঞ্জের বাজারে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সরকারমশাই-এর, তা আমি জিজ্ঞেস করলাম—কর্তামশাই কি পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা বেচে দিলেন ?

কর্তামশাই আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, কি বললে হলধর ? পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় আমি বেচেছি ! বেচব কেন ? কাকে বেচব ?

—আজ্ঞে সা' মশাইকে। তাই তো শুনলাম !

—দুলাল সা'কে বেচেছি ? সেই পাষণ্ডটাকে আমি পেঁপুল-বেড়ের বাঁওড় বেচেছি ? আমার কি মাথাখারাপ হয়েছে ?

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কর্তামশাই।

এত পাষণ্ড দুলাল সা'! বহুদিন থেকেই মতলব আঁটছিল বাঁওড়টা নেবার জন্যে। সুগারমিল করবে! থর থর করে কাঁপতে লাগলেন কর্তামশাই সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ যেন মনে হল তাঁর বাস্তুভিটের মাটিটুকু পর্যন্ত তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্যের বংশের সমস্ত ঐশ্বর্যটুকু যেন এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে। ওইটুকুই বলতে গেলে বাকি ছিল। আর তো বড় বড় জমি-জমা সবই গেছে একে একে। এই বাঁওড়টার ওপরই নির্ভর করে ছিলেন তিনি। এইটি গেলে তাঁর আর কি থাকবে? তাঁর বাস্তুভিটেটুকু? সেটা যেতেই বা কতক্ষণ?

যারা নিবারণকে ধরে নিয়ে এসেছিল তারা তখনও দাঁড়িয়েছিল। তারা দু'পক্ষের কেউই নয়। কোনও পক্ষেরই লোক নয় তারা। অথচ যেন দু'পক্ষেরই। দু'পক্ষের উত্থান-পতনের ছন্দে তারাও ওঠে নামে।

—ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিয়ে আসি কর্তামশাই।

বলে একজন চলে গেল। কর্তামশাই নিবারণের মুখের ওপর চোখ নীচু করে দেখছিলেন। কে বুঝি নিবারণের কাপড়টাই ছিঁড়ে মাথায় ফেটি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। তার ওপর রক্তের দাগ লেগে চাপড়া হয়ে গেছে।

কর্তামশাই জিজ্ঞেস করলেন, ওরা তোমাকে মারতে গেল কেন নিবারণ? কী করেছিলে তুমি?

নিবারণের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

—কে বললে তোমাকে বাঁওড় বেচার কথা?

নিবারণ আস্তে আস্তে বললে—কর্তামশাই, এর শোধ একদিন ভগবান ঠিক নেবেন।

—ভগবানের কথা থাক্ নিবারণ; এত বয়েস হল তোমার, এত দেখলে, তবু ভগবানের নামে নালিশ করছ?

—আজ্ঞে কর্তামশাই, তা বলে চন্দ্র-সূর্য তো এখনও উঠছে।

—তা উঠুক! কেন মারলে তোমাকে ওরা তাই বল? তুমি ওদের গায়ে হাত তুলেছিলে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে সদানন্দ তদারক করছিল, সে বললে সা'মশাই নাকি বাঁওড় কিনে নিয়েছে। তাতে আমি বললাম, কর্তামশাই জমি বেচলে আমি টের পাব না? তার পর আর জানি না কি হল।

কর্তামশাই রাগে গর গর করে উঠলেন।

বললেন, হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা মনে করেছে কি? গরীব হয়ে গেছি বলে ভেবেছে কি মরে গেছি? থানা-পুলিস-আদালত-গভর্নমেণ্ট কিছু নেই?

হলধর বললে, কর্তামশাই, থানায় খবর দিন, আমরা সাক্ষী দেব।

নিবারণ হাত নাড়তে লাগল। চিঁ চিঁ করে বললে, না না—

কর্তামশাই বলে উঠলেন, তোমার কিসের ভয় নিবারণ, দুটো টাকা হয়েছে বলে বে-আইনী কাজ করে যাবে আর আমরা মুখ বুঁজে সহ্য করব?

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হল। সবাই চেয়ে দেখলে অবাক কাণ্ড! কালকাসুন্দির ঝোপ যেখানে শেষ হয়েছে, সেই সরু হাঁটা-পথটার মুখের সামনে মোটরগাড়িটা এসে দাঁড়াল। কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য চোখে দেখতে না পান, দুলাল সা'র গাড়ির শব্দটা চিনতেন। সেই দিকে চেয়ে তিনি দৃষ্টিটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে দিলেন। কিন্তু তবু কিছু ঠাহর করতে পারলেন না।

হলধর বললে, সা'মশাই-এর গাড়ি—

কর্তামশাই মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিলেন।

আজ আর কোনও দয়া-মায়া নেই। সারা জীবন জ্বালিয়েছে দুলাল সা। বিনয়ের ছদ্মবেশ ধরে বরাবর তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে

নিয়েছে। একে একে তাঁরই চোখের সামনে কেষ্টগঞ্জে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাতেও খুশী হয়নি। এখন জোর-জবরদস্তির পথ ধরে কীর্তীশ্বরকে ধ্বংস করতে চায়। এত বাড় বেড়েছে তার।

হলধর হঠাৎ আবার বলে উঠল—না কর্তামশাই, সা'মশাই নয়, নতুন-বৌ—

নতুন-বৌ! দুলাল সার পুত্রবধূ!

নতুন-বৌ গাড়ি থেকে নেমে সোজা আসতে লাগল। কর্তামশাই কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। যেন ছায়ার মত একটা মূর্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে এসেই একেবারে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাতটা মাথায় ছোঁয়াল।

—আমি নতুন-বৌ জ্যাঠামশাই।

কর্তামশাই নতুন-বৌ-এর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না। কর্তামশাই যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বয়েস, তাঁর পদমর্যাদা সব যেন ওই দুলাল সা'র পুত্রবধূর সামনে এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কিন্তু নতুন-বৌ-এর তখন সেদিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই। সোজা নিবারণের তক্তপোশটার সামনে নীচু হয়ে বসল।

বললে—সরকার মশাই, কি হয়েছিল, আমাকে খুলে বলুন তো?

নিবারণ সরকারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যন্ত্রণায় অন্ধকার দেখছিল চোখে। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যেন তার যন্ত্রণাও অনেক কমে গেল। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না। সে-ও যেন হতবাক্ হয়ে গেছে। হলধরের সঙ্গে যারা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিল তারাও যেন সবাই এক নিমেষে বোবা হয়ে গিয়েছে।

—আপনি সব বলুন আমাকে, কি কি হয়েছিল? কে আপনার গায়ে হাত তুললে? বলুন, আপনার কোনও ভয় পাবার দরকার নেই, আমি আসল ঘটনাটা কি তাই জানতে চাই।

এতক্ষণে কর্তামশাই-এর মুখে যেন কথা ফুটল।

তিনি বললেন—তার আগে বল, কে তোমায় পাঠিয়েছে এখানে? তুলাল সা'? না নিতাই বসাক? তোমাকে ওকালতি করতে কে পাঠিয়েছে আমার কাছে, সেইটে বল।

নতুন বৌ মুখ ফেরাল। কর্তামশাই-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি আমাকে যে অপমান করবেন জ্যাঠামশাই, সব আমি মুখ বুজে সহ্য করব, কিন্তু নিরীহ ভালমানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার চলতে দেব না—

কর্তামশাই বললেন—অত্যাচারটা যে তুলাল সা'র কথাতেই হয়েছে এটা তো শুনেছ?

—আমি কিছুই জানি না জ্যাঠামশাই, আপনি বিশ্বাস করুন, আর যেটুকু শুনেছি তাও পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। সেই জন্যেই তো সরকারমশাই-এর কাছে আসল ব্যাপারটা শোনবার জন্যে এসেছি।

কর্তামশাই বললেন—তা এসেছ ভালই করেছ, কিন্তু অন্যায় যদি কেউ করেই থাকে তো প্রতিকার করবার কি ক্ষমতা আছে তোমার?

নতুন-বৌ বললে—প্রতিকার যদি নিজে না করতে পারি তো দেশে পুলিস আছে, থানা আছে, তারাও প্রতিকার করতে পারে, কোর্ট-আদালত-হাইকোর্টও তো আছে!

কর্তামশাই হাসলেন। একটা কর্কশ ব্যঙ্গের হাসি শুধু তাঁর মুখখানাকে আরও কর্কশ করে তুলল। বললেন—থানা-পুলিস-আদালতের কথা তুমি জান না বলেই বলছ, টাকা না থাকলে সেখানেও

আজ পাত্তা পাওয়া যায় না! দুলাল সা' ভাল করেই জানে আমার তা নেই, তাই এত সাহস—

নতুন-বৌ বললে—বাবা খেয়ে উঠে সবে একটু বিশ্রাম করছেন, তাই তাঁর কানে আর কথাটা তুলি নি জ্যাঠামশাই, নইলে তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম—

কর্তামশাই বললেন—তুমি কথাটা না-তুললেও, দুলাল সা' হুঁশিয়ার লোক, সে সব জানে—তলে তলে সে-ই মতলব দিয়ে এই করিয়েছে—

নতুন-বৌ বললে—বাবার নামে আপনি অন্যায় দোষ দেবেন না জ্যাঠামশাই, বাবা এর মধ্যে নেই—

—তাহলে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা কি ভুতে কিনে নিলে?

যেন কর্তামশাই এবার রেগে গিয়েছেন মনে হল। একটু জোর গলাতেই বললেন কথাগুলো।

একটু থেমে আবার বললেন—আজ দু'বছর ধরে ওইটে নেবার জন্যে নিতাই বসাক আর দুলাল সা' ঝুলোঝুলি করছে, নিবারণকেও কত ভাঙচি দেবার চেষ্টা করে আসছে, এখন হঠাৎ আমার নতুন করে কি এমন অবস্থা খারাপ হল যে আমি বাঁওড়টা বেচতে গেলাম দুলাল সা'র কাছে? আমি জমি বেচলাম আর আমিই টের পেলাম না? এও আমাকে বিশ্বাস করতে বল? ওই বাঁওড়ের ওপর নির্ভর করে আজ সাত-পুরুষ আমরা বেঁচে আছি, আমাদের বংশ, আমাদের প্রতিষ্ঠা একদিন ওর ওপরই নির্ভর করেছে। আজ না হয় বাঁওড় শুকিয়ে গিয়েছে, তা বলে আমি তাই বেচে দিতে যাব? আর তা ছাড়া বেচবার আর লোক পেলাম না, বেচতে গেলাম ওই চোর বদ-মাইশ পাষণ্ডটার কাছে? ভেবেছ তুমি দুলাল সা'র বেটার বউ বলে যা বোঝাবে আমি তাই বুঝব? আমি আহম্মক, গোমুখ্যু? আমি তোমাদের মতলব কিছু বুঝি নে মনে করেছ?

তারপর গলাটা নামিয়ে বললেন, যাও, অনেক বেলা হয়েছে, তুমি এখন যাও মা, প্রতিকার যা করবার তা আমি একলাই করতে পারব, তুমি যাও—

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল নতুন-বৌ। কর্তামশাই-এর কথা শেষ হতেই বললে, কিন্তু বাঁওড় আপনি বেচেন নি ?

কর্তামশাই আরও জোর গলায় বললেন, না, না, না, বেচি নি ! আমার অমন ভীমরতি হয় নি যে, বাঁওড় বেচতে যাব পেটের দায়ে—

—কিন্তু আমি যে দলিল দেখেছি জ্যাঠামশাই !

—যদি দেখে থাক তো ভুল দেখেছ, আর নয়তো জাল দলিল দেখেছ।

—কিন্তু তাতেও তো আপনার সই আছে জ্যাঠামশাই, কেষ্ট-গঞ্জের রেজিষ্ট্রারের সই আছে, রবার-স্ট্যাম্প আছে, সমস্ত যে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

কর্তামশাই বললেন, তাহলে তুমি তোমার শ্বশুরকে এখনও চেন নি মা, দুলাল সা' দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে দিন করতে পারে। হেন পাপ-কার্য নেই যা দুলাল সা' আর নিতাই বসাক দু'জনে না করতে পারে। তোমার বয়েস কম, তুমি এখনও এ-সব বুঝবে না—

—কিন্তু জ্যাঠামশাই, পঁচিশ হাজার টাকা আপনি পান নি ওই জমি বেচার জন্যে ?

—ওগো, না, না, না ! পঁচিশ হাজার টাকা দেবার লোকই বটে দুলাল সা' ! তুমি যাও তো দেখি, তোমারও খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আমারও খাওয়া-দাওয়া হয় নি। মাথা গরম হয়ে উঠেছে এখন। এখন অনেক কাজ আমার, থানায় খবর দিতে হবে, দুলাল সা'কে জেলে না পাঠালে আমার স্বস্তি নেই—

নতুন-বৌ তবু যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ ঘরের ভেতরে ত্বলাল সা'র ড্রাইভার ঢুকল। বললে, বৌদিমণি, বাড়ি থেকে কান্তবাবু ডাকতে এসেছেন—

কান্তও দাঁড়িয়েছিল। বললে, হ্যাঁ বৌদিমণি, সা'মশাই খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে ডাকতে—

—কেন, বাবা কি ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, ডাবের জল খাবার সময় হয়েছে—

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল নতুন-বৌ-এর। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই তার পর সা'মশাই ডাবের জল খান। ডাবের জলটুকু খেয়েই কাছারিতে এসে খাতা পত্র নিয়ে বসেন। এইটেই চিরকালের নিয়ম। এতক্ষণ কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে, কোথা দিয়ে যে বেলা বয়ে গেছে কারোরই খেয়াল ছিল না।

নতুন-বৌ কর্তামশাই-এর দিকে ফিরে বললে, আমি তাহলে আসি জ্যাঠামশাই—

কর্তামশাই বললেন, হ্যাঁ, এস। আর তোমার শ্বশুরমশাইকে বলে দিও এ-ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত করে তবে আমি ছাড়ব—

নতুন-বৌ সে কথার উত্তর দিলে না। মাথার ঘোমটা আরও তুলে দিয়ে সদরের বাইরে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললে, চল দিগম্বর—

হলধর তার দল-বল নিয়ে এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তাদের মুখেও কথা ফুটল। হলধর বললে, কর্তামশাই, তাহলে আমরা আসি—

কর্তামশাই সে-কথায় কান না দিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেলেন। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে আবার ভেতরে এলেন। চটিজোড়া পায়ে দিয়ে বললেন, নিবারণ, এর একটা হেস্ত-নেস্ত না করে আমি ছাড়ছি নে—

বলে সদরের দিকে বেরুলেন।

হলধর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এই এত বেলায় কোথায় চললেন কর্তামশাই ?

কর্তামশাই গম্ভীর গলায় বললেন, থানায়—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সেই টা-টা রোদের মধ্যেই রাস্তায় পা বাড়ালেন।

কেষ্টগঞ্জের বাজারে কথাটা রটে গিয়েছিল সেই দিনই। কথাটা কানে কানে পল্লবিত হয়ে অন্য চেহারা নেওয়ায় অন্য মানে করে নিয়েছিল সবাই। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল যা তা এই : কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যের সরকার নিবারণ লাঠিয়াল ভাড়া করে নিয়ে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় দখল করতে গিয়েছিল ভোর-বেলা। কিন্তু নিতাই বসাকের লোক সময়মত খবর পেয়ে বাধা দিতে যায়। তাতে নিতাই বসাকের ম্যানেজার সদানন্দ জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

সদানন্দও যে জখম হয়েছে এটা প্রথমে কেউ জানত না।

মুকুন্দ বলেছিল, সা'মশাই, আপনি কর্তামশাই-এর নামে পুলিস কেস্ করুন—এ অধর্ম কখনও সহ্য করবেন না—

কান্ত দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, পঁচিশ হাজার টাকাও নেবেন আবার জমিও দখল করতে দেবেন না, এ তো বড় আবদার—

যারা যারা তুলাল সা'র কাছারি-বাড়িতে এসেছিল তারা সবাই ওই কথা বললে—কর্তামশাই-এর ভীমরতি ধরেছে। বোধহয় পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের মায়া ছাড়তে পারছেন না এখনও। যখন জমিদারী ছিল, তখন ছিল। সে যুগ কবে চলে গেছে, এখনও আবার

জমিদারীর মায়া। চিনির কল হলে কত লোক কাজ পাবে, কত লোক দু'বেলা খেয়ে-পরে বাঁচবে, সেটা কিছু নয়? নিজের বংশের গৌরবটুকুই বড় হল কর্তামশাই-এর কাছে!

মুকুন্দ বললে, গোয়ালপাড়ায় গিয়ে আবার অন্য রকম কথা শুনে এলাম সা'মশাই—

কান্ত বললে, কি শুনে এলে?

—শুনলাম, সরকার মশাইকে নাকি ম্যানেজারবাবু মেরে হাড় ভেঙে দিয়েছে!

দুলাল সা' মালা জপছিল, হঠাৎ যেন তার ঈশ্বরভক্তি উদ্বেল হয়ে উঠল। নিজের মনেই বলে উঠল, হরি হরি, হরিই ভরসা—

মুকুন্দ বললে, আজ্ঞে তা তো বটেই, হরিই তো মানুষের একমাত্র ভরসা। কিন্তু থানা-পুলিসও তো রয়েছে সা'মশাই, কংগ্রেসী রাজত্বে হাতের কাছে থানা-পুলিস থাকতে তার কাছেই তো প্রতিকার চাইতে যাব, হরির কাছে তো আর যাওয়া যাচ্ছে না—হরিকে তো আর চোখে দেখতে পাচ্ছি নে—

কথাগুলো দুলাল সা'র ভাল লাগল না। হরি-নিন্দা কোনও কালেই দুলাল সা'র ভাল লাগে না।

হাত তুলে বিরক্তির ভঙ্গিতে শুধু বললে, তুমি থাম মুকুন্দ—

মুকুন্দ তবু থামলে না। বললে, ওরা যে সবাই ভাবছে আপনিই লাঠিয়াল দিয়ে সরকার মশাইকে জখম করেছেন? গোয়ালপাড়ার লোকরা তো তাই বলছিল সা' মশাই—

—বলুক গে! মাথার ওপর হরি সব দেখছেন!

—তা হরি কি তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন?

দুলাল সা' হাসল। বললে—দূর মূর্খ! হরির নামে বদ্‌নাম দি নে, মুখ খসে যাবে তোর! বলি, একটা কথার উত্তর দে দিকি ি আমাকে, এই ইহকালটা সব, না পরকালটাই সব?

—আজ্ঞে পরকালটা।

দুলাল সা' বললে, তা হলে? কোন্ আক্কেলে তুমি আমাকে থানা-পুলিস করতে বলছ মুকুন্দ! যদি থানা-পুলিস করতে হয় তো হরিই করবেন! যদি মামলা-মোকদ্দমা করতেই হয় তো হরিই তা করবেন! আমি কে? আমি কে রে? এই ভব-সংসারে আমি কতটুকু? কতটুকু আমার ক্ষমতা? তোমরাই বল?

কথাটা যুক্তি-গ্রাহ্য। এর ওপরে আর কারও কোন যুক্তিই খাটে না।

—আ রে, আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে জমি কিনে আমিই হয়ে গেলাম চোর, আর কর্তামশাই দাঙ্গা করতে এসেছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন মহাপুরুষ, এর নামই কলিকাল! সাধ করে কি দীক্ষা নিলাম মুকুন্দ! অনেক দুঃখে তবে দীক্ষা নিয়েছি। এই তো বেশ আছি বাবা, সারা দিন হরির নাম করি আর চুপচাপ পড়ে থাকি, এখন আর মনে কোন রাগ নেই কারোর ওপর, বেশ আছি—

তার পর আর একটু হরির নাম করে নিয়ে বললেন, জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক বুঝলাম, অনেক ভুগলাম, দুনিয়ার লোক দেখা হয়ে গেল আমার। আর দেখবার কিছু বাকি নেই হে! তাই যখন কর্তামশাই-এর কথা ভাবি তখন হরিকে বলি—হরি হে, তুমি সকলকে ক্ষমা করো, কর্তামশাই বুঝছেন না তিনি কি ক্ষতি করছেন নিজের—

ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা এমনি দাঁড়াল যে, আসল অপরাধী যেন কর্তামশাই। সদানন্দ হাসপাতালে পড়ে ছিল। সেখানেও সবাই দেখতে গেল তাকে।

সবাই বললে, আহা, কি নিষ্ঠুর লোক কর্তামশাই—

এদিকে কর্তামশাই-এর কাছেও লোকের আনাগোনার শেষ নেই। নিবারণ সেই তক্তপোশের ওপরই শুয়ে পড়ে আছে। থানায়

গিয়ে কর্তামশাই ডায়েরি করে এসেছেন। কিন্তু দুলাল সা'র লোক তার আগেই থানায় গিয়ে ডায়েরি করে এসেছিল। সুতরাং তদন্তই হচ্ছে ক'দিন ধরে। খুন-খারাপির কেস্। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত করাই নিয়ম। তাতে আসল অপরাধীকে ধরবার সুবিধে হয়। কিন্তু কর্তামশাই-এর মনে হয়, সেই তদন্তও যেন তাড়াতাড়ি করছে না থানার লোকরা।

বলেন, দেখি কত ঘুঁষ দিতে পারে দুলাল সা'—এর কোথায় তল্ সেটা একবার দেখে নেব—

নিবারণ চিঁ চিঁ করে বলে, আজ্ঞে, আমাকে আর জড়াবেন না ওর মধ্যে! যা হয়েছে তার আর চারা নেই, মিছি মিছি টাকার ছেরাদ্দ—

কর্তামশাই বলেন, হোক টাকার শ্রাদ্ধ, আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবই এবার, দরকার হলে বসত-বাড়ি বেচব, ওই দুলাল সা'র কাছেই বেচব—

যেন রোক্ চেপে গেছে কর্তামশাই-এর। যেন এই একটা প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি দুলাল সা'কে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন করে দেবার সুযোগ পেয়েছেন। শুধু নিশ্চিহ্ন নয়, দুলাল সা'র বংশ পর্যন্ত সমূলে উৎখাত করে দিলেই তবে যেন তিনি মনে কিছুটা শান্তি পান।

সকাল থেকে কেবল একবার বার-বাড়ি আর একবার ভেতর-বাড়ি করছেন। ক'দিন ধরেই এমনি করেছেন। সেই যেদিন নিবারণ সরকার মাথায় ফেটি বেঁধে এল। বুকের ব্যথাটাও সেইদিন থেকে বেড়েছে। দুলাল সা'র পুত্রবধূ নতুন-বৌ সেদিন এসেছিল। তার পর থেকেই।

বড়গিন্নী এমনিতে কথা বলে না। কিন্তু সেদিন আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, ওদের বউ এসেছিল বুঝি তোমার কাছে?

কর্তামশাই বললেন, হ্যাঁ, তোমার কানে দেখছি সব কথাই পৌঁছয়। কে বললে খবরটা তোমাকে শুনি ?

—গৌরী।

—পাড়া-পড়শীরা সবাই বুঝি খুব মজা পেয়েছে ?

বড়গিন্নী এ-কথার উত্তর দিলে না কিছু।

—পাক, মজা পাক, মজা পাওয়া এবার বার করে দেব আমি! আরও অনেক কথাই শুনবে তুমি এবার থেকে। এবার দুলাল সা'রই একদিন কি আমারই একদিন! বলে কিনা আমি জমি বেচেছি! পঁচিশ হাজার টাকায় আমি পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা বেচেছি দুলাল সা'কে! আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমি জমি বেচতে যাব দুলাল সা'কে! আমি জমি দান করব, জমি বিলিয়ে দেব, তবু দুলাল সা'কে দিতে যাব কেন শুনি? সে আমার বাপের শালা ?

এই রকম নিজের মনেই আবোল-তাবোল বকে যান কর্তামশাই।

সেদিন ঘুম থেকে উঠেই যথারীতি নীচে এসেছিলেন কর্তামশাই। এসেই দেখেন, নিবারণ তক্তপোশের ওপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেলেন। রেগেই ছিলেন, আরো রেগে গেলেন।

বললেন, এ কি, তুমি উঠে বসেছ যে!

নিবারণ চিঁ চিঁ করে বললে, এখন আজকে একটু ভাল বোধ করছি—

—ভাল বোধ করছি মানে? ভাল বোধ করলেই হল অমনি? এমন ভাল হয়ে ওঠা তো ভাল কথা নয়! জান, থানায় ডায়েরি করে দিয়েছি দুলাল সা' আর নিতাই বসাকের নামে ?

—আজ্ঞে, কেন ও-সব হুজ্জুত করতে গেলেন? ওতে কিছুই হবে না।

—হবে না মানে ?

—আজ্ঞে, যাদের টাকার জোর তারাই জিতে যাবে বড়লোকের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় না-নামাই ভাল !

—তা, আমার কি টাকা নেই ভেবেছ ? আমার বসত-বাড়ি নেই ? আমি বসত-বাড়ি বিক্রি করে মামলা চালাব, আমি ধনে-পুত্রে সর্বনাশ করব দুলাল সা'র তবে আমার নাম। তুমি শুয়ে থাক ! ওদিকে দুলাল সা' সদানন্দকেও হাসপাতালে পাঠিয়েছে, সে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সেখানে পড়ে আছে, তা জান ?

নিবারণ বললে, কিন্তু আমি তো সদানন্দর গায়ে হাতও তুলি নি—

—তুমি হাত তুলতে যাবে কেন ? আমাকে জব্দ করবার জন্যে সে নিজেই নিজের মাথা ফাটিয়েছে। দুলাল সা' জমিদারি চাল শেখাচ্ছে আমাকে ! আমি কিছু বুঝিনে ভেবেছে ! আমি নির্বোধ আহাম্মক ! তুমি শুয়ে পড়, আর কিছুদিন শুয়ে থাক, যদ্দিন তদন্ত শেষ না হয় পুলিসের, তদ্দিন শুয়ে পড়ে থাক, দেখি দুলাল সা' কেমন করে এবার পার পায়—

নিবারণ তক্তপোশটার ওপর অগত্যা শুয়ে পড়ল।

কেষ্টগঞ্জের সদর হাসপাতালে সদানন্দ শুয়ে ছিল খাটের ওপর। দুলাল সা' তার কোনও অভাবই রাখেনি। সা'মশাইয়ের বাড়ি থেকে দুবেলা সরু চালের ভাত আসে। হাসপাতালের ডাক্তার নার্স সবাই বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখে যায়। দুলাল সা'ও এসে দেখে যায়।

দুলাল সা' জিজ্ঞেস করে—কেমন আছ সদানন্দ ?

—আজ্ঞে মাথায় বড় বেদ্‌না—

—হরিকে ডাক সদানন্দ! হরির নাম কর! এ ভব-সাগরে হরি ছাড়া কারও কোনও ভরসা নেই সদানন্দ। আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ তো? আমি হরি ছাড়া কারও কথা ভাবিনে, নইলে এই বয়সে দীক্ষা নিলাম সাধ করে? কিসের দায় পড়েছিল আমার দীক্ষা নিতে বল তো?

সদানন্দ বলে, থানা থেকে পুলিসের দারোগা এসেছিল—

—হ্যাঁ, তা কি বললে তুমি?

—আজ্ঞে, আমি যা জানি তাই-ই বললাম। বললাম, আমি বাঁওড়ে বেড়া বাঁধার তদারক করতে গিয়েছি জন-মজুর নিয়ে, হঠাৎ কীর্তীশ্বর ভট্টাচায্যির ম্যানেজার নিবারণ সরকার এসে পেছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারলে।

দুলাল সা' বললে, সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলবে না সদানন্দ, ওতে তোমার জিভ্‌ খসে যাবে—

—আজ্ঞে, তা আমি জানি! আমার বাড়ির ওরা সব ভাল আছে তো সা'মশাই—

দুলাল সা' বললে, আমার সব দিকে নজর আছে সদানন্দ। হরির নাম করি বলে কি সংসার ত্যাগ করে বনে চলে গেছি? সব দিকে নজর না থাকলে চলবে কেন সদানন্দ! তোমার মাইনে তোমার বাড়িতে ঠিক পাঠিয়ে দেব, তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না। তোমার ছেলেমেয়ে-বৌয়ের কাপড়-জামা খাওয়া-পরা কিচ্ছু তোমায় ভাবতে হবে না—

—আর জন-মজুরদের সাক্ষীও তো নেবে পুলিসের লোক?

—সে-সব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। নিতাই আছে, তুমি যেমনটি সাক্ষ্য দিয়েছ তারাও তেমনি সাক্ষ্য দেবে, সত্যি বই মিথ্যা

কেউ বলবে না। মিথ্যা বললে নরকে পচতে হবে না? নরকের ভয় নেই কারও? তুমি চুপটি করে হরির নাম কর, হরির ধ্যান কর শুধু, আমার মত হরির ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ে থাক, দেখবে···

কথাটা আর শেষ হল না। পাশেই তখন এসে দাঁড়িয়েছে নতুন-বৌ।

ছুলাল সা' হাসল। বললে—এই দেখ, নতুন-বৌও এসে গেছে। এই আমার নতুন-বৌও প্রথমে ভুল করেছিল, জান সদানন্দ! ভেবেছিল, আমিই বুঝি কর্তামশাই-এর সঙ্গে গায়ে-পড়ে বিবাদ করতে গেছি! আরে আমি যদি অতই করতে যাব তো দীক্ষা নিলাম কেন শুনি? আমার কিসের আকর্ষণ? যে ক'টা দিন সংসারে আছি শান্তিতে কাটলেই ব্যস্, আর কিছু যে চাই নে রে বাবা! ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি, গাড়ি-বাড়ি আমার যে কিছুতেই আর আকর্ষণ নেই মা!

নতুন-বৌ স্নান সেরে মাথার চুল এলো করে দিয়ে এসেছিল। লালপাড় গরদের একখানা শাড়ি পরেছে। সেই দিকে চেয়ে ছুলাল সা' মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

বললে—না মা, তোমার কোনও দোষ নেই, সংসার এমনই জায়গা, এখানে খাঁটি সোনা দিলেও লোকে পেতল বলে ভুল করে। স্যাক্‌রাকে দিয়ে কষে নেয়—

নতুন-বৌ বললে—বাবা, নিতাইকাকা আসছে—

—নিতাই এসেছে? তা এখানে এল না কেন?

নতুন-বৌ বললে—কলকাতা থেকে খবর দিয়েছে, মিনিস্টারকে নিয়ে বিকেল বেলাই এসে পৌঁছবে—

—মিনিস্টার? মিনিস্টার কেন? কোন্ মিনিস্টার?

—কালীপদ মুখুজ্জে মশাই, এই এখুনি লোক এসে আমাকে

খবরটা দিয়ে গেল। আমাদের বাড়িতেই উঠবেন সবাই। সভা হবে কেষ্টগঞ্জের বাজারে, তা, তাঁদের সকলের তো খাওয়া-দাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করতে হয়! তাই আমি নিজেই বলতে এলাম।

দুলাল সা' বললে—ভালোই করেছ মা এসে—

—কিন্তু ক'দিন থাকবেন কিছু তো বলে পাঠান নি।

—তা, দু'একদিন থাকবেন নিশ্চয়ই, মন্ত্রী নিজেই যখন আসছেন, অন্তত দু'শো লোকের বন্দোবস্ত করতে হবে, চল মা চল—

—কি কি খাওয়ার বন্দোবস্ত করব?

—সবই করতে হবে, মাছ-মাংস, পোলাও-কালিয়া, চপ-কাটলেট, লুচি-ভাত—

—টেবিল-চেয়ার পেতে, না মাটিতে বসে কলাপাতা পেতে?

দুলাল সা' বলল—ও দু'রকমই ব্যবস্থা করতে হবে মা, সেবার যেমন হয়েছিল—আমরা কলাপাতার ব্যবস্থা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত কাঁটা-চামচে-টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হল! এত ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি? দু'রকম ব্যবস্থাই তো আছে আমাদের মা—আর পুলিস-মন্ত্রী যখন, তখন গোরা সাহেব-টাহেব সঙ্গে থাকতে পারে। ও দু'রকম ব্যবস্থাই করতে হবে—খরচের কথা ভেব না—সবই হরির ওপর ছেড়ে দাও—হরি যা করেন—

কর্তামশাই প্রথমে চিনতে পারেন নি। কবেকার কথা। সেই পনেরো-ষোল বছর আগে দেখা কেষ্ট মালোকে না চিনতে পারারই কথা। শনের নুড়ির মত মাথার চুল হয়ে গেছে। বৈঠকখানা ঘরে

ঢুকে এদিক-ওদিক চাইছিল। চোখে হয়তো ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না।

—কে ?

কর্তামশাই-এরও নজর ঠিক তেমন চলে না।

—আমি কেষ্ট মালো কর্তামশাই—পেন্নাম হই—

বলে কেষ্ট মালো এগিয়ে এসে কর্তামশাই-এর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

—সঙ্গে এ কে ?

কেষ্ট মালো বললে—এ আমার নাতি, জামাই-এর বাড়ি গিয়েছিলাম, তাই নাতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। পেন্নাম কর কর্তামশাইকে—

কেষ্ট মালোর নাতিও দাদামশাইয়ের মত মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলে।

কর্তামশাই বললেন—তোমাকেই ডেকেছিলাম কেষ্ট, আমার নাতনীর জন্যে। আমার নাতনীর কথা মনে আছে তো কেষ্ট? হরতন ? তিন বছরের নাতনী, সিদ্ধেশ্বরের মেয়ে! সেই যে সে মারা গেল, তারপর সিদ্ধেশ্বরও পালিয়ে গেল, বৌমাও গেল—আমি ও-সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তা এক সাধু এসেছিল তুলাল সা'র বাড়ি, সেই সাধুই তার কুষ্ঠি দেখে বললে, সে নাকি বেঁচে আছে এখনও—

কেষ্ট বললে—আজ্ঞে, সরকারমশাইয়ের কাছে আমি সব শুনিচি।

—তা শুনেছ যখন, তখন আর নতুন করে কী বলব। শোনা পর্যন্ত মনটা বড় ছট্‌ফট্‌ করছে আমার, বুঝলে কেষ্ট? আমার সোনার প্রতিমাকে আমি এমন করে ভাসিয়ে দিলাম—আমার যে কী আপসোস হচ্ছে কী বলব তোমাকে। আচ্ছা সত্যি করে মনে করে দেখ তো, আমার নাতনীর সৎকার হয়েছিল কি না? তোমার কিছু মনে পড়ে?

কেষ্ট মালো মেঝের ওপরই বসে পড়েছিল।

বললে—মনে করে তো দেখেছি কর্তামশাই, আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি সৎকার করতে দেখিনি—ঝড়-বিষ্টির রাত, আমি কাঠ-কুটো চেলা করে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সত্য ছিল, সত্যকে বলে গেলাম তুমি দেখ, আমি চললাম—আমার আবার শ্লেষ্মার ধাত কিনা।

—সত্য কে?

—আজ্ঞে, বসন্ত মালোর ছেলে।

—তা সে কী বলে? তাকে একবার খবর দিতে পার না? তার যদি কিছু মনে থাকে?

—আজ্ঞে, তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত কর্তামশাই! সে যে এখানে নেই, সে যে তার ছেলের কাছে থাকে এখন।

—ছেলে কোথায় থাকে?

—ছেলে চাকরি করে হাওড়ার পাট-কলে। কলকাতায়।

কর্তামশাই যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার ছেলের হাওড়ার ঠিকানাটা একবার দিতে পার তুমি কেষ্ট? তোমার এই নাতির হাত দিয়ে না-হয় পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। তোমার নিজের আসবার দরকার নেই। তার ঠিকানাটা একখানা চিরকুটে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—আমি না-হয় নিজেই একবার কলকাতায় গিয়ে দেখা করে আসব সত্যর সঙ্গে।

কেষ্ট বললে—তা পারি, কিন্তু আপনি এই বুড়ো বয়েসে একলা কলকাতায় যাবেন কি করে?

কর্তামশাই বললেন—তা আর কি করব। যাব, যেতেই হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন—আর, তা ছাড়া আমার আর কে আছে বল না, যে যাবে? আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী কেউই

নেই, বুড়ো বয়েসে যাদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজতে পারি, এমন কেউই নেই আমার কেষ্ট, কেউ নেই।

কেষ্ট বললে—আজ্ঞে সে তো ভগবানের মার, আপনি আর কি করবেন ?

কর্তামশাই বললেন—না কেষ্ট, ভগবানের নামে দোষ দিও না, ভগবান দোষ করলে তবু না-হয় বুঝতাম, কিন্তু মানুষেই যে আমার চরম সর্বনাশ করলে ! সংসারে মানুষের মতন বড় শত্রু মানুষের আর কেউ নেই কেষ্ট, নইলে আমার একমাত্র ছেলে ঘর-বাড়ি-সংসার ত্যাগ করে বুড়ো বাপকে ফেলে চলে যায় ? আমার একমাত্র সোনার প্রতিমা হরতন, সে চলে যায় ? ছিল এক বৌমা—তাকেও হারাই ? এ কার শত্রুতা বল দিকিনি কেষ্ট ? কার ?

কেষ্ট মালো কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। হাঁ করে চেয়ে রইল কর্তামশাই-এর মুখের দিকে।

—আবার কার ? ওই দুলাল সা'র ! ওই দুলাল সা'ই তো আমার সর্বনাশটা করলে ! নইলে আমিই বা হরিসভার মধ্যে যাব কেন ? আর দুলাল সা'ই বা এত জায়গা থাকতে এই কেষ্টগঞ্জে মরতে এল কেন ? আর জায়গা পেল না ? এই দেখ না, নিবারণটা ছিল, তার পর্যন্ত মাথা ফাটিয়ে দিলে।

তারপর একটু থেমে বললেন—তা যাক্ গে, সে-সব কথা তোমায় বলে মাথা খারাপ করতে চাই না। ওই কথাই রইল তাহলে কেষ্ট, ঠিকানাটা আমায় পাঠিয়ে দিও, আমি কলকাতায় গিয়ে একবার শেষ চেষ্টাটা করে আসব। ডুবতেই যখন বসেছি, তখন একবার তলায় তলিয়েই দেখি না—কোথায় তল্ ? তা, তোমার কি মনে হয় বল তো কেষ্ট, হরতন বেঁচে আছে, না কি বল ?

কেষ্ট মালো সান্ত্বনার সুরে বললে—আজ্ঞে, সাধু-সন্নিসীদের কথা কখনও কি মিথ্যে হয়—ওনারা তো দিব্যচক্ষে দেখতে পান সব—

—আমিও তো তাই ভাবি কেষ্ট। সাধু কি বলেছে জান কেষ্ট? বলেছে, হরতনকে যদি একবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারি তো আবার রমারম্ করে উঠবে ভট্‌চায্যি-বাড়ি, আবার সেই আগেকার ভট্‌চায্যি-বাড়িতে লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা আত্মীয়-স্বজনে ভরে উঠবে। ওই দুলাল সা'কে দেখছ তো তোমরা, আর আগে ভট্‌চায্যি-বাড়ির অবস্থাটাও তুমি দেখেছ! তার কাছে এ? তুমিই বল? তার কাছে এ লাগে? ছোঃ—

কেষ্ট মালো চুপ করে শুনছিল।

কর্তামশাই বলতে লাগলেন—তবে এও তোমরা দেখে নিও কেষ্ট, দুলাল সা'র গুমোর আমি ভাঙবই। দুলাল সা' কত বড় হারামজাদ্ আমি দেখে নেব! ভেবেছে আমি মরে গেছি, ভেবেছে আমি বেঁচে নেই, ভেবেছে মাথার ওপর ভগবান বলে কেউ নেই! আর ভগবান যদি না থাকবে তো চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে কি করে, পৃথিবীটা চলছে কি করে? এই যে এত বড় যুদ্ধটা গেল, হিটলারই মারা গেল, পৃথিবীটার কিছু ক্ষতি হল? বল কেষ্ট, বল তুমি? আমি কিছু অন্যায় বলেছি? পৃথিবীটার এক কুচি ক্ষতি হয়েছে?

কেষ্ট মালো বললে—আজ্ঞে, তা তো বটেই—

—তবে? তবে এত যে তার দেমাক, ছেলে বিলেত গেছে বলে মাটিতে পা দিস নে, পাটের আড়ত করেছিস বলে মানুষের মাথায় চড়ে বসেছিস, এ ক'দিন? একবার যদি হরতনকে এনে ঘরে তুলতে পারি তখন কোথায় থাকবি তুই শুনি? তখন আমারও যদি মাটিতে পা না পড়ে, তখন আমিও যদি সকলের মাথায় চড়ে বসি!

বলতে বলতে বোধহয় খেয়াল ছিল না কর্তামশাই-এর যে কার কাছে কথাগুলো বলছেন। খেয়াল হতেই সামলে নিলেন।

বললেন—যাক্ গে, ভগবানের ইচ্ছেয় যদি দিন পাই তো সে-সব তোমরাই দেখতে পাবে—এখন আগের থেকে বলে কোন লাভ নেই—তা হলে ওই কথাই রইল কেষ্ট, তোমার মনে থাকবে তো ?

কেষ্ট মালো নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মনে থাকবে—

কর্তামশাই বললেন—আমি নিজেই কলকাতায় যাব কেষ্ট, পরকে দিয়ে কাজ হয় না, পরকে দিয়ে কাজ করালে কেবল কাজ পণ্ড হয়। আমি নিজেই মরে মরে যাব—

কেষ্ট মালো নাতির হাত ধরে সদর পেরিয়ে কালকাসুন্দির ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কর্তামশাই আর তাদের দেখতে পেলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের সামনেই যেন আর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। মনে হল, যেন সামনেই হঠাৎ একটা বাগান হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। ফুলের বাগান। জাঁতিকাটা ফুলের ঝাড়টা আবার গজিয়ে উঠেছে কোণের দিকে। সাদা সাদা থোপা-থোপা ফুল ফুটেছে। লাল পথটার ওপর লাল-সাদা ঘোড়াটা গাড়িতে জোতা রয়েছে। সহিস-কোচোয়ান গাড়ির মাথায় বসে। ওপাশে পুকুরটায় আবার তর তর করছে জল। তাতে পদ্মফুল ফুটে আছে সেই আগেকার মত। কর্তামশাই-এর বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। আনন্দে ভয়ে কর্তামশাই শিউরে উঠতে লাগলেন মনে মনে। একটা দুটো করে পদ্মফুলগুলো গুণতে লাগলেন ; আশ্চর্য, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো আটটা পদ্মফুল ! একশো আটটা পদ্ম একসঙ্গে ফুটে রয়েছে !

কেষ্টগঞ্জের দুলাল সা'র বাড়ির সামনের খোলা মাঠে তখন পুরোদমে মিটিং চলছে। নিতাই বসাকের স্থির হয়ে বসবার সময় নেই। সে-ই আসল হোতা। খদ্দরের একটা পাট-করা চাদর কাঁধে ফেলে দিয়েছে। একবার দুলাল সা'র পেছনে গিয়ে কানে কানে কি কথা বলে আর একবার মুখে আঙুল দিয়ে সকলকে চুপ করতে বলে। বলে, আস্তে, আস্তে—

যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছে তার নিরীহ গো-বেচারা মানুষ। গোলমাল করবার সাহস তাদের নেই। ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসের সমস্ত স্টাফ আজ ছুটি পেয়েছে। তারা এসে সামনের সারিতে বসেছে, তার পর আছে পাটের ব্যাপারীরা। তার পর আছে মালোপাড়ার তাবৎ নিরক্ষর চাষীরা, আর আছে চাষী-ক্ষেতমজুরের দল। ভয়ে-ভক্তিতে সবাই গদগদ। আর গদগদ না হয়েও উপায় নেই। থানা থেকে পুলিসের দল এসে আশে-পাশে সব ঘিরে রয়েছে। আর মাঝখানে তক্তপোশ পাতা হয়েছে, তার উপর খান-কতক টেবিল-চেয়ার। সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিসের দারোগা, আর দুলাল সা' বসে আছে। আর ফুলের মালা গলায় দিয়ে কালীপদ মুখার্জি বক্তৃতা দিচ্ছেন।

দুলাল সা' প্রথমে ওপরে উঠে বসতে চায় নি।

বলেছিল, আমাকে আবার কেন? আমি কে? আমি এক কোণে বসে বসেই ওঁর বক্তৃতা শুনব—

নিতাই বসাক বলেছিল, তাই কখনও হয়? এই তো তোমার

দোষ। মন্ত্রী তো আর রোজ রোজ আসছেন না, আর এই সময়েই যদি আড়ালে থাক তো আমি একলা কি করে সামলাব ?

শেষে অনেক বলার পর রাজী হয়েছিল ডুলাল সা'। হাতে হরিনামের জপের মালা। সেই মালা জপতে জপতেই বক্তৃতা শুনছিল।

মন্ত্রীমশাইয়ের গলা ভাল। তিনি তখন বলছিলেন—দেশের এই দুর্দিনে শুধু সরকারের হাতে দেশ-সেবার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে আপনাদের চলবে না। আপনারাও এগিয়ে আসুন। আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে দেশ-সেবায় হাত মেলাতে হবে। এ আপনাদেরই নিজেদের দেশ। বহু কষ্ট করে, বহু জীবন বলি দিয়ে আপনারা এই স্বাধীনতা পেয়েছেন। এ স্বাধীনতা অর্জন করবার দায়িত্ব যেমন আপনারা একদিন মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, এই স্বাধীনতা ভোগ করার গুরু দায়িত্বও আপনাদের নিতে হবে। আপনারাই দেশের মালিক, আপনারা যারা অগণিত জনসাধারণ, তারাই দেশের কর্ণধার, আমরা মন্ত্রী হলেও আমরা কিছু না। আপনাদের হয়ে আমরা দেশের উন্নতির জন্যে পরিশ্রম করছি। গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন ? বলুন, আপনারা তো গান্ধীজীর জীবন জানেন, আপনারাই বলুন গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন ? বলুন ?

হলধর সামনে বসেছিল। কথাটা তার দিকে চেয়েই বলছিলেন মন্ত্রীমশাই। সে আরও ঘাবড়ে গেল।

কান্ত বসেছিল পাশে। তার সাহসের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সে টপ্ করে বলে ফেললে—আজ্ঞে, তিনি চেয়েছিলেন আমাদের ভাল হোক—

মন্ত্রীমশাই লুফে নিলেন কথাটা। বললেন, ঠিক কথা। তিনি চেয়েছিলেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। রামরাজ্য মানে কি ? আপনারা রামায়ণ পড়েছেন, রামরাজ্যের কথা আপনাদের বেশী

বলতে হবে না। মানে, রামরাজ্য মানে এমন এক রাজ্য যেখানে··· যেখানে···

দুলাল সা' নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলে। নিতাই কাছে এসে নীচু হতেই দুলাল সা' ফিস্ ফিস্ করে বললে, কর্তামশাই মিটিং-এ এসেছে নাকি?

নিতাই বললে, না—

—খুব সাহস তো—তুমি খবর দিয়েছিলে?

নিতাই বললে, শুনলাম কলকাতায় গেছে বুড়ো—

—কলকাতায়! কলকাতায় গেছে কি করতে? জানাশোনা কেউ আছে নাকি? খবর নিয়েছ?

নিতাই বললে, যাক না, আমি আছি কি করতে?

—না, না, একটু সাবধানে থাকতে বলছি, সদানন্দকে হাসপাতালে চুপচাপ থাকতে বল, আর ডাক্তারকে সেই যে দুশো টাকা দিতে বলেছিলাম, সে দেওয়া হয়েছে তো? ডাক্তারের হাতেই তো এখন সব কি না।

—সে তুমি কিছু ভেব না, সে ঠিক লিখে দেবে মাথায় লাঠি মারার ফলে স্কাল্ ফেটে গেছে।

—স্কাল্ মানে?

নিতাই বললে, ওসব কথা এখন থাক। বুড়োকে আমি জব্দ করছি দেখ না—

—আর নিবারণ? সেটা কেমন আছে? বেঁচে আছে তো?

মন্ত্রীমশাই তখন বলে চলেছেন, আমরা চাই ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের মানুষ যেন নিজেরাই তাদের সমস্যা মেটাতে পারে। আমরা পিচঢালা রাস্তা করে দেব, আপনারা সবাই মিলে দু'পাশে ফলের গাছ পুঁতে দেবেন, দেশের খাদ্য-সমস্যা মেটাবার ভার আপনাদের হাতে। বাংলা দেশ সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ,

আপনারা চেষ্টা করলে এখানে সোনা ফলাতে পারেন। পুকুরে মাছ ছাড়ুন, ক্ষেতে ধান বুনুন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাটা আপনারা একটু চেষ্টা করলেই মেটাতে পারেন। তুচ্ছ কারণে সরকারকে বিরক্ত করবেন না, সরকার আরও বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সরকার যদি আপনাদের এই সব সামান্য ছোটখাট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন বড় বড় যে-সব সমস্যা রয়েছে তা কখন ভাববে? এই ক'বছরে সরকার কত কাজ করেছে তা জানেন আপনারা নিশ্চয়ই, ডি, ভি, সি, বাঁধ হয়েছে, ময়ূরাক্ষী বাঁধ হয়েছে, এবারে ফারাক্কা বাঁধ হবে। আরও অনেক কাজ বাকি আছে করতে, এখন কে কার জমি দখল করে বসল বে-আইনী করে, কার ছাগল কার ধান খেয়ে গেল, এ সব কাজ যদি সরকারকে দেখতে হয় তা হলে তো কোনও কাজই করতে পারবে না সরকার। আপনারাও এগিয়ে আসুন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে হাত মেলান, তবেই তো দেশ আবার জাগ্রত হবে, তবেই তো আমরা পৃথিবীর আর পাঁচটা শক্তির মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। সরকারের নিজের শক্তিতে যা কুলোয় তা সরকার করছে। এই সেদিন রাশিয়া থেকে ক্রুশ্চেভ সাহেব এসে আমাদের কাজের প্রশংসা করে গেছেন, এই সেদিন চায়না থেকে চৌ-এন-লাই সাহেব এসে পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে অনেক জিনিস উপহার দিয়ে গেছেন। আমাদের প্রতিবেশী-শক্তির সঙ্গে আম্‌রা বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। সে ছবি আপনারা খবরের কাগজে দেখেছেন। দেশ হু হু করে এগিয়ে চলেছে, এ সময়ে আপনারা পেছিয়ে থাকবেন না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের বন্ধু, জার্মানী আমাদের ইস্পাতের কারখানা করে দিয়েছে, রাশিয়া আমাদের···

দুলাল সা' আবার ইঙ্গিত করলে নিতাই বসাককে।

নিতাই কাছে আসতেই দুলাল সা' ফিস্ ফিস্ করে বললে, কালীপদবাবুকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, মনে থাকে

যেন, বলবে এখানকার হাসপাতালের কেমন সুব্যবস্থা, এই সব আর কি···মানে আমি কত টাকা চাঁদা দিয়েছি, এই কথাটা কায়দা করে···

নিতাই বললে, তুমি কিছু ভেব না—

—আর আমার সঙ্গে মন্ত্রী কথা বলছেন, এই রকম একটা ফোটো তুলিয়ে নিতে হবে, বুঝলে, বড় করে বাঁধিয়ে রাখতে হবে, আর নতুন-বৌকে খাবার-দাবারের সব বন্দোবস্ত করতে···

নিতাই বললে, তুমি অত নার্ভাস হচ্ছ কেন? আমি তো আছি—

—না, মানে, আবার কবে মন্ত্রী আসবেন বলা যায় না তো। আর সেই কথাটা মনে আছে তো?

নিতাই বসাক বুঝতে পারলে না। বললে, কোন্ কথাটা?

—কোন্ কাজটা ফাঁক পড়ে যায় বলা যায় না তো। আমি নতুন-বৌকে বলে রেখেছিলাম পাঁচশো রুপোর টাকা যেন নতুন-বৌ কালীপদবাবুর হাতে দেয় প্রণামী বলে, উদ্বাস্তু-ফাণ্ডে দেবার জন্যে··· মানে···

নিতাই বসাক যেন কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চটাপট্ চটাপট্ করে হাততালির শব্দ উঠতেই সজাগ হয়ে উঠল। দুলাল সা'ও সোজা হয়ে বসল। কালীপদবাবুর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। নিতাই বসাক পেছনে গিয়ে মুখ নীচু করে বললে, ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন স্যার, অপূর্ব, এমন সহজ করে সব বুঝিয়ে দিলেন আপনি, জলের মত সোজা হয়ে গেল।

মিটিং ভাঙার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সবাই এসে বলতে লাগল—অপূর্ব, অপূর্ব—

সুকান্ত রায় সোজা এসে একেবারে পায়ের ধুলো নিলে। নিয়ে মাথায় ঠেকাল। স্ত্রী পাশেই ছিল। সে-ও পায়ের ধুলো নিয়ে

মাথায় ঠেকাল। সুকান্ত বললে, চমৎকার, কিরণশঙ্কর রায়ের বক্তৃতা শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভাল।

দুলাল সা' কিছুই বলে নি। সে যেন নিমিত্ত মাত্র। সে যেন কেউ-ই না। সমস্ত কাজ-কর্ম বর্তমান-ভবিষ্যৎ সে যেন হরির পায়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার যেন কোন উদ্বেগ নেই। দুশ্চিন্তা নেই।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে, আপনি কেমন শুনলেন সা' মশাই ?

দুলাল সা' বললে, সবই হরির ইচ্ছে হে, তাঁর ইচ্ছে থাকলে সবই সুরাহা হয়ে যায়, তাই তো বলি হরিই ভবার্ণবে একমাত্র ভরসা।

ততক্ষণে পুলিসের দল সজাগ হয়ে উঠেছে। কেউ না সামনে এগিয়ে আসে, কেউ না ভিড় ঠেলে মন্ত্রী-মশাইয়ের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশিষ্ট ক'জনকে রেখে বাকি সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সব হট্ যাও, সব সরে যাও।

সুকান্ত রায় নিতাই বসাককেই খুঁজছিল। সাধারণ আলাপ পরিচয় হয়েছে শুধু একবার। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিতাই বসাকই।

নিতাই বসাকই বলেছিল, এই ইনি এখানকার ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, কিরণশঙ্কর রায়ের একজন প্রধান শিষ্য।

সুকান্ত বলেছিল, আপনি বোধহয় আমার ছবি দেখেছেন স্যার, আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল।

—কি ছবি ?

—আজ্ঞে, কিরণশঙ্কর রায়ের ডেড-বডি আমি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত, লম্বা সাত মাইল পথ, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি স্যার, আমার ছেলেমেয়ের এডুকেশনের জন্যে যদি কলকাতার কাছাকাছি কোনও ব্লকে বদলি করে···

এত ভিড় ! নিরিবিলি যে একটু কথা বলবে, নিজের দুঃখের কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝিয়ে বলবে তারও সুযোগ হয় নি তখন। পুলিসের দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সকলেই যেন ঠিক তখনই হুড়মুড় করে এসে পড়ল। মিনিস্টার দেখলেই যেন যত স্বার্থ-সিদ্ধি করবার চেষ্টা। সুকান্তর কথাটা ভাল করে শেষ করবার আগেই আরও দশজন এসে পড়ল। নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগটাও দিলে না কেউ।

নিতাই বসাক বলেছিল, তা হোক, এখন তো পরিচয় হয়ে রইল আপনার, তার পর মিনিস্টারও রইলেন আমিও রইলাম, আপনার ভাবনা কি ?

সুকান্ত বলেছিল, কিন্তু দেখলেন তো, ঠিক এই সময় সবার কাজ পড়ল ! ভাবলাম কিরণশঙ্কর রায়ের কথাটা বলে তার পর ট্রান্স-ফারের কথাটা বলব।

—কিন্তু ছেলেমেয়ের এডুকেশনের কথা বললেন যে, ছেলেমেয়ে আপনার কোথায় ?

—ছেলেমেয়ের এডুকেশন না বলে আর কি কারণ দেখাই বলুন ? আর তো কোনও সুটেব্‌ল্‌ কারণ খুঁজে পেলাম না।

—তা বেশ করেছেন, পরে আবার চান্স জুটিয়ে দেব আমি, চীফ-মিনিস্টারকে পর্যন্ত আমি এই কেষ্টগঞ্জে আনতে পারি, তা জানেন ? আপনি আছেন কোথায় ? একবার সুগার-মিলটা আমায় করে ফেলতে দিন।

তা, এত কথার পরও সুকান্ত আশা ছাড়ে নি, মিটিংয়ের পরই তাই আবার তাড়াতাড়ি সকলের আগে গিয়ে মিনিস্টারের পায়ের ধূলো নিয়েছিল। ভেবেছিল আর একটা সুযোগ পেলেই কথাটা খোলসা করে বলে ফেলবে। কিন্তু পুলিসের দল এসে তখনি ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিয়েছিল।

কি করবে বুঝতে না পেরে সুকান্ত আর সুকান্তর স্ত্রী দাঁড়িয়েই ছিল সেখানে। যদি নিতাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, যদি নিতাইবাবুকে বলে মিনিস্টারের সঙ্গে শেষবারের মত দেখাটা করা যায়। তারপর কেষ্টগঞ্জ ছেড়ে একবার চলে গেলে আর কি দেখা করার সুযোগ মিলবে। হঠাৎ নিতাই বসাককে দূর থেকে দেখা গেল।

—নিতাইবাবু, নিতাইবাবু!

কিন্তু নিতাই বসাক আজ যেন ঈদের চাঁদ হয়ে গেছে। দূরে ভিড়ের মধ্যে একবার খানিকক্ষণের জন্যে দেখা যায়, আবার তখনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পুলিস-পাহারার আড়ালে তখন মিনিস্টার দুলাল সা'র বাড়ির সদর-বারান্দার ভেতর ঢুকে গেছেন। সঙ্গে আছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দুলাল সা', আরও গণ্যমান্য অনেকে।

বাড়ির ভেতরে টেবিলে সাজিয়ে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাঁটা-চামচে-প্লেট-টেবিল-চেয়ারের ছড়াছড়ি। সেখানে গিয়ে হাজির হতেই যেন চমকে উঠল। ওখানে কে? কে ওখানে?

নতুন-বৌও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। শ্বশুরকে দেখেই এদিকে এগিয়ে এসেছে।

—ও কে নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ সামনে গলা নীচু করে বললে, ও-বাড়ির বড়গিন্নী এসেছেন, জ্যাঠাইমা—

দুলাল সা' তবু বুঝতে পারলে না। নিতাই বসাক কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, তা, কর্তামশাই তো সলাপরামর্শ আঁটতে কলকাতায় গেছেন শুনলাম, বড়গিন্নী এসেছেন কি করতে?

নতুন-বৌ বললে, বড় বিপদে পড়ে এসেছেন উনি, বাড়িতে কেউ নেই, সরকারমশাই-এর বড় খারাপ অবস্থা, এখন যায়, তখন যায়, উনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না, তাই ঝি'কে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন—

নিতাই বসাক রেগে গেল, তা সরকার মশাই-এর অসুখ, আমরা কি করব ? আমরা তার কি জানি –

দুলাল সা' বিচক্ষণ মানুষ। বললে, সে কি কথা নিতাই, বিপদের সময় শত্রু-মিত্র দেখতে নেই, আমি যাচ্ছি—

নিতাই বসাক বললে, তুমি এই সময় অমনি গেলেই হল ! তাহলে এদিক সামলাবে কে ?

—তা এদিকটাই বড় হল ? এদিক দেখবার জন্যে তো অনেক লোক আছে, মানুষের জীবন বড়, না মিনিস্টারের আপ্যায়ন বড়, হরি হরি, তাহলে মিছেই হরির নাম করছি—

তখন একপাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বড়গিন্নী। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ে নি। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে ঝি-এর মেয়েটাকে নিয়েই চলে এসেছিল। বাড়ির বৈঠকখানায় তখন সরকার মশাই যেন খাবি খাচ্ছিল দেখে এসেছে। কোথাও কারো কাছে সাহায্য পাবার আশা নেই। কর্তামশাই হন্ত-দন্ত হয়ে নিজেই চলে গেছেন কলকাতায়। তার জন্যেও একটা ভাবনা আছে। আশে-পাশে যে কাউকে ডেকে একবার খবর দেবে তারও উপায় ছিল না। বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল গৌরী, তাকে নিয়েই চলে এসেছে এখানে। এখানে যে আজ এত ভিড় তাও জানা ছিল না। এখানেও পুলিস-পাহারা দেখে অবাকই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েমানুষ দেখে বাধা দেয় নি কেউ। একেবারে খিড়কি দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

দুলাল সা' সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, আপনার কোনও ভাবনা নেই মা-ঠাকরুণ, আমি ব্যবস্থা করছি সব—

বলেই কাকে যেন ডাকলে—এই কান্ত, ইদিকে আয়—

তার পরেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। নিজের গাড়ি দিয়ে দুলাল সা' বড়গিন্নীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। ডাক্তারকেও ডাকতে

পাঠিয়ে দিলে। নিতাই বসাককে বললে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হয়, বুঝলে না?

নিতাই বললে, কিন্তু কোথাকার কে মলো না বাঁচল তা নিয়ে আমাদের কি মাথাব্যথা!

—তোমার মাথা!

দুলাল সা' জোরে জোরে মালা জপতে লাগল।

—এখন যদি নিবারণের একটা কিছু হয় তখন কি হবেটা ভেবেছ? মাথাটা ঠাণ্ডা করে কাজ করবে—হরি হরি, হরিকে কি সাধ করে ডাকি? যাও, এখন ফটো তোলার ব্যবস্থা করে ফেল, ছবিটা তুলে এখন একবার আমাকেই নিবারণকে দেখতে যেতে হবে—

ওদিকে মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে তখন সবাই ব্যস্ত। পাশের চেয়ারটা খালি রাখাই হয়েছিল দুলাল সা'র জন্যে। দুলাল সা' সেখানেই গিয়ে বসল। ক্যামেরাম্যানকে বলা ছিল। সে-ও তৈরি। দুলাল সা' বসতেই ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরলে।

ওদিকে খিড়কির দরজার সামনে দুলাল সা'র গাড়ির ভেতরে উঠে বসল বড়গিন্নী।

নতুন-বৌ দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিয়ে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই না-ই বা থাকলেন, আমরা তো আছি, সময় পেলেই বাবাকে নিয়ে আমি যাব'খন, ভাববেন না—

দুলাল সা'র গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

হাওড়ার জুটমিলের যাত্রা সেদিন যেন তেমন জমছিল না। 'রাণী রূপকুমারী' আরাকান-রাজের মেয়ে। আরাকান-রাজ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের ভেতরে বিদ্রোহ চলছে। সঙ্গে রাণী রূপকুমারী, আর মেয়ে বহ্নিবালা। কুমারী মেয়ে। পথ হারিয়ে তিনজনে তিন দিকে চলে গেছে। খুব জমাট নাটক। একবার শুনতে আরম্ভ করলে শেষ দেখে উঠতে হবে। দর্শকদের নট্-নড়ন-চড়ন অবস্থা। অঞ্জনা যতদিন রাণী রূপকুমারীর পার্ট করেছে ততদিন এমনি চলেছে। দু'হাতে টাকা কামিয়েছে চণ্ডীবাবু। মোটা মোটা মাইনে দিয়েছে দলের লোকদের। সবাই অন্য দল ছেড়ে চণ্ডীবাবুর দলে এসে জুটত। খাওয়াটা ভাল দিত চণ্ডীবাবু। সাবান আর সরষের তেলটা এ-দলের লোকদের গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে হয় না।

চণ্ডীবাবু বলতেন, তোরা যদি খুশী থাকিস তাহলেই আমি খুশী বাবা, আমার আর কে আছে বল না, তোরাই তো আমার সব রে—

সামান্য সাবান আর সরষের তেল। কি-ই বা দাম! আগে ও নিয়ে চণ্ডীবাবু মাথা ঘামাতেন না। সস্তা রঙিন সাবান ডজন দরে চিৎপুরের পাইকারী দোকান থেকে কিনতেন। আর সরষের তেল যখন যে-দেশে যেমন পাওয়া যায়। তা ওটা অনেক সময় পার্টিরাই যোগান দিত। নাম হত চণ্ডীবাবুর।

বিড়ি সিগ্রেটটাও অনেকে যোগান চেয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজী হন নি চণ্ডীবাবু।

চণ্ডীবাবু বলেছিলেন, না রে বাবা, ওতে আমি ফতুর হয়ে যাব, তেল-সাবান দিচ্ছি, দিচ্ছি, ধোঁয়া আর যোগান দিতে পারব না— অত ধোঁয়া লাগলে আমার ত'বিল ফেল পড়ে যাবে—

তা তাই-ই সই। তা নিয়ে আর কেউ উচ্চ-বাচ্য করে নি।

চণ্ডীবাবু বলতেন, তাছাড়া ধোঁয়া দিতে কি আর পারি না? পারি। কিন্তু পরের পয়সায় ফোকটে ধোঁয়া টেনে টেনে গলাটা কি আর রাখবি বাবা তোরা? গলার দফা রফা হয়ে যাবে—

কিন্তু সেই তেল-সাবানের দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। আগে একটা সাবান পড়ত ছ' পয়সা কি বড় জোর আনা দু'য়েক। তারই দাম এখন পাঁচ আনা হাঁকে। আর তেল? চণ্ডীবাবুর দলের যেমন ভাঙন ধরতে লাগল, সরষের তেলের দামও তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে লাগল। পাকিস্তানের বাজারটা গেল, আসামের বাজারটাও যাবে-যাবে, তার ওপর অঞ্জনার শরীরটা ভেঙে পড়ল। দলবল নিয়ে গেছেন বাঁকুড়াতে, প্রথম অঙ্কটা সেরে সাজঘরে এসেছে, হঠাৎ বলে, মাথাটা কেমন টিপ টিপ করছে যেন বাবা—

প্রথম প্রথম ওষুধের বড়ি ছিল। অ্যাস্পিরিনের বড়ি। যত জায়গায় যেতেন, সব জায়গায় শিশি-ভর্তি বড়ি নিয়ে যেতেন চণ্ডীবাবু। বলতেন, কিচ্ছু ভয় নেই, বড়ি খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নে—

শেষকালে আর সে-বড়িতেও কাজ হত না। তখন মিকশ্চার। ডাক্তারের মিকশ্চার খেয়ে খেয়ে কিছুদিন চলল। কিন্তু শেষকালে তাতেও কিছু হল না। যে-কে-সেই। মাথা ধরা ছাড়ে তো জ্বর ছাড়ে না, আর জ্বর ছাড়ে তো মাথা-ধরা ছাড়ে না। ডাক্তার বলেন, এ রাজরোগ!

ব্যস্। সেই যে অঞ্জনার রাজরোগ হল, সেই থেকে শ্রীমানী অপেরা'ও কানা হয়ে গেল। আগেকার নাম যেটুকু আছে তাই ভাঙিয়েই খাওয়া। একটা মেয়ে নেই যুৎসই যে দলটাকে টেনে

তোলে। তবু এককালে 'অকুলের কাণ্ডারী'র নাম-ডাক ছিল তাই 'শ্রীমানী অপেরা' এখনও কল্ পায়। কিন্তু খানিকক্ষণ গাওনা দেখেই লোকে বুঝতে পারে। বলে, আরে এ যে মদ্দা রাণী—

গোঁফ-টোঁফ চেঁছে কামিয়ে, ভাল সার্টিনের ব্লাউজ, জর্জেট সিল্কের শাড়ি পরিয়ে দিলেও ধরা পড়ে। তারপর বিড়ি খেয়ে-খেয়ে ঠোঁটটাকে এমন কালিমারা করে রেখেছে বঙ্কুটা যে, রসিক মানুষের চোখ এড়ায় না। বঙ্কুকে অনেক দিন থেকে বদল করবার চেষ্টা করছিলেন চণ্ডীবাবু, কিন্তু তেমন লোক মেলে কোথায়? কলকাতার থিয়েটার ফেলে কে আর মফঃস্বলে- মফঃস্বলে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে চায়। বঙ্কু যখন মিহি গলায় আসরে গিয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে বলে—

কোথা যাব, কোথা যাব অবলা রমণী,
কে আছে আমার?
কার কাছে মাগিব আশ্রয়, বল অন্তর্যামী ··

তখন আসর থেকে সিটি বাজায় লোকেরা। অমন একটা চমৎকার অ্যাকটিংও জমে না। নাটক ঝুলে পড়ে!

হাওড়া জুটমিলেও সেদিন তাই হচ্ছিল। চণ্ডীবাবু সাজঘরে বসে বসে ডাবা হুঁকো খেলে হবে কি, মন আর কান পড়ে ছিল আসরে। জুট-মিলের বাবুরা মোটা টাকা আগাম দিয়ে বায়না করেছিল। এখন যদি একটা হৈ-চৈ বাধে তো পাল চাপা দিয়ে দেবে সবাইকে। 'শ্রীমানী অপেরা'র বারোটা বেজে যাবে।

চণ্ডীবাবু তামাক খেতে খেতে বললেন, ফকরে, গোলমালটা একটু থেমেছে নাকি রে?

ফকির বললে, এখন তো দুর্লভরামের অ্যাক্টো হচ্ছে, এখন তো চেঁচাবে না কেউ—চেঁচাবে এর পরে—

কর্তামশাই চেয়ারের ওপর চুপ করে বসেছিলেন। এমন জায়গায় জীবনে কখনও আসেন নি আগে। ছোটবেলায় তিনিই

কতবার যাত্রা দেখেছেন। তাঁরই বাড়িতে কতবার 'নল-দময়ন্তী'র পালা হয়েছে। 'হরিশ্চন্দ্র' পালা হয়েছে। 'বিজয়-বসন্ত' পালা হয়েছে। কেষ্টগঞ্জের লোক ভিড় করে এসেছে তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে। এখন এসব কথা বলার জায়গা এটা নয়।

চণ্ডীবাবু বললেন, ফরিদপুরের কেষ্টগঞ্জে সেবার খুব নলেন গুড় খাইয়েছিল আমাদের, বুঝলেন মশাই! ওঃ, গুড় খেয়ে-খেয়ে দলের লোকদের তো একেবারে পেট ছেড়ে দিলে। আহা কি গুড়, আমরা কলকাতার লোক সে-রকম গুড় চোখেও দেখতে পাই নে—আপনাদের ওখানে গুড় কেমন?

ফকির বললে, না কত্তা, পেট তো গুড় খেয়ে ছাড়ে নি, পেট ছাড়ল ছোলার ডাল খেয়ে···

—তুই থাম তো ফকরে, তুই বেটা পেটুকের সর্দার, হ্যাংলার মত যা পাবি কেবল তাই খাবি। কলকেয় ঠিকরে দিয়েছিস?

—দিয়েছি কত্তা, ঠিকরে না দিলে তামাক সাজা হয়?

—তাহলে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না কেন? টেনে-টেনে আমার গাল তেবড়ে গেল যে!

কর্তামশাই আর থাকতে পারলেন না।

বললেন, দেখুন, আমি অনেকক্ষণ বসে আছি, সত্য মালো বোধহয় নেই আসরে—

—সে কি কথা!

চণ্ডীবাবুর যেন আঁতে ঘা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ঠিক শুনেছেন আপনার লোক এই কলে কাজ করে?

কর্তামশাই বললেন, আজ্ঞে, আমি তো সেই রকমই জানি, বসন্ত মালোকেই আমি চিনতাম, আমারই প্রজা ছিল সে, তার ছেলে সত্য মালো, সেই সত্য মালোর ছেলে এখানে কাজ করে শুনেছি—জরুরী কাজ না থাকলে আমি এই বুড়ো বয়েসে মরতে মরতে এখানে আসি

—আমার কাজ নয়, দায়। প্রাণের দায়ে এসে পড়েছি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে—

বলতে বলতে কর্তামশাই যেন একটু দম নিলেন।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, সেই সকাল বেলার ট্রেনে চেপেছি, বিকেল বেলা নেমেছি শেয়ালদা স্টেশনে, এমন জায়গায় জীবনে কখনও আসি নি, আসবার প্রয়োজন হয় নি আমার কখনও। আপনারা এই যাত্রার কথা বলছেন, আমি শুনছি বসে বসে, এই যাত্রা আমি আমার বাড়ির উঠোনে একদিন দিয়েছি, জানেন! হাজার-হাজার লোক এসে একদিন আমার দেউড়ির উঠোনে বসে যাত্রা শুনে গেছে—যাক-গে সে-সব দুঃখের কথা, আমি উঠি এখন, রাত্তিরের ট্রেনে আবার ফিরে যেতে হবে আমাকে—

চণ্ডীবাবু বললেন, তা, এত রাত্তিরে ফিরবেন কি করে?

—তা, ফিরতে পারি আর না-পারি ইস্টিশানেই পড়ে থাকব—থাকবার জায়গা তো আর নেই!

—তারপর?

—তারপর মাথার ওপর ভগবান আছেন।

চণ্ডীবাবু যেন এতক্ষণে একটু সচেতন হলেন। বৃদ্ধ লোক। চেহারা দেখে বুঝলেন বড় বংশের লোক। বললেন, তা, সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসতে হয়। এ কলকাতা শহর! আপনি বৃদ্ধ মানুষ। আমার দেখুন না, এই বাহান্ন বছর বয়েস হল, আর তেমন তেজ নেই, এই আমিই একদিন···

তারপর কথার মধ্যেই হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল।

—এই নিকুঞ্জ হারামজাদা, ঘুমোচ্ছিস যে, ঘণ্টা দিলি নে? এক অঙ্ক হয়ে গেল, হুঁশ নেই? মেরে তোর তবলা খিঁচে দেব না!

নিকুঞ্জ একটু একটু নেশা করে তা জানা ছিল চণ্ডীবাবুর। গালাগালি খেয়ে তাড়াতাড়ি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পেটা-ঘড়িটা

ঢং করে বাজিয়ে দিয়েছে নিকুঞ্জ। ওই ঘণ্টা শুনেই আসরে বাজনদাররা কনসার্ট শুরু করবে। বাজনা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভরাম আর বঙ্কু এসে হাজির। ঘেমে নেয়ে উঠেছে দুজনেই। বঙ্কু শাড়িটা পা থেকে তুলে খ্যাশ খ্যাশ করে চুলকোতে লাগল।

—বাপ রে বাপ, এইসা মশা হয়েছে, পা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে মাইরি।

কর্তামশাই তখন হাতের পোঁটলাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। ঘরে তখন আর দাঁড়াবার জায়গাও নেই। সখীর দলের ছোকরারা, রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র সবাই ঢুকে পড়েছে ঘরটাতে। চণ্ডীবাবু তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

তবু তারই মধ্যে কর্তামশাই ভদ্রতা করে বললেন, আচ্ছা আমি আসি তাহলে—

বলে চলেই যাচ্ছিলেন দরজার বাইরে। হঠাৎ কে যেন এসেই বললে, এই যে ইনি—ইনিই ডাকছিলেন—

কর্তামশাই চেয়ে দেখলেন লোকটার দিকে। চিনতে পারার কথা নয়, চিনতে পারলেনও না। শুধু বললেন, তোমার নাম···তুমি সত্য মালোর ছেলে?

ছেলেটা কিছু বুঝতে পারলে না। পরনে লম্বা কালো প্যাণ্ট, গায়ে কামিজ, ওল্টানো চুল।

ছেলেটা বললে—আপনি কে?

—আমি কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য, কেষ্টগঞ্জের কর্তামশাই—

এক নিমেষে যেন ম্যাজিক হয়ে গেল। ছেলেটি নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—আমার বাবা আসরে বসে আছে, আমি ডেকে আনছি গিয়ে—

তারপর সেই অচেনা জায়গা, সেই ভিড়, সেই পরিশ্রম, সেই সারাদিনের অনাহার সব মিলে যেন কর্তামশাই-এর মনে হল তিনি

সেখানেই পড়ে যাবেন। সমতল মাটির ওপর পা দুটো রেখে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও যেন তাঁর লোপ পেয়েছে। তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তারপর আর তাঁর কিছুই খেয়াল নেই। তাঁর চোখের ওপরই সমস্ত একাকার হয়ে গেল। শুধু মনে আছে তাঁর যেন খুব জল-তেষ্টা পেয়েছিল। জল, একফোঁটা

মিনিস্টার কবে চলে গেছে। মিনিস্টার আসার খবরটা পুরনো হয়ে গেছে কেষ্টগঞ্জের মানুষের কাছে। কেষ্টগঞ্জের ইছামতীর ঘাটে তারপর পাটের ব্যাপারীরা এক ক্ষেপ মাল নামিয়ে আবার খালি নৌকো নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে আবার মজুরদের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেদিকে গেলে আর চেনা যায় না। সদানন্দ না থাক, কাজ বন্ধ হয়ে থাকে নি তা বলে, ইঁটের পাঁজা থেকে সার সার মজুরের দল মাথায় করে ইঁট বয়ে এনে গাঁথুনি শুরু করে দিয়েছে। সুগার-মিল হবে এ-খবরটা রটে গেছে। আর ক'দিন সবুর কর তখন এখানেই আবার গম গম করে কল চলবে। গাঁয়ের লোকজন চাকরি পাবে।

মুকুন্দ বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে সা'মশাই, আপনিই বলেছিলেন—

দেখা হলে আগে অনেক কথা বলত দুলাল সা'। একটা কথার সূত্র পেলে সেই কথা থেকেই হরির কথা আসত। কিন্তু সেই মানুষও যেন কেমন হয়ে গেছে।

বলে—না রে মুকুন্দ, কারোর মন্দ দেখে হাসতে নেই রে, ওটা পাপ।

মুকুন্দ বলে—পাপ-পুণ্যের কথা তো জানি নে সা' মশাই, যা দু'চোখ্যে দেখছি তাই বলছি—

—তা হোক, তবু দেখলেও বলতে নেই, ওতে পাপ হয়—এই দেখ না, সদানন্দ মিছিমিছি ক'টা দিন হাসপাতালে পড়ে পড়ে ভুগল, তার জন্যেও আমার ভোগান্তি আর নিবারণটা দোষ করে ভুগল তার জন্যেও আমার ভোগান্তি! আমার দু'নো খরচ—

মুকুন্দ বলে, তা আপনি কেন সরকারমশাই-এর জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করতে গেলেন সা' মশাই?

এ কথার উত্তর দুলাল সা' দেয় না। শুধু বলে—হরির কাছে ও সদানন্দও যা আর ওই বদমাইশ নিবারণটাও তাই—আমার কাছে দু'জনেই সমান, দু'জনেই হরির জীব—

বলে দুলাল সা' ভিজে কাপড়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। এমনিতে দুলাল মুখে যা বলে, সে যে কাজেও তাই করে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। কর্তামশাই বাড়িতে নেই বলে কি দুলাল সা'ও মরে গেছে? যারা সুদ দিতে আসে তাদের বলে—শীগ্‌গির কর গো মোড়ল, তোমার টাকার জন্যে আমার বসে থাকার সময় নেই, আমাকে আবার নিবারণকে দেখতে যেতে হবে—

নিতাই বসাক যেমন সুগার-মিলের তদারকি নিয়ে ব্যস্ত—এঞ্জিনীয়ার, স্পেশালিস্ট, এক্সপার্ট, পারমিট এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, দুলাল সা' নিবারণকে নিয়ে তেমনি ব্যস্ত।

দুলাল সা' বলে—আমার সুগার-মিল হোক্ আর না হোক্, নিবারণ ভাল হলেই বাঁচি—আহা—

সকাল বেলা জপ্‌তপ্ আহ্নিক সেরে উঠেই দুলাল সা' তৈরি হয়ে নেয়।

নতুন-বৌ তৈরি থাকে। তারপর গাড়িতে উঠে সোজা একেবারে ভটচায্যিবাড়িতে। কীর্তীশ্বর ভটচায্যির সদরের দেউড়িতে নেমে নতুন-বৌকে নিয়ে দুলাল সা' ভেতরে গিয়ে একেবারে নিবারণের তক্তপোশের ওপরে গিয়ে বসে পড়ে। জিজ্ঞেস করে—কেমন আছ আজ নিবারণ ?

এমনি রোজ। এবেলা-ওবেলা।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে নতুন-বৌ ডাকে, জ্যাঠাইমা—

বড়গিন্নী বড় মুষড়ে পড়েছে। কর্তামশাই সেই যে একদিন ভোরবেলা কলকাতায় যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন তারপর থেকে তাঁর আর কোনও সংবাদ নেই। নতুন-বৌই দু'বেলা এসে খাইয়ে যায়। সান্ত্বনা দেয়। অভয় দেয়। বলে—আপনি না খেলে কিন্তু আমিও খাব না আজকে, আমিও উঠছি না এখান থেকে, এই বলে রাখলাম—

নেহাৎ ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার নইলে নতুন-বৌ নিজের হাতে রান্না করেও দিয়ে যেত।

নতুন-বৌ বলে, আমারও তো মা নেই জ্যাঠাইমা, আমাকে না হয় আপনার মেয়ে বলেই মনে করুন—

কখনও ওষুধ আনে হাতে করে। কখনও ক্ষেতের তরি-তরকারি, বাগানের ফল-ফুলুরি। দুলাল সা'ই বলে দিয়েছে। বড় মানী বংশ। যখন কিছু ছিল না আমার, যখন খেতে পেতাম না, তখন এই কর্তামশাই-এর কৃপাতেই আমি বেঁচে ছিলাম নতুন-বৌ। সেই সব পুরনো কাহিনী স্মরণ করে নতুন-বৌ যেন এ বাড়ির একজন হয়ে ওঠে।

ওদিকে নিবারণের কাছে বসে দুলাল সা' বলে, ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়. ওই একটা তুচ্ছ বাঁওড় নিয়ে তুমি জীবন খোয়াতে গিয়েছিলে নিবারণ, তোমাকেও ধিক্ ! বলি, সম্পত্তি আগে না জীবন আগে ?

জীবন গেলে সম্পত্তি কে খাবে শুনি ? তুমি না তোমার কর্তামশাই ? না তোমার কর্তামশাই-এর ছেলে ? তা সে সিদ্ধেশ্বরও তো নিরুদ্দেশ। কার জন্যে এত হেনস্থা শুনি ?

প্রশ্নগুলো একাই করে দুলাল সা' আবার একাই উত্তর দেয়।

বলে—কেউ না, বুঝলে নিবারণ, কেউ না। তা যদি হত তো আমিও কর্তামশাই-এর মত দিনরাত সম্পত্তি-সম্পত্তি করেই কাটিয়ে দিতাম ! আরে দুত্তোর সম্পত্তির নিকুচি করেছে। সম্পত্তির মাথায় মারি ঝ্যাঁটা। সম্পত্তি হলেই যদি স্বর্গলাভ হত তো আমি দিনরাত হরিনাম করব এমন বেকুব নই—

প্রথম প্রথম দুলাল সা' বলত—কিছু একটা মতলবে গেছেন বই কি ! নইলে শুধু শুধু কি আর তিনি এতদিন কলকাতায় পড়ে আছেন—

নিবারণ বলত, কিন্তু একটা চিঠিও দিলেন না পেঁৗছান-সংবাদ দিয়ে—

দুলাল সা' বলত—কাজে-কর্মে ব্যস্ত আছেন আর কি—

নিবারণ বলত—এমন কি কাজ তাও তো জানি না—

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। আর ঘটনাটা ঘটল দুলাল সা' আর নতুন-বৌ-এর চোখের সামনেই।

সেদিন পোস্টাপিসের পিওন এসে সরকারী একটা চিঠি দিয়ে গেল। গাঁয়ের পিওন। দুলাল সা'কে দেখে প্রণাম করলে।

—কি গোপাল, ভাল আছিস বাবা ? বাড়ির সব ভাল ?

—আজ্ঞে সরকারমশাই-এর একখানা চিঠি আছে—

সরকারমশাই শুয়ে ছিল। অবাক হয়ে উঠে বসল। তাকে আবার কে চিঠি লিখবে ! দুলাল সা'ও অবাক হল। নতুন-বৌও বুঝতে পারলে না কে চিঠি লিখলে। দরজার আড়ালে বড়গিন্নীও দাঁড়িয়ে ছিল।

নিবারণ চিঠিটা হাতে নিয়েই বললে—কর্তামশাই লিখেছেন, কলকাতা থেকে—

নিবারণ শুনিয়ে শুনিয়েই পড়তে লাগল। কর্তামশাই লিখেছেন—

সদা স্বুখাভিলাষ প্রসাদ প্রণত ভবইব আশীর্বাদকে শ্রীকীর্তীশ্বর দেবশর্মণঃ পরম শুভাশীষাং রাসয়সন্তু পরম তোমার সুখ স্বচ্ছন্দে সানন্দ বিশেষঃ। অত্র পত্রে বিশেষ সুসংবাদ জ্ঞাত করাইতেছি। শ্রীশ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহে কল্যাণীয়া হরতনকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।···

আর পড়তে পারলে না নিবারণ। গলাটা যেন বুঁজে এল তার। হরতনকে পাওয়া গেছে! চোখ ছুটো হঠাৎ যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এল। যেন বিশ্বাস হল না। নিজের মনেই আবার বার ছুই লাইনটা পড়লে নিবারণ।

ছুলাল সা' বলে উঠল—হরি হরি, হরিই ভরসা, হরিই ভরসা—

নতুন-বৌ-এর মুখেও কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

নিবারণ হঠাৎ বলে উঠল—কর্তামা, কর্তামশাই হরতনকে সঙ্গে নিয়ে পরশুদিন আসছেন···

যেন এক মুহূর্তেই নিবারণের সব অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছে। যেন কি করবে বুঝতে পারছে না সে। সেই তক্তপোশের ওপর বসে বসেই ডাকলে—কর্তামা, কর্তামা—

বড়গিন্নী দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিল। নির্বাক নিথর নিস্পন্দের মত। মনে হল তার পায়ের তলাতেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে। বড়গিন্নীর মুখে কোনও দিনই কথা ফোটে না। আজ যেন তা সম্পূর্ণ মূক হয়ে গেছে। অন্তর্যামীর উদ্দেশে ছু'হাত জোড় করে প্রণাম করবার ক্ষমতাটুকুও যেন তার লোপ পেয়ে গেছে।

সামান্য একটা চিঠি। কিন্তু সেই সামান্য একখানা চিঠিই যেন কেষ্টগঞ্জের সমস্ত হাওয়াটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। চিঠির সারাংশ কেউ খবরের কাগজে বড় বড় হেড-লাইন দিয়ে ঘোষণাও করে নি। কেউ এসে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে সভা-সমিতিও করে নি। নিতান্তই একটা পাঁচ নয়া পয়সার পোস্টকার্ডে চেনা কয়েকটি ছত্র। সেই চিঠিখানাই কেষ্টগঞ্জ তোলপাড় করে তুলল।

দুলাল সা' যখন প্রাতঃস্নানে যায়, তখন ঘাটে লোকজন না থাকারই কথা। কিন্তু যদি কেউ থাকে তো দুলাল সা'কেও তার জবাবদিহি করতে হয়।

দুলাল সা' বলে—দূর আহাম্মক, ভক্তি কি আর সোজা? ভক্তি যদি একবার হল তো ব্যস্, তখন আর তোকে পায় কে? তখন তুই ভবার্ণব তরে গেলি—তখন আর তোর কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।

মুকুন্দর সঙ্গেই সচরাচর দেখাটা হয় দুলাল সা'র।

মুকুন্দ সংসারের মানুষ। সংসারের ভয়-ভাবনা-সন্দেহ নিয়েই বিব্রত। সে বলে—কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না সা' মশাই।

—কেন? তোর বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

—আজ্ঞে, এটা তো আর সত্যযুগ নয়। সত্যযুগ হলে না হয় বুঝতাম! এ্যাদ্দিনের হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে কি আর পাওয়া যায়? আর জানা নেই, শোনা নেই, কলকাতায় গেলাম আর পেয়ে গেলাম! এ যুগে কি আর অঘটন ঘটে? আপনিই বলুন?

দুলাল সা' মৃদু মৃদু হাসে। মুকুন্দর মত মূঢ় মানুষদের কথায় হাসি ছাড়া আর কিই-বা তার করবার আছে ?

—অঘটন ঘটে না ? তুই বলছিস ?

—আজ্ঞে, সে-সব ঘটত অবতার মহাপুরুষদের আমলে। তাঁরা ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ।

—তা হ্যাঁ রে, আমাকে দেখেও তোর বিশ্বাস হয় না। এই যে আমি ! যে-আমি তোর চোখের সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে চোখের সামনে দেখেও তোর এত অবিশ্বাস ?

শুধু মুকুন্দ নয়। সকলকে ওই একই কথা বলে দুলাল সা'। যারা তেজারতি কারবারের সূত্রে আসে তার কাছারিতে তারা নির্বোধ, নিরক্ষর মানুষ সব। অভাবের দায়ে পড়ে আসে। তাদেরও বলে।

বলে—এখন হরি আছে কি না বিশ্বাস হল তো ? আমি যখন হরি-হরি বলতাম তখন তোরা হাসতিস, বলতিস সা' মশাই ভেক নিয়েছে—তা এখন ?

তারপর আবার মালা জপতে জপতে বলে—ওই কর্তামশাই, ওই কর্তামশাইকে আমি নিজে গিয়ে বললাম হরিসভা করব, এতে আপনি প্রেসিডেণ্ট হোন্। কিছুতেই হবেন না। কর্তামশাই বলেন—আমি কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বংশধর, আমার পূর্বপুরুষ গৌড়েশ্বরের রাজ-পুরোহিত ছিলেন, হাতীর পিঠে চড়ে রাজ-বাড়িতে যেতেন, একশো-আটটা পদ্মফুলে রোজ দেব-বিগ্রহের পুজো হত, তুমি আমাকে হরিভক্তি শেখাচ্ছ দুলাল ?

শ্রোতারা বলে—তারপর ?

দুলাল সা' বলে—আমি তো হরির তেমনি ভক্ত। হরির নাম করে কর্তামশাই-এর পায়ে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম—হরিভক্তির জন্যে আমি সব করতে পারি কর্তামশাই, আপনি প্রেসিডেণ্ট না

হলে বুঝব আমার হরিভক্তিই মিথ্যে। বুঝব, হরির নাম করে আমি পয়সা লুটছি।

—তারপর? কর্তামশাই রাজী হলেন?

—আরে তবে আর বলি কি? হরিভক্তি কি আর অত সোজা জিনিস হে? বাইরে হরি হরি আর ভেতরে পুকুর চুরি! তেমন হরিভক্ত আমাকে পাও নি। আমি বললাম—আমি যদি তেমন হরিভক্ত হই তো আমি ছত্রিশ জন্ম রৌরব নরকে পচব। সাত জন্মও নয় চোদ্দ জন্মও নয়—এই তোদের বলে রাখলাম।—এ কিরে? দে, আর তিনটে নয়া পয়সা দে, তিনটে নয়া পয়সা আবার কম দিলি কেন নিতাই?

নিতাই বললে—আজ্ঞে, যা এনেছিলাম তাই দিলাম, আর নেই আমার কাছে—

—ওই ছ্যাখ, তুই কাকে কম দিচ্ছিস রে? আমাকে না হরিকে? আমার মধ্যে যেমন হরি আছে তেমনি তোর মধ্যেও তো···এস নিবারণ, এস এস—তুমি আবার এই শরীর নিয়ে—

সবাই চেয়ে দেখলে কর্তামশাই-এর সরকার এসেছে। শরীর দুর্বল। হাঁফাচ্ছে। এই মানুষটাকে নিয়ে এত দিন এত কাণ্ড হয়েছে। এই মানুষটাই দুদিন আগে মরো-মরো হয়ে পড়েছিল। তা সবাই জানে। তাকে হঠাৎ সশরীরে আসতে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল সবাই। সবাই সরে বসে জায়গা করে দিলে।

—আজ্ঞে, কর্তামশাই-এর আর একখানা চিঠি এসেছে।

—তা আমাকে খবর দিলেই পারতে। আমি নিজে যেতাম। ছ্যাখো দিকিনি কাণ্ড! এত ওষুধ-ডাক্তার করা হচ্ছে আর তুমি কিনা তার ওপর অত্যাচার করছ! ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করে এসেছ?

—আজ্ঞে বড় জরুরী ব্যাপার বলেই এলাম। আর তো কেউ নেই।

তারপর চারদিকে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে নিবারণ বললে—বড় দায়ে পড়ে আপনার কাছে এসেছি সা'মশাই, কর্তামশাই আপনার কাছেই আসতে লিখেছেন। কিছু টাকার দরকার ছিল। এই শতখানেক হলেই চলবে। বড় বিপদ হয়েছে তাঁর।

—আবার কি বিপদ? হরি—হরি—

—আজ্ঞে হরতনের বড় অসুখ! অসুখ অবস্থায় নিয়ে আসছেন। সঙ্গে এক ডাক্তারকেও নিয়ে আসছেন। আর অসুখ রুগীকে নিয়ে তো থার্ড ক্লাসে আসতে পারবেন না—অনেক খরচ আছে। হাতে যে ক'টা টাকা ছিল, এ ক'দিনে কলকাতা শহরে তাও খরচ হয়ে গেছে—তাই আপনার কাছে কিছু কর্জ করতে লিখেছেন—সুদ যা লাগে তা দেব—

দুলাল সা' রেগে উঠল।

—তুমি কি আমাকে চামার চশমখোর পেয়েছ? আমি কি মিছিমিছি হরিসেবা করছি। তুমি ভেবেছ কি নিবারণ? আমি লোকের বিপদে-আপদে টাকা ধার দিই বলে তেজারতি ব্যবসা করি? আমি সুদখোর?

নিবারণ একে অসুস্থ, তার ওপর হঠাৎ দুলাল সা'র এই ব্যবহারে থরথর করে কেঁপে উঠল।

দুলাল সা' ডাকলে—কান্ত—

কান্ত বললে—আজ্ঞে—

—এই নিবারণকে শ' দুয়েক টাকা দাও তো। দাও—

কান্ত ক্যাশ-বাক্স থেকে নোট বার করতে লাগল।

দুলাল সা' বললে—তাহলে তোমার অসুখে আমি যত টাকা খরচ করেছি সব হিসেব-নিকেশ করে এখুনি আমার সামনে ফেলে দাও তো! দাও। তুমি সুদের কথা কোন মুখে বলতে পারলে নিবারণ? তুমি না বিচক্ষণ মানুষ, তুমি না বিবেচক মানুষ। তোমার

মুখে এই কথা! অন্য কেউ হলে আমি এতক্ষণে কেটে ফেলতাম না। যাও, টাকা নিয়ে সোজা এখান থেকে চলে যাও, সই-সাবুদ-হাতচিটে কিচ্ছু তোমায় করতে দেব না। আর কর্তামশাইকে লিখে দিও যে, তুলাল সা' অর্থপিশাচ হলে আর গুরুর কাছে দীক্ষা নিত না, হরিসভা করত না, ভোর-রাত্তিরে উঠে নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে ঘাট ধুয়ে প্রাতঃস্নান করত না, লিখে দিও তুলাল সা' লোকের অভাবের সময় টাকা ধার দেয় বটে কিন্তু তেজারত্তি কারবার করে না। যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন—যাও—

তুলাল সা'র মারমূর্তি দেখে আর দাঁড়াবার সাহস হল না নিবারণের। নিবারণ ঠিক এমন হবে ভাবে নি। তুলাল সা'র এমন দয়াও কখনও দেখে নি, এমন মারমূর্তিও কখনও দেখে নি আগে। বিনা সুদে, বিনা বন্ধকীতে কখনও টাকা দেওয়ার লোক নয় তুলাল সা'। কেমন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল নিবারণ। তারপর তু'শো টাকা নিয়ে সোজা উঠে পড়ল। আর তারপর গুটি গুটি পায়ে সদর দরজা পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়ল।

তুলাল তখন একমনে মালা জপতে জপতে একবার মুখ তুলল।

বললে—দেখলি তো তোরা? আমাকে বলে কিনা সুদখোর···

তারপর নিতাইয়ের দিকে ফিরে বলে—কই রে, আর তিনটে নয়া পয়সা দে, তিনটে নয়া পয়সা ঠকিয়ে তুই কি হরির কাছে পাতক হয়ে থাকবি নাকি রে? না না, সে আমি হতে দেব না—দে, দিয়ে দে বাবা, তোর পরকালে ভাল হবে, দে—

পরকাল থাকুক আর না থাকুক, পরকালের কথা বলা ভাল, ওতে মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি বাড়ে। সমস্ত কেষ্টগঞ্জের লোক যারা তুলাল সা'কে চেনে জানে, যারা তুলাল সা'র ধাপে ধাপে উন্নতি হওয়া দেখেছে, আর কর্তামশাই-এর অবনতি হওয়াও দেখেছে, তারা পরকাল বিশ্বাস করে। আর পরকাল বিশ্বাস করে বলেই

দুলাল সা'র কাছে আসে, দুলাল সা'র মুখের কথা শোনে, দুলাল সা'র কাছে টাকা কর্জ করে যথারীতি সুদ দিয়ে যায়। ইহকালে তারা যা পেলে না তাদের পরকালই ভরসা, তাই দুলাল সা'কেই তারা মূর্তিমান পরকাল বলে ধরে নিয়েছে। দুলাল সা'র এই ঐশ্বর্য, এই বাড়ি, এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এই পাটের ব্যবসা, এই সুগার-মিল, সবই যেন পরকালের ফল। গত জন্মে দুলাল সা' পুণ্য করেছিল, তারই ফল ভোগ করছে ইহকালে। ইহকালের পুণ্যের হিসেবটাও চিত্রগুপ্তের খাতায় নিখুঁত ভাবে লেখা থাকবে। তার ফল ভোগ করবে পরকালে।

একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ।

আর কর্তামশাই?

কর্তামশাই-এর ইহকাল বলে কিছুই ছিল না। হঠাৎ নিরুদ্দেশ নাতনীর সংবাদটা কেষ্টগঞ্জময় ছড়িয়ে যাওয়াতে যেন সব হিসেব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে? তাহলে কি সত্যি সত্যি আবার ভটচায্যি-বাড়িতে লক্ষ্মী ফিরে আসবে? আবার ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে ভটচায্যি-বাড়ি? ব্যাপারটা কেমন জটিল হয়ে উঠতে লাগল সকলের চোখে। তাহলে কি হবে?

দুলাল সা' বলে—গুরুর কথা তো মিথ্যে হবে না—ও হতেই হবে—

সুকান্তও খবরটা শুনেছিল। তাহলে তো তাকেও যা বলেছে সাধু তা মিলে যাবে। জীপ-গাড়ি নিয়ে ক'দিন আসা-যাওয়া করলে। কিন্তু নিতাই বসাক নেই। আসলে তার মুরুব্বি দুলাল সা' নয়—নিতাই বসাক। রোজই সন্ধ্যেবেলা গাড়ি নিয়ে বেরোয়। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে খোঁজ নেয়। রোজই শোনে এখনও ফেরে নি। সাহেব মানুষ। সহজে সাধু-সন্নিসীর ওপর বিশ্বাস নেই, এমনিতে কিছুই বিশ্বাস করে না। জগৎটাকেই একমাত্র ধ্রুব বলে মনে করে। আর সব ঝুটো, আর সব ফাঁকিবাজি। সাধু তাকে

বলেছিল বটে যে, জীবনে শিগ্‌গিরই তার উন্নতি হবে। আর বছর-তিনেকের মধ্যেই। কথাটা শুনে আনন্দ হয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি। এবার লোকের মুখে কর্তামশাই-এর খবরটা শুনে কেমন টনক নড়ে উঠল। লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করে—খবরটা সত্যি নাকি ?

সবাই বলে—শুনছি তো সত্যি—

যাকেই জিজ্ঞেস করেছে সে-ই ওই কথা বলেছে। সেদিন কর্তামশাই-এর বাড়ির সামনে দিয়েই জীপ-গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বললে ড্রাইভারকে। সেই ভুতুড়ে বাড়ি। এদিকটায় লোক চলাচল করে কম। এদিকটা যেন কেমন পোড়ো-পোড়ো ভাব। সন্ধ্যের পর এদিকটায় এলে কেমন যেন গা-ছম্‌ছম্‌ করে। তবু সেদিন এল সুকান্ত। সত্যি খবরটা একমাত্র নিবারণের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে পাবার উপায় নেই।

গাড়িটা রেখে কালকাসুন্দি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটাত হাঁটতে সদর-দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে কে আছে-না-আছে তাও জানা নেই।

দরজার সামনে গিয়ে একেবারে নীচু গলায় ডাকলে—সরকার মশাই—

নিবারণকে সুকান্ত দেখেছে একবার কি বড় জোর দু'বার। তার বেশি নয়। কিন্তু পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে নিবারণের নাম অনেকবার কানে এসেছে। কেউ বলত নিবারণ লাঠিয়াল নিয়ে দাঙ্গা করতে গিয়েছিল, আবার কেউ বলে সদানন্দ। সদানন্দ অকারণে নিবারণকে মেরেছে। কিন্তু তারও একদিন ফয়সালা হয়ে গেছে। মিনিস্টার আসার পর থেকেই সবাই জেনে গেছে যে, নিবারণই আসল আসামী।

—সরকার মশাই আছেন ?

তবু কারো সাড়া নেই।

সুকান্ত এবার দরজার কড়া নাড়তে লাগল খটাখট্ শব্দ করে।

—কে ?

ভেতর থেকে মেয়েমানুষের গলা পেয়ে একটু পেছিয়ে এল সুকান্ত।

আর তার পরেই দরজার হুড়কোটা খুলে গেল।

—আপনি কে ?

একটা হারিকেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সোজাসুজি আলোটা এসে পড়তেই চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তার পরেই চেনা গেল।

—কাকে চাই আপনার ?

সুকান্ত ভাবে নি এমন হবে। তাহলে এমন অসময়ে এ বাড়িতে আসত না। কেমন করে কল্পনা করবে নতুন বৌ এমন সময়ে এ-বাড়িতে আসবে ?

—কাকে খুঁজছেন আপনি ?

সুকান্ত বললে—আমি নিবারণবাবুকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—কিন্তু আপনি কে ?

সুকান্ত বললে—আমার নাম সুকান্ত রায়, আমি এখানকার বি-ডি-ও, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, আপনাদের বাড়িতে আমাকে দেখেছেন নিশ্চয়ই—

নতুন-বৌ বললে—সে তো হল, কিন্তু এখানে আপনার কি দরকার ?

সুকান্ত এই নতুন-বৌ-এর মুখের জেরায় যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বললে—আমি নিবারণবাবুর সঙ্গে একবার একটা কথা বলতে এসেছিলাম—আর কিছু নয়—

—কি কথা ?

এর উত্তর কী দেবে সুকান্ত ? এর কোনও সদুত্তর আছে কি ?

সুকান্ত বললে—এমন কিছু নয়, এমনি জানতে এসেছিলাম···

—জানতে এসেছিলেন যে-খবরটা শুনেছেন সেটা সত্যি কি না ? এই তো ?

সুকান্ত এ-কথার কি উত্তর দেবে তা বুঝতে পারলে না।

নতুন-বৌ সুকান্তর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে লাগল—কিন্তু কেন বলুন তো ? আপনাদের এত আগ্রহ কেন ? আপনারা কি একটা পরিবারের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তামাশা করতে চান ? আপনাদের কি আর কোনও করবার মত কাজ নেই ? পরের দারিদ্র্যটা কি আপনাদের কাছে এতই হাসির খোরাক ? আপনারা ভেবেছেন কি ?

সুকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা প্রায় নিমিত্তহীন কৌতূহল দমন না করতে পারার পরিণাম এমন হবে ভাবতে পারে নি।

—একটার পর একটা লোক কেবল আসছে আর ওই একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে। একদিন আপনারাই গিয়ে ভিড় করেছেন আমার শ্বশুর বাড়িতে, আর আজকে আবার আপনারা এখানে ভিড় করছেন। আপনাদের কি এই-ই কাজ ? যখন যেদিকে হাওয়া বইবে সেই দিকেই তালি দেবেন ? ছিঃ—

নতুন-বৌ-এর ছিঃ শব্দটা যেন সমস্ত কেষ্টগঞ্জের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সুকান্তর মনে হল, নতুন-বৌ যেন একলা তাকে লক্ষ্য করেই ধিক্কার-ধ্বনিটা প্রয়োগ করলে।

সুকান্ত আত্মদোষ-স্খালনের চেষ্টায় বিনীত হয়ে বলতে গেল—দেখুন···আমি ঠিক সে-জন্যে···

কিন্তু কথা তার শেষ হবার আগেই মাঝ-পথে বাধা দিলে নতুন-বৌ।

বললে—অশিক্ষিত চাষা-ভূষোরা আসে, তাদের আসার মানে বুঝি, কিন্তু আপনারা না শিক্ষিত বলে বড়াই করেন? আপনারা না কোর্ট-প্যাণ্ট পরে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ান—

সুকান্ত অন্য কিছু উপায় না পেয়ে বললে—আমায় আপনি মাপ করবেন—

—মাপ করার প্রশ্ন নয়! অনেকবার অনেক লোকের কথার জবাব দিতে দিতে আমিও অধৈর্য হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমি ভাবছি, এ ক'দিন কি গ্রামের লোকের আর কিছু করবার মত কাজ নেই? আবার দাঁড়িয়ে দেখছেন কী, যান—

সুকান্ত তখন নিজেও পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পেছন ফিরতেই একটা গাড়ির হেড-লাইট তার চোখের ওপর এসে পড়ল। এ-গাড়ি সুকান্তর চেনা। গাড়িটা কালকাসুন্দির বন মাড়িয়ে একেবারে দেউড়ির সামনে এসে ব্রেক কষল। আর গাড়ির ভেতর থেকে নামল দুলাল সা'। দুলাল সা'র হাতে সেই জপের মালা। মালা জপতে জপতেই এসেছে এখানে। সিঁড়ির সামনে অন্ধকারে সুকান্তকে যেন চিনতে পারলে না। ঠাহর করে দেখতে লাগল।

—কে? আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না!

সুকান্ত নমস্কার করেছিল দুই হাত জোড় করে। সেটা দেখতে পায় নি।

সুকান্ত নিজেই নিজের পরিচয় দিল—আমি সুকান্ত, সা' মশাই—

—কে সুকান্ত?

—সুকান্ত রায়, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার।

দুলাল সা' বললে—ও সুকান্ত, তাই বল! ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। এস, ভেতরে এস, তোমাকে বলি—

বলে দুলাল সা' ঘরের ভেতরে ঢুকল। নতুন-বৌ পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। সুকান্ত তাকে পাশ কাটিয়ে দুলাল সা'র পেছনে পেছনে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দুলাল সা' একটা চেয়ারের ওপর বসে বললে—নতুন-বৌ, তুমিও শোন,—

সুকান্ত যেন অস্বস্তি বোধ করছিল কেমন। একবার নতুন-বৌ-এর দিকে তাকালে। সে-মুখেও যেন বিরক্তির ভাব। তবু কিছু না বলে সে আস্তে আস্তে বসল।

দুলাল সা' বললে—আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। সদানন্দ নেই—

নতুন-বৌও অবাক হয়ে গেল।

—সদানন্দ নেই মানে? কোথায় গেল বাবা?

সুকান্তও শুনছিল। বললে—কোন্ সদানন্দ?

দুলাল সা' বললে—আমার সরকার আর কি। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের মাঠের কাজ যখন হচ্ছিল, তখন সে-ই দেখা-শোনা করছিল। তাকে আমি মাইনে দিয়ে যাচ্ছিলাম বরাবর। আমার কাজ করবার জন্যই তো সে চোট খেয়েছিল তখন? কি বল, কাজ করতে-করতে যখন জখম হয়েছে, তখন মাইনে তো আমার দিয়ে যাওয়াই উচিত, না কি, তুমি কি বল?

সুকান্ত বললে—আজ্ঞে, আপনি ন্যায্য কাজই করেছেন, শুভানুধ্যায়ীর কাজই করেছেন—

দুলাল সা' বললে—আমি বাবা সকলেরই শুভানুধ্যায়ী! আমার কাছে বড়-ছোট পাবে না, উচ্চ-নীচ সবাই আমার কাছে সমান, সে তোমরা যা-ই বল আর তাই-ই বল, হরির কাছে তো ছোট-বড় উচ্চ-নীচ বিচার নেই।

নতুন-বৌ বললে—কিন্তু সে পালাল কেন বাবা?

দুলাল সা' বললে—এখন সেইটেই তোমরা বিবেচনা কর। কোনও কষ্ট নেই তার, কোনও কষ্ট তার আমি রাখি নি। হাসপাতাল আমি করে দিয়েছি, মানে আমিই কত টাকা চাঁদা দিয়েছি তা তো তুমি শুনেছ সুকান্ত। আমি নিজে গিয়ে রোজ দেখা করে এসেছি। তবু পালাল কেন? কিসের কষ্ট হচ্ছিল তোর যে তুই পালাতে গেলি?

সুকান্ত বললে—সেই যে পুলিস-কেস হচ্ছিল, সেই জন্যে?

—তা সে-জন্যে তো আমি ছিলুম, আমি আছিও, আমি তো খরচ যুগিয়ে যাচ্ছি বরাবর। আমিই তো বরাবর ডাব নিয়ে গেছি, নেবু নিয়ে গেছি, রোজ নিয়ম করে নতুন-বৌ খাবার পাঠিয়েছে হাসপাতালে, সে সব তো বাইরের লোক কিছু জানে না বাবা। বাইরের লোককে সে-সব জানাতেও চাইনি।

সুকান্ত বললে—তা পালিয়েছে তাতে আপনার কি?

নতুন-বৌও বললে—উনি তো ঠিকই বলেছেন বাবা, তাতে আমাদের কি ক্ষতি?

—তোমরা তো বলেই খালাস! কিন্তু লোকের মুখ তো তা বললে বন্ধ থাকবে না। তারা বলবে, আমিই বুঝি টাকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। যাতে পুলিসের হ্যাপাজতে না পড়ি। তাই খবরটা শুনে কান্তকে আমি বলেছিলাম, সংসারে উপকার করবার সময়ও ভেবে-চিন্তে করতে হয়। পুলিসের কী? পুলিসের সন্দেহ করাই তো পেশা!

সুকান্ত তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কিন্তু আসামী তো সদানন্দ নয়, আসামী তো হল নিবারণ, নিবারণ সরকার—

দুলাল বললে—সেইটেই বোঝ, যে আসামী সে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ফরিয়াদী কি না ভয়ে পালায়! এমন কথা তোমরা কেউ কখনও শুনেছ?

সুকান্ত বললে—সে যাক্‌গে, আপনি তার জন্যে যথাসাধ্য করেছেন, আপনি আর তার জন্যে ভাববেন না—

দুলাল সা' বললে—দেখ, এতকাল হরি হরি করে কোনও দিকেই তো নজর দিই নি, সব ছেড়ে দিয়ে হরিকেই মনে-প্রাণে ডেকেছি, এখন দেখছি মহা ভুল করেছি। সংসারের মানুষের মধ্যে যে এত গলদ তা তো জানতাম না—! এই দেখ না, খবরটা পেয়ে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল, ভাবলাম, দূর ছাই, কার জন্যেই বা এত করি? সংসারে কে কার? চক্ষু মুদলেই তো সব অন্ধকার। তবে আর ভাবি কেন? তখনই মনে পড়ল, বড়গিন্নীর কথাটা, বড়গিন্নীর অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই, নিবারণও গেছে কলকাতায় কর্তামশাই-এর কাছে, নতুন-বৌ না হয় গেছে বড়গিন্নীকে দেখতে—কিন্তু আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। কথাটা ভাবতেই আর থাকতে পারলাম না—তাই চলে এলাম। তা, বড়গিন্নী কেমন আছেন নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ বললে—ভাল, কিন্তু আপনি আবার কষ্ট করে কেন আসতে গেলেন?

—আমি আসব না তো কে আসবে মা? কর্তামশাই-এর কে আছে? কর্তামশাই না হয় আমাকে দেখতে পারেন না, বুড়ো বয়সে ও-রকম অভিমান তো হয়ই। কিন্তু আমি যদি তাই মনে রেখে বিপদের দিনে না আসি তো হরির কাছে আমি কি জবাবদিহি করব বল তো মা? কর্তামশাই তো মনে করেন আমিই লোক লাগিয়ে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় দখল করেছি, আমিই সদানন্দকে দিয়ে নিবারণকে লাঠিবাজি করিয়েছি, তা এর জবাব আমি হরির কাছে দেব, কিন্তু কারো বিপদ দেখলে যে চুপ করে বসে থাকতে পারি নে মা, এ যে আমার স্বভাব—এ-বয়সে কি আর এ-স্বভাব শুধরোবে?

এতক্ষণে সুকান্ত যেন সুযোগ পেলে।

বললে—তাহলে কথাটা যা রটেছে তা সত্যি সা'মশাই ?

—কোন্ কথাটা ?

—ওই যে কর্তামশাই-এর হারানো নাতনীকে নাকি পাওয়া গিয়েছে ? পনেরো বছর পরে ?

তুলাল সা' বললে—পাওয়া গিয়েছে কি যায় নি সে তো আর তু'দিন বাদেই জানতে পাবে সবাই। কর্তামশাই তো নাতনীকে নিয়ে আসছেন কেষ্টগঞ্জে, নিবারণ তো সেই জন্যেই গেছে অসুখ শরীর নিয়ে—আমিই তো তাকে তু'শো টাকা দিলাম সেই বাবদে, বললাম হাতচিটে বন্ধকী কিছুই তোমার লাগবে না, আমি তো সুদখোর নই—

—তাহলে কলিযুগে তো এমন ঘটনাও ঘটে ?

তুলাল সা' বললে—কলিযুগ তো তোমরাই বল বাবা, আমি বলি অন্য কথা।

—আপনি কি বলেন ?

—আমি বলি কলিযুগ সত্যযুগ ও-সব মিথ্যে কথা। যে সত্যবাদী তার কাছে সব যুগই সত্যযুগ। নইলে সত্যযুগেও চোর-ডাকাত ছিল, এখনও আছে। এই যে আমি, আমি এত সত্যি কথা বলি, জীবনে কারও অনিষ্ট-চিন্তা করি নি, তা কই আমার তাতে কিছু লোকসান হয়েছে ? আমার কিছু ক্ষতি হয়েছে ? আমার কিছু খারাপ হয়েছে ?

নতুন-বৌ বললে—আমি একটু ভেতরে যাই বাবা, জ্যাঠাইমা একলা রয়েছেন—

—না, না, তুমি যাও মা, তুমি ভেতরে যাও, আমি শুধু একবার দেখতে এলাম, আবার এখুনি চলে যাব—

সুকান্ত নিজের প্রসঙ্গতেই ফিরে এল, বললে—তাহলে আপনার গুরুদেব আমার সম্বন্ধেও যা-যা বলেছেন সব মিলে যাবে নিশ্চয়ই—

দুলাল সা' বললে—ওটা ভক্তির কথা। তোমার যদি ভক্তি থাকে তো মিলবে। আমার ভক্তি ছিল তাই মিলেছে, কর্তামশাই-এর ভেতরে-ভেতরে ভক্তি ছিল বৈ কি, তাই এমন করে মিলল। মিলতে বাধ্য বাবা—দুইয়ে আর দুইয়ে যেমন চার, এও তেমনি।

—সেই গুরুদেবের সঙ্গে আর একবার দেখা হয় না ?

দুলাল সা' বললে—আমার সঙ্গে দেখা হয় বাবা, রোজই হয়—

সুকান্ত লাফিয়ে উঠল, বললে—তাহলে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা করিয়ে দিন না সা' মশাই, এবার আমিও না হয় শিষ্য হয়ে যাব, যা থাকে কপালে, চাকরিতে উন্নতি হবে তো ?

—কিন্তু তুমি কি করে দেখা করবে বাবা ?

সুকান্ত বললে—কেন ? আপনি কি করে রোজ দেখা করেন ?

—আমি তো বাবা ধ্যানে দেখি···

কথাটা শেষ হবার আগেই জুতোর খটাখট আওয়াজ করতে করতে নিতাই বসাক এসে হাজির হল। ঘরে ঢুকেই বললে—এই যে, দুলাল আছ এখানে।

এই নিতাই বসাকবাবুকেই এতদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করছিল সুকান্ত।

বললে—ওঃ, কোথায় ছিলেন এতদিন নিতাইবাবু, আমি খুঁজে খুঁজে···

নিতাই বসাক বললে—আপনার কাজেই গিয়েছিলাম কলকাতায়, সেখান থেকেই তো এখন আসছি—

তারপর দুলাল সা'র দিকে চেয়ে বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দুলাল—একবার এদিকে এস—

দুলাল সা' উঠে বাইরে এল। ফিস্ ফিস্ করে বললে—কদ্দূর কি হেস্ত-নেস্ত হল ?

নিতাই বসাকও গলা নামাল।

বললে—সব ফয়সালা করে ফেলেছি।

—এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো ?

—গণ্ডগোলের গোড়া উপড়ে ফেলে দিয়ে এলাম। ওইটেই আমাকে থানার ইন্‌স্‌পেক্টর বলেছিল যে, রোগী যদি হাসপাতাল থেকে লোপাট হয়ে যায় তো আর কারোর বাবার সাধ্যি নেই কিছু করে—পুলিসেরও বাঁচোয়া। কর্তামশাই-এর মামলা হাইকোর্টে গেলেও ফেঁসে যাবে—জজের এজ্‌লাসে আর উঠবেই না, তার আগেই খারিজ হয়ে যাবে—

—তা কি করে লোপাট করলে ?

—সে-সব তোমায় ভাবতে হবে না ! চল, ভেতরে চল—

বলে আবার ঘরে ঢুকল নিতাই বসাক। দুলাল সা'ও মালা জপতে জপতে নিজের চেয়ারটায় বসে পড়ে একবার হাই তুললে শব্দ করে—হরি হরি···

চিৎপুরের সরু রাস্তায় দিন হোক, রাত হোক, ভিড়ের কখনও কমতি নেই। সারা দিন শব্দের জ্বালায় ঝালাপালা হবার সব রকম উপকরণ মজুত আছে এখানে। বাস আছে, ট্রাম আছে, রিক্‌শা আছে, ঠেলাগাড়ি আছে, আরও আছে অসংখ্য মানুষ। তাই 'করুণাময়ী বোর্ডিং'-এর দোতলায় যারা সামনের দিকে থাকে তাদের ঘর-পিছু ভাড়া কম। ভেতরের দিকে বেশি ভাড়া। ভেতরের ঘরগুলোতে আলো নেই, হাওয়াও নেই, কিন্তু তবু ভাড়া বেশি।

'শ্রীমানী অপেরা'র অফিস এর পাশেই। চণ্ডীবাবুই ঠিক করে

দিয়েছিল সমস্ত। কর্তামশাইকে কিছুই করতে হয় নি। আর করবার মত ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

চণ্ডীবাবু বলেছিল—এ যে আপনার নাতনী তা তো জানতাম না ভট্‌চায্যি মশাই—আর জানবই বা কি করে বলুন? লোকে শুধু জানে আমার মেয়ে—আহা, বড় ভাগ্যবতী মেয়ে মশাই আমার—

কর্তামশাই বলেছিলেন—আপনার এ ঋণ আমি একদিন না একদিন শোধ-করবই—আমার যা উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না—

—কিন্তু আপনার এই নাতনীর জন্যে আমি কত টাকা উপায় করেছি জানেন? এই 'শ্রীমানী অপেরা'র দলই চলেছে বলতে গেলে একা ওই আপনার নাতনীর জন্যে—তাই তো বলছিলাম বড় ভাগ্যবতী মেয়ে আমার, যেদিন থেকে আমার ঘরে এসেছিল সেই দিনটি থেকেই আমার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল মশাই। এবার দেখুন আপনার ভাগ্যও ফিরবে—

কর্তামশাই বললেন—ওই তো আমার ভাগ্যলক্ষ্মী চণ্ডীবাবু, ও যাবার পর থেকেই আমার ভাগ্যটা পড়ে গিয়েছিল, আমার জমি-জমা সব চলে গিয়েছিল একে একে—

—সে তো আমি সব শুনেছি।

—সে আর আপনি কতটুকু শুনেছেন? দু'দিনে আর কতটুকু শোনান যায় বলুন? এও ভাগ্য। সেদিন যে কি সুমতি হয়েছিল, কুষ্ঠিখানা ভুল করে দেখিয়ে ফেলেছিলাম সাধু মহারাজকে, আর তারই ফলে এত কাণ্ড···

চণ্ডীবাবু বলেছিল—ও সব মশাই মেলে, অক্ষরে অক্ষরে মেলে, ও আমি অনেক দেখেছি—তা সে-সব যাক্‌গে, এখন ভালোয়-ভালোয় বাড়ি নিয়ে যান, হরতন সেরে উঠুক—তারপর ঠাকুরের কাছে যা মানত করেছেন সেই রকম পুজো দেবেন—তারপর আমরা একদিন গিয়ে যাত্রা গেয়ে আসব—

—নিশ্চয় যাবেন। যাবেন বৈ কি।

তার পর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপনারও তো ক্ষতি হল হরতনকে ছেড়ে—

চণ্ডীবাবু বলেছিল—তা আমার ক্ষতিটাই বড় হল ? আমি মশাই পেশাদার লোক, আর একটা দেখে-শুনে যোগাড় করে নেব'খন—ভাত ছড়ালে এ-লাইনে কাকের অভাব হয় ? আর যদ্দিন না তা পাই তদ্দিন বঙ্কু আছে, বঙ্কুই গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নেমে যাচ্ছে···

চণ্ডীবাবুই সত্যি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। না দিলেই পারত। শুধু হোটেলের ব্যবস্থাই নয়, টাকাও দিয়েছিল। কর্তামশাই তো বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান নি। বড়গিন্নীর একটা গয়না নিয়েছিলেন সঙ্গে আর ট্রেনভাড়াটা। এও যোগাযোগ—ভগবানের যোগাযোগ। তুমিই সত্য মা। তুমিই সত্য! যারা অবিশ্বাসী তারা ভুল করে তোমার ওপর অবিচার করে। আমিও কত অবিচার করেছি। কত অবিশ্বাস করেছি একদিন।

চণ্ডীবাবু বলেছিল—খবরের কাগজে খবরটা দিয়ে দিই ভট্চায্যি মশাই, বুঝলেন ?

—কোন্ খবরটা ?

—এই আপনার নাত্নীর খবরটা ? বেশ গুছিয়ে লিখে দিলে অনেক অবিশ্বাসীর চৈতন্য হবে—

কর্তামশাই বলেছিলেন—না না চণ্ডীবাবু, সেটা ভাল হবে না—আর তাতে আপনারই বা কি লাভ ?

—আমার লাভ, আমার দলের পাব্লিসিটি।

—পাব্লিসিটি ? মানে ?

—মানে, 'শ্রীমানী অপেরা'র নামটা বিনা পয়সায় প্রচার হয়ে যাবে।

কর্তামশাই হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন শ্রীমানীবাবুর।

—না না, হরতনের বয়েস হয়েছে, দু'দিন বাদে অসুখটা সারলেই বিয়ে-থা'র ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি আর ও-সব হট্টগোল করবেন না, তখন লোকের ভিড় হয়ে যাবে, অসুখটা বেড়ে যেতে পারে তাতে, ও হ্যাঙ্গাম আর করবেন না দয়া করে—

তা সেই ব্যবস্থাই হল। কর্তামশাই হরতনকে নিয়ে করুণাময়ী হোটেলে উঠলেন। অন্ধকার ময়লা ঘর। একখানা তক্তপোশ, ছারপোকায় ভর্তি। সেইটেকেই পরিষ্কার করে হরতনকে শুইয়ে দিলেন। আর নিজে মেঝের ওপর বিছানা করে নিলেন। দুটো দিনের ব্যাপার। তার পর কেষ্টগঞ্জ থেকে টাকা এলেই রওনা দেওয়া। টাকার জন্যে নিবারণকে লিখে দিয়েছিলেন। দুলাল সা'র কাছে গিয়েও টাকা নিতে পারে। বেটা সুদখোর, বেটা চশমখোর। এদিকে টাকায় চার আনা পাঁচ আনা সুদ আদায় করে আর মুখে কেবল হরি হরি বলে। এবার? এবার ঐ পেঁপুলবেড়ের জমিটা আবার মামলা করে আদায় করে তবে ছাড়বেন। এবার বাড়িটা আবার সারাতে হবে। সামনের উঠোনে যে-সে যখন-তখন হুট্ করে ঢুকে পড়ে। এবার সমস্ত জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে চৌহদ্দিটা ঘিরে নিতে হবে। মালো-পাড়ার জমিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। অনেক জমি, অনেক বিল-বাঁওড়। দুলালের কাছে রেহানী-তমসুক নিয়ে সব কর্জপত্র করে দেওয়া আছে। মামলা করে দুলাল সা'র ভিটে-মাটি পর্যন্ত আদায় করে ছাড়বেন এবার। তখন এসে হাতে-পায়ে ধরলেও আর রেহাই নেই। এবার আর দয়া-মায়া নয়। দয়া-মায়া দেখিয়ে দেখিয়ে কেবল নিজের সর্বনাশ করেছেন এতদিন। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

তক্তপোশের ওপর যেন কেমন একটা শব্দ হল। হরতন যেন মুখের শব্দ করলে কি রকম একটা।

লাফিয়ে উঠে কর্তামশাই মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন—

কি মা, কষ্ট হচ্ছে খুব? আচ্ছা, আচ্ছা, মশা কামড়াচ্ছে—বুঝতে পারছি—

তার পর একটা তালপাতার পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। বললেন—তোমার নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলে তোমার অসুখ-বিসুখ সব ভাল হয়ে যাবে মা, দেখবে! আবার তুমি উঠে-হেঁটে বেড়াবে, তোমার ঠাকুমা তোমাকে কত আদর করবে তখন দেখো—আমি গরু কিনব, খাঁটি দুধ খাবে তুমি—মস্ত বড় বাগান করে দেব তোমার জন্যে, তুমি সেখানে বেড়াবে, ফুলগাছ পুঁতে দেব—

হরতন চুপ করে সব শোনে। আর শুনুক না শুনুক কর্তামশাই সেই অন্ধকার ঘরে পাশে বসে নিজের মনের সব সাধগুলো এক-নাগাড়ে বলে যান।

চণ্ডীবাবু আসে। দেখে যায়। খুব ব্যস্ত মানুষ। এসেই বলে, মশারি পেয়েছেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

—আর বঙ্কু এসেছিল? ডাক্তার যেমন-যেমন বলে তেমনি তেমনি ওষুধ খাইয়ে যান—বঙ্কুই সব করবে, আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না।

তা বঙ্কু আসে ঠিক নিয়ম করে। সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয়। ছোকরা মানুষ। নিজের হাতে ওষুধ খাওয়ায়। 'অকূলের কাণ্ডারী' বইতে 'রাণী রূপকুমারী'র পার্টটা সে-ই এতদিন চালিয়ে আসছে। অঞ্জনার অসুখের পর থেকে বঙ্কুই ওটার ভার নিয়েছে। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নামে বটে, কিন্তু তেমন জমাতে পারে না।

বঙ্কু বলে—বেটাছেলে কি আর মেয়েছেলের মত পার্ট করতে পারে? আপনিই বলুন···

কর্তামশাই বলেন—তা তো বটেই, ও তুমি পারবে কেমন করে? যার যা কাজ···

বঙ্কু বলে—তবু য়্যাদ্দিন চালাচ্ছি কষ্ট করে, ওর অসুখের পর থেকেই চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মেয়ে-ছেলে না আনলে আমাদের দল আর টিঁকবে না কর্তামশাই। দল বলতে গেলে ভেঙেই গ্যাচে···

কর্তামশাই বলেন—না না, দল ভাঙবে কেন। তোমরা কেষ্টগঞ্জে আমার বাড়ি যাবে, সেখানে এই হরতনের বাড়ি দেখবে, সে কি বিরাট বাড়ি, এই হরতনের পূর্বপুরুষ একদিন গৌড়েশ্বরের রাজ-পুরোহিত ছিল কি-না, তাঁর হাতী ছিল, সেই হাতী চড়ে তিনি রোজ বিগ্রহ পুজো করতে যেতেন, একশো আটটা পদ্মফুল লাগত তাঁর পুজোয়—। তোমরা গিয়ে 'অকুলের কাণ্ডারী' প্লে করবে সেখানে, লুচি-মাংস-পোলোয়া খাওয়াব তোমাদের সকলকে···

বঙ্কুকেও সেইসব গল্প বলেন কর্তামশাই। সকলকেই বলেন। যে আসে হরতনকে দেখতে, তার কাছেই বলেন কাহিনীগুলো। আর কেউ না থাকলে একলা হরতনকেই শোনান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

নিবারণ খুঁজতে খুঁজতে একদিন এখানেই এসে পড়ল। 'করুণাময়ী হোটেল'। কর্তামশাই-এর চিঠিখানা হাতেই ছিল। সেখানকার সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলে। টাকাগুলো খুব সাবধানে পেট-কাপড়ে বেঁধে এনেছে। এ কলকাতা শহর। এখানে জাল-জুয়াচোরের অভাব নেই। ট্রাম থেকে নেমে চারদিকের হাল-চাল দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হোটেলের নীচে খোঁজ নিয়ে উপরে উঠেছিল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে একেবারে এই ঘরে এসে হাজির। দরজাটা ঠেলতেই কর্তামশাই-এর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে।

—এই যে নিবারণ, তুমি এয়েছ? আমি এদিকে ভেবে ভেবে মরছি। টাকা পেলে? দুলাল সা' কি বললে?

নিবারণের সে কথায় কান নেই। সে তখন তক্তপোশটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হরতনকে দেখছে একদৃষ্টে। হরতন চাদর-চাপা দিয়ে

চুপ করে শুয়েছিল। মুখখানা শুধু খোলা। বড় বড় একজোড়া চোখ। সমস্ত মাথায় চুলের বন্যা বইছে। হরতনও যেন একদৃষ্টে দেখছে নিবারণকে।

কর্তামশাই কাছে গেলেন। তাঁর মুখে হাসি। হরতনকে জিজ্ঞেস করলেন—একে তুমি চিনতে পারছ, মা? সেই তোমাকে কোলে করে গাব্-তলায় নিয়ে গিয়ে খেলা করতেন, সেই সরকার জ্যাঠা?

তারপর নিবারণের দিকে চাইলেন, বললেন—কেমন? চিনতে পারছ তো? চোখের ভুরুটা দেখেছ? এখন! এখন কি বলবে তুলাল সা'! তখন যে বড় গলা করে দেমাক দেখিয়েছিল, ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে, বড় বাড়ি করেছে, সুগার-মিল করেছে! তা এখন কি বলবে সে! এখন আমিও ছেড়ে কথা বলব না। ক'টা রেহানী-তমসুক ওর কাছে আছে আমি দেখব এবার! কী রকম! এখন বিশ্বাস হল তো তোমার?

নিবারণ বললে—এ হরতন কর্তামশাই, আর কেউ নয়—ঠিক হরতন আমাদের।

সদানন্দ এ উপন্যাসে একটা সামান্য চরিত্র। কিন্তু তারও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে আমার গল্পে। সেই ঘটনাটা বলি।

সদানন্দ শুধু তুলাল সা'র ম্যানেজারই ছিল না, ম্যানেজারের চেয়েও বেশি ছিল। এককালে কান্ত যখন আসে নি, তখন কান্তর জায়গাতেই কাজ করত সদানন্দ। শুধু খাওয়া। পেট-ভাতা চাকরিতেই এসেছিল প্রথমে সদানন্দ। সদানন্দ তখন তাইতেই মহা খুশী। তখন খেতে পাওয়াটাই বড় কথা। তার বেশি কিছু সে চায় নি।

কিন্তু আস্তে আস্তে দুলাল সা'র অবস্থা ভাল হল।

তারই চোখের সামনে দুলাল সা'র নতুন বাড়ি উঠল। দিনের পর দিন দুলাল সা'র অবস্থার বদল হতে দেখল। সদানন্দ চোখের সামনেই দেখতে পেলে কেমন করে কোথা থেকে টাকা আসে দুলাল সা'র আর নিতাই বসাকের। সদানন্দই হিসেব রাখত, সদানন্দই ক্যাশ বুঝিয়ে দিত দুলাল সা'কে। তার নিজের অবস্থা এতটুকু বদলালো না, এতটুকু উন্নতি হল না নিজের।

অনেকবার আড়ালে বলেছিল সদানন্দ দুলাল সা'কে—সা' মশাই, আমি তো আর পারি নে—

—পারি নে মানে? মানেটা খুলে বল!

সদানন্দ বলছিল—আজ্ঞে, পারি নে মানে সংসার চালাতে পারি নে—

—তার মানে তুমি মাইনে বাড়াতে চাও?

—আজ্ঞে, তার বেশি আর কী চাইব বলুন? সতেরো টাকায় আর চালাতে পারি না সংসার—

দুলাল সা' কথাটা শুনে হাসতে লাগল।

বললেন—সতেরো টাকায় সংসার চালাতে পার না? তুমি যে হাসালে আমাকে সদানন্দ! মানুষের খেতে কত টাকা লাগে বল দিকিনি? একটা মানুষের মাসে কত টাকা লাগে খেতে?

—আপনিই বলুন?

দুলাল সা' বললে—একটা পয়সাও লাগে না। তবে বলি তোমাকে। এই আমি! আমি যখন এই কেষ্টগঞ্জে প্রথম এলাম, তখন আমার হাতে একটা পয়সাও ছিল না! বুঝলে হে, একটা পয়সাও ছিল না,—তখন আমি খাই নি? তখন আমি খেতে পাই নি? তখন কি আমি উপোস করে থাকতাম? তুমি বল না, তখন কি আমি উপোস করে থাকতাম? আমার কথার জবাব দাও তুমি?

প্রথমে বিনা পয়সার চাকরি। শুধু পেট-ভাতা। তার পর তিন টাকা, পাঁচ টাকা। শেষকালে সতেরো টাকা। তাতেও সদানন্দর লোভ মেটে না। যার এত লোভ তাকে ক্যাশে রাখা ঠিক নয়। চোখের সামনে টাকার পাহাড় দেখলে লোভও বেড়ে যাবার কথা। এত টাকা দুলাল সা'র আর তার নিজের কিছুই নেই! এটা খারাপ। নিতাই বসাকও বললে এটা খারাপ। দুলাল সা'রও তাই মত।

দুলাল সা'র তখন রমারম অবস্থা চলেছে। পাট, তিসি, ধান। তার ওপর আছে তেজারতি। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে কোন্ অদৃশ্য সুড়ঙ্গ পথে ঝুড়ি-ঝুড়ি টাকা এসে হাজির হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। নিতাই বসাক যত দিল্লী যায়, যত কলকাতায় যায়, তত টাকা এসে যায় অদ্ভুত ভাবে। সাতশো টন পাটের অর্ডার আসে সিঙ্গাপুর থেকে। তিনশো টন তিসির অর্ডার আসে আমেরিকা থেকে। একেবারে আন্তর্জাতিক ব্যাপার। দুলাল সা'র আড়তের সামনে নৌকার গাদি লেগে যায়, লরীর ভিড় তিন দিন ধরে আর শেষ হয় না।

এ সমস্তই দেখত সদানন্দ।

দেখত আর মাস-কাবারি সতেরোটি টাকা নিয়ে ট্যাকে গুঁজত।

শুধু সদানন্দ কেন, দুলাল সা'র অধীনে যারা কাজ করত তারা ঐহিক সুখ নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের সকলের একমাত্র সম্বল হরি। দুলাল সা'ই তাদের বলেছিল—টাকায় সুখ নেই।

যদি জিজ্ঞেস কর সুখ কিসে আছে তো দুলাল সা'র স্টক্ জবাব ছিল—হরিতে। অর্থাৎ হরির নাম করলে পেটই শুধু ভরবে না, ইহকাল পরকাল এবং পরকালের পরেও যদি অনন্তকাল বলে কিছু থাকে তো তাও উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। হরিনামের নাকি এমনিই গুণ।

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু সদানন্দের চাল-চলন ভাল মনে হল না নিতাই বসাকের।

নিতাই বসাক বলেছিল—ওর চাকরি খতম্ করে দাও দুলাল—

দুলাল সা' বলেছিল—না না, কৃষ্টের জীব, আহা ওকে বরং সরিয়ে দাও—

সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংসারে এমন এক-একজন লোক থাকেই যারা যেখানেই থাকুক, শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। বাড়ির বউ হয়ে এলে তারা ঘর ভাঙে। বাড়ির চাকর হয়ে এলে তারা সিন্দুক ভাঙে। অফিসের ক্লার্ক হয়ে এলে তারা শৃঙ্খলা ভাঙে। সদানন্দ সেই জাতেরই লোক। ক্যাশ থেকে তাকে সরিয়ে দুলাল সা'র পাটের গদিতে বসিয়ে দেওয়া হল। পাটের গদিতে কাজ তেমন কিছু করতে হত না। পয়সা-কড়ির সংশ্রবও ছিল না। লরীতে মাল বোঝাই হবার সময় গুণতে হত। রাম দুই তিন করে গুণতি করেই খালাস।

সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটল।

বিজয়ের বিয়ের কথা উঠেছে। দুলাল সা'র কাছে লোক-জন আসা-যাওয়া শুরু করেছে পাত্রের খবর নিয়ে। সেটা জানত সদানন্দ।

সদানন্দ তেমনি একদিন গদিতে কাজ করছিল। সেই সময়েই খবরটা আসে কানে।

নৌকা করেই এসেছিল ভদ্রলোক। গহনার নৌকাতে কোনও রকমে এসে পৌঁছেছিল কেষ্টগঞ্জে। এসে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই ধরেছে।

—কাকে চান আপনি ?

—আজ্ঞে, আমি দুলাল সা' মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই—

—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

ভদ্রলোক বললেন—আমি আসছি অনেক দূর থেকে। বড়-চাতরা নাম শুনেছেন ?

—শুনি নি, কিন্তু মশাই-এর কী করা হয় ?

—আমি ঘটকালী করি। পাত্র-পাত্রী সংবাদ আনা-দেওয়া করি, তাতেই আমার জীবিকা চলে। আমি শুনেছি সা' মশাই-এর একটি বিবাহ-যোগ্য পুত্র আছে, সে ডাক্তারী পড়ে, তার জন্যেই এক পাত্রীর সংবাদ এনেছি—

এ-সব সদানন্দ জানত। বললে—আসুন, আপনি এখানে বসুন আয়েস করে—

খুব খাতির-টাতির করলে সদানন্দ। সদানন্দ বললে—আমি দুলাল বাবুর গদির লোক—

ভদ্রলোকও নিজের পরিচয় দিলে। নাম—দোলগোবিন্দ প্রামাণিক। পেশা ঘটকালী। বড় বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই কাজ আমার। এবার মহারাজার মেয়ের বিবাহটি দিয়ে দিলেই একটা মস্ত কাজ হয়।

মহারাজার নাম শুনেই সদানন্দ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

—কোন্ মহারাজা ? কোথাকার মহারাজা ?

দোলগোবিন্দ বললে—আমাদের বড়-চাতরার—

—বড়-চাতরা কোথায় ?

—বর্ধমান জেলার একটা গ্রামের নাম বড়-চাতরা। ও নামেই শুধু মহারাজা। আমরা মহারাজা বলেই ডাকি। এককালে মহারাজা ছিল হয়তো কেউ ওই বংশে। সে-বাড়িও আছে। কিন্তু ভাঙা-চোরা অবস্থায়। জলুস নেই, জাঁক নেই। তবে বড় বংশ। বংশের মর্যাদা আছে। বৃদ্ধ বাপ, আর এক বিধবা পিসীমা মাত্র সংসারে। এই কন্যাটির বিবাহ দিলেই দায়মুক্ত।

—দেবেন থোবেন কেমন ?

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক এবার হাতের পোঁটলাটা একটু গুছিয়ে বসল। বলতে যেন একটু সময় নিলে। তারপর বললে—আজ্ঞে,

ধনীর ঘরে কন্যাদান করবেন, কুল-মর্যাদা যা লাগে তা দেবেন বৈ কি! মহারাজা গরীব বলে কি সত্যি-সত্যিই গরীব, এখনও সিন্দুক ঝাড়লে হীরাটা মুক্তাটা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পারে—

সদানন্দ কথাগুলো মন দিয়ে সব শুনলে।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হল। বললে—খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবেন ঘটক মশাই আজকে?

—খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই, মুড়ি-চিঁড়ে যা'হোক দুটি চিবিয়ে জল খেয়ে নেব'খন—আমার এ অভ্যেস আছে—আগে কাজটা হোক, তখন খাওয়ার কথা ভাবব—

সদানন্দর তখন ছুটি হবার সময় এসেছে।

বললে—আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, কথা আছে—

বলে সদানন্দ নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল দোলগোবিন্দ প্রামাণিককে।

বললে—আপনি হলেন কেষ্টগঞ্জের অতিথি মানুষ, আপনাকে অভুক্ত রাখতে পারি কি আর—

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সদানন্দই সমস্ত শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল দোলগোবিন্দকে। কন্যাদায় বড় দায়। এক হাজার-এক কথার আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তা তো জানেন ঘটক-মশাই। আগে বলুন মেয়ে কেমন?

—সে সা' মশাই নিজে গিয়েই দেখে পছন্দ করবেন! ঘটকের কথায় তো বিয়ে হবে না!

সদানন্দ বলেছিল—কিন্তু আপনাকে বলে রাখাই ভাল, সম্বন্ধ অনেক আসছে, কলকাতার বড় বড় লোকের বাড়ি থেকেও সম্বন্ধ আসছে—অনেক টাকার লোভ দেখাচ্ছে তারা; আমি সবই জানি—

—তা তো জানবেনই আপনি! আপনি এতদিন সা' মশাই-এর গদিতে চাকরি করছেন—

সদানন্দ বললে—কাজ করছি বলে নয়, আমি ইচ্ছে করলে সা'মশাইকে ফাঁসিয়েও দিতে পারি।

—কী রকম ?

—আমি তো ক্যাশে কাজ করতাম আগে! এই ধরুন, ব্যাঙ্কের টাকা আমিই জমা দিয়ে আসতাম। কত টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে সা'মশাই তাও আমি বলে দিতে পারি। হরিসভার নাম করে কত টাকা নিজের পেটে পুরেছে তাও আমি বলে দিতে পারি। আমি ইচ্ছে করলে সা'মশাইকে পুলিসেও ধরিয়ে দিতে পারি।

—তাই নাকি ?

—তা আপনি যেন আবার এসব কথা কাউকে বলবেন না।

—না না, ছি ছি, সে কি কথা! আপনার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে-দেয়ে আপনারই সব্বোনাশ করব ? আমি তেমন নেমখারাম নই—

—হ্যাঁ, আপনি ভাল লোক, তাই আপনাকেই সব খুলে বললাম। নইলে এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়। আমি বেতন পাই কত টাকা জানেন ?

দোলগোবিন্দ চুপ করে রইল। তারপর বললে—কত ?

—পাঁচ বছর পেট-ভাতায় কাজ করেছি আমি, তা জানেন ? তার পর এক টাকা দু'টাকা করে বেড়ে বেড়ে এখন হয়েছে সতেরো টাকা! ভাবুন একবার কাণ্ড-কারখানা। আমার কেউ নেই বলেই তাই সতেরো টাকায় চালাচ্ছি—নইলে সতেরো টাকায় আজকাল চলে ? আপনিই বলুন ?

—তা তো বটেই। তা আপনি কি করতে চান, বলুন ?

তা সেই দিনই প্রথম পরামর্শ হল দুজনে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে সদানন্দ। সদানন্দ জীবনে কারও ক্ষতি করে নি। কারও ক্ষতির চিন্তাই করে নি। আর পাঁচজন ভদ্রসন্তানের মত

নিজের আর্থিক উন্নতিই চেয়েছিল। সে চেয়েছিল সে-ও একদিন অবস্থাপন্ন হবে। দুলাল সা'র মত না হোক, নিতাই বসাকের মত না হোক, আরও অন্য সাধারণ পাঁচজনের মত, কিন্তু তা হয় নি। হয় নি বলেই মুখ বুঁজে পড়ে আছে, আর বসে বসে এই পাটের গাঁট গুনছে।

দোলগোবিন্দ ঘটক এসেছিল ঘটকালী করতে, কিন্তু এসে এ এক অদ্ভুত লোকের পাল্লায় পড়ে গেল।

—তা আমি কি করব বলুন না, আমি কি করতে পারি তার?

সদানন্দ বললে—আপনি সবই করতে পারেন ঘটক মশাই। আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন এই বিপদ থেকে—

—কি রকম করে?

—সেই কথা বলব বলেই তো আপনাকে নিয়ে এলাম বাড়িতে। দেখছেন তো এই তো ঘরের অবস্থা—

দুপুর বেলায় সদানন্দের গদি বন্ধ থাকে। সবাই খেতে যায় সেই সময়ে। বিকেল তিনটের পর আবার খোলা। সেই সময়টুকুর মধ্যে সদানন্দ দোলগোবিন্দকে নিজের সামনে বসিয়ে সব শুনিয়ে দিলে।

—আমি দুলাল সা'র সর্বনাশ করতে চাই মশাই! ও যেমন আমার সর্বনাশ করেছে, তেমনি আমিও ওর সর্বনাশ করতে চাই। দুলাল সা'র ক্যাশে কাজ করতাম আমি। আমি সব জানি ওর ভেতরের ব্যাপার। কোথায় কত টাকা লগ্নী আছে তাও জানি, কত টাকা সিন্দুকে আছে তাও জানি, কত টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে তাও জানি। হিসেবের খাতা আমিই রাখতাম কি না!

দোলগোবিন্দ ঘটক বললে—তা এ সব খবর পুলিসের কাছে দিয়ে ছান্ না—

—না মশাই, আমি গরীব মানুষ, পুলিস-টুলিস সব বড়

লোকদের দলে। আমি যখন বিপদে পড়বো তখন আমাকে কে দেখবে? তাইতো এতদিন চুপ করে আছি, কিছু বলছি না—তাইতো আপনাকে এত কথা বলছি—

—তা এখন আমি কি করতে পারি আপনার বলুন?

—আপনি সব করতে পারেন আমার—

বলে হঠাৎ নিচু হয়ে কানে কানে কি বললে সদানন্দ, শুনেই চমকে উঠল দোলগোবিন্দ ঘটক।

—বলেন কি? আমি এমন গণ্ডগোলের মধ্যে থাকতে পারব না মশাই, আমি নিরীহ গেরস্থ মানুষ, আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না মশাই, আমার নিজেরই বলে মেয়ে আছে তাদের বিয়ে দিতে হবে, তখন ধর্মে সইবে ভেবেছেন?

সদানন্দ হাত জড়িয়ে ধরল। বললে—আমার এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে ঘটক-মশাই—

দোলগোবিন্দ ঘটক তখন বোধহয় পালাতে পারলে বাঁচে, এমন ঝঞ্ঝাট হবে জানলে এত লোক থাকতে কি আর এই লোকটার কাছে আসে? তিরিশ বছর ধরে ঘটকালীর ব্যবসা করে আসছে দোলগোবিন্দ, কিন্তু এমন বিপদে কখনও পড়ে নি সে।

—আমার নিজের কিছু নেই অবশ্য, তবু নেই-নেই করে একে-বারেই যে কিছু নেই, তাও নয়। ক্যাশ টাকা আমার নিজের নেই, কিন্তু অন্য যা-কিছু আছে, আপনাকে আমি তাই-ই দিয়ে দেব—আমার এ উপকারটা আপনি করুন।

দোলগোবিন্দ ঘটক আসলে বোধহয় ধর্মভীরু লোক, ভয়ে আঁতকে উঠল। বললে—না মশাই, আমি গরীব-গুর্বো মানুষ, আমার আবার লোভ লেগে যাবে, আমি তখন সামলাতে পারব না—

বলে এবার সত্যিই উঠে দাঁড়াল, পৌটলাটাও হাতে তুলে নিলে, তখন আবার সদানন্দর গদিতে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

সদানন্দ পেছন পেছন গেল।

বললে—ঘটক মশাই, আপনি যাচ্ছেন যান, কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন, জীবনে আপনি যা পাবেন না, তাই আপনি পেয়ে যেতেন—

কথাটা যেন হেঁয়ালির মত শোনাল।

—তার মানে ?

—মানে, আমার তো টাকা নেই, আমি আপনাকে কিছু সোনা দিতাম, গিনি সোনা।

দোলগোবিন্দ যেন কেমন থমকে দাঁড়াল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তারও, তিনটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে দোলগোবিন্দের নিজেরই, এক-একটা বিয়ের ঘটকালী করে কত আর পায় সে, কিছু কাপড়, কখনও বা একখানা কাশ্মীরী শাল, আর নগদ কিছু টাকা, তাও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।

—সে সোনা আমার মায়ের, একেবারে সে-কালের খাঁটি সোনা, আজকালকার মত ফন্-ফনে সোনা নয়, আমি আর সে-সোনা নিয়ে কি-ই বা করব ? আমার বউ নেই, মেয়েও নেই, কেউই নেই। মা মরে যাবার পর গয়নাগুলো সব পড়ে আছে, কারও ভোগেই লাগছে না—

দোলগোবিন্দ আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল—কতটা সোনা ?

—তা ধরুন না কেন, পনেরো ভরির কম নয়। দাদামশায়ের দেওয়া গয়না সব, নিজে স্যাক্‌রার সামনে বসে সে-সব গয়না পছন্দ মাফিক তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। তখন কি আর দাদামশাই জানত যে মেয়ে বিধবা হবে অল্প বয়সে, শ্বশুরবাড়িতে দেওররা তাড়িয়ে দেবে —কিছুই ভাবতে পারেনি বুড়ো, আর একটা মাত্তোর নাতি, সে-ও যে দুলাল সা'র পাটের আড়তে ভ্যারেণ্ডা বাজবে, তাও জানত না।

—তা সে-সব গয়না এখন কোথায় ?

—আছে মশাই আছে, বাউণ্ডুলে মানুষ হলে কি হবে, ভাল জায়গাতেই গচ্ছিত রেখে দিয়েছি, কতবার ভেবেছি যাকে সামনে পাই দিয়ে দিই, একবার রাগ করে ইছেমতীর জলেই ফেলে দিতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম—যাক কুমীরের পেটেই যাক ও-গুলো, তা কি মনে করে আবার রেখে দিয়েছিলাম, এখন যদি একটা সৎ কাজে লেগে যায় তো লাগুক—

—সৎ কাজ ? সৎ কাজটা কি ?

সদানন্দ বললে—এই আপনার তিনটে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক তাতে—

—তাতে আপনার কি লাভ মশাই ?

সদানন্দ বললে—লাভ আছে বৈকি, একেবারে লাভ না থাকলে আর করি ? অতগুলো সোনা দিয়ে দিই আপনাকে ? তুলাল সা'কে জব্দ করাও তো একটা লাভ আমার, ছেলে তো ওর ওই একটি, ওই বংশধরটির সর্বনাশ হলেই সা' মশাইয়েরও সর্বনাশ। আমি মশাই ও-বেটার সর্বনাশ দেখে তবে মরতে চাই, তার আগে নয়—দেখি ওর হরি ওকে ঠেকায় কী করে !

—তা আপনার যখন এত গয়না রয়েছে, তখন পরের চাকরি করছেনই বা কেন ? আমি হলে তো এমন চাকরির মাথায় লাথি মেরে চলে যেতাম।

সদানন্দ হাত দিয়ে নিজের কপালটা ছুঁয়ে বললে—কপাল কোথায় যাবে মশাই ? সেই যে কথায় আছে না, আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সঙ্গে—এও তাই। নইলে আমার নিজের মায়ের অত সোনা থাকতে আমিই বা চাকরি করতে আসব কেন, আর এত লোক থাকতে আমিই বা সা' মশাইয়ের বিষ-নজরে পড়ব কেন ? বলুন ? তা সে যা হবার হয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে দেখা

না হলে ও-সোনা আমি কাউকে-না-কাউকে দিয়ে বিবাগীই হয়ে যেতাম। এখন আমার কথা আমি বললাম, আপনার কর্তব্য আপনি ঠিক করবেন—

তা একদিনে দোলগোবিন্দ প্রামাণিকের মত অভাবী ধর্মভীরু মানুষকে কাবু করা গেল না। লোকটা রয়ে গেল সেদিন কেষ্টগঞ্জে। তার পরদিনটাও রয়ে গেল। আবার তার পরদিনও।

সেই কথাই আগে বলেছি। সদানন্দ এ-উপন্যাসে একটা অতি সামান্য চরিত্র। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে লাঠালাঠির সময় সেই সদানন্দই কুলি-মজুর খাটাবার কাজ করছিল। সতেরো টাকা মাইনে পেত। তারপর হাসপাতালে পাঠিয়েছিল তাকে দুলাল সা'। দুলাল সা'ই তাকে দিনের পর দিন নিজে গিয়ে দেখে আসত। তার খাবার বয়ে নিয়ে যেত। আবার সেই সদানন্দই একদিন হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

সামান্য চরিত্র বটে, কিন্তু এ উপন্যাসে তারও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আসলে সদানন্দ না থাকলে এ-উপন্যাস লেখাই হত না বলতে গেলে।

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক যে করিৎকর্মা মানুষ তা কিছুদিন পরেই প্রমাণ হয়ে গেল। দুলাল সা' মেয়ে দেখে এল। আশীর্বাদ করে এল। পাত্রীপক্ষও এসে পাত্রকে আশীর্বাদ করে গেল।

এ সব সেই অতীত কালের ঘটনা। তখন দুলাল সা'র এই নতুন বাড়ি হয় নি। কিন্তু অবস্থা ফিরেছে। বিজয় তখন কলেজে পড়ে। কলকাতায় পড়ে আর ছুটির সময় বাড়িতে আসে। বেশ ফুটফুটে ছেলে। ছেলে দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন অমায়িক বাপ, তেমনি অমায়িক ছেলে। সেই ছেলেরই বিয়ে। কেষ্টগঞ্জ ঝেঁটিয়ে লোক নেমন্তন্ন হয়েছিল। মা নেই, সুতরাং পুত্রবধূ এলে

বাড়িটাতে আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসে। দুলাল সা' আসলে কিছুই দেখে নি। কিছু চায়ও নি। যৌতুকের দিকে নজর দিতে গেলে মালে ভেজাল পড়ে। শুধু দেখেছিল মেয়ে। এমন মেয়ে চেয়েছিল, যে এসে সমস্ত সংসারের ভার নিজের মাথায় তুলে নেবে। মেয়ের বাপ নেই, মা নেই। থাকবার মধ্যে ছিল তখন এক বুড়ো পিসীমা। পিসীমার বয়েস হয়েছিল। ভাইঝির বিয়েটি দিয়ে তিনিও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তা ভাল। বাপের বাড়িতে বিশেষ কেউ না থাকাই ভাল। এক-একটা বউ থাকে যখন-তখন বাপের বাড়ি যেতে চায়। বাপ-মা-অন্ত প্রাণ। তেমন না হওয়াই ভাল। তেমন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে সহজে মন বসতে চায় না। দুলাল সা' নিতাই বসাক খুব ভাল করে দেখে শুনে নতুন বৌকে এনেছিল বাড়িতে। বর যেদিন কনেকে নিয়ে কেষ্টগঞ্জে এল সেদিন গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল সা' মশাই-এর বাড়িতে। আহা, বেশ বউ। বেশ বউ করেছেন সা' মশাই। যেমন সা' মশাই-এর ছেলে, তেমনি বউ। দুটিতে বেশ মানিয়েছে। একবাক্যে সবাই ওই কথাই বললে। সা' মশাই ছেলের বিয়েতে একটি পয়সাও নেয় নি, সেটাও লোকমুখে প্রচার হয়ে গিয়েছিল।

দুলাল সা' বলেছিল—ছেলে কি আমার পাট না তিসি হে যে, ছেলে বেচে পয়সা 'নেব ?

কেউ কেউ বলেছিল—আজ্ঞে কর্তামশাই কিন্তু ছেলের বিয়েতে নগদ দু' হাজার টাকা নিয়েছিলেন—

দুলাল সা' বলেছিল—তোরা বড় পরের নিন্দে করে বেড়াস হলধর, পরনিন্দা মহাপাপ তা জানিস ?

তা সেদিন আর অত বক্তৃতা শোনবার সময় ছিল না কারও। শ'য়ে শ'য়ে লোক পাতা পেতে বসে গেছে খেতে। ছাদ, উঠোন, বারান্দা কোথাও ফাঁক নেই। লুচি দিতে দিতে তরকারী ফুরিয়ে

যায়, তরকারী দিতে দিতে লুচি ফুরিয়ে যায়। ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছে, পুলিসের সুপার এসেছে। তাদের দিকটা দেখবার ভার নিয়েছে নিতাই বসাক নিজে। বাড়ির সামনে মাথার ওপর মাচা খাটিয়ে নহবৎ বসেছে। কলাপাতা, খুরির পাহাড় জমে গেছে আঁস্তাকুড়ে। দুলাল সা'র বাড়িতে সেই-ই প্রথম আর শেষ বিয়ে বলতে গেলে। কোনও ব্যাপারে কার্পণ্য নেই দুলাল সা'র। তারই মধ্যে দোলগোবিন্দ প্রামাণিক এক কোণে বসে পেট ভরে খাচ্ছিল। আসলে তারই তো উৎসব আজকে।

—তুমি খেয়েছ? পেট ভরে খেয়েছ তো?

দোলগোবিন্দ বললে—আজ্ঞে প্রচুর খেয়েছি—

—দেখ বাবা, মনে কোন ক্ষোভ রেখ না—পেট না ভরলে পরের ব্যাচে আবার বসে যাও, কিন্তু পরে যেন কিছু বলো না—

দুলাল সা'র সকলের কাছেই ওই এক কথা।

সকলেই দুলাল সা'র কাছে এসে হাত জোড় করে বলে গেল—অতি উত্তম আয়োজন হয়েছে সা' মশাই—

—তা বৌমাকে দেখেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্মীপ্রতিমা একেবারে—

ক্রমে বিয়ে-বাড়িতে রাত গভীর হয়ে আসতে লাগল। যত রাত হয় দোলগোবিন্দ তত ছটফট করে। তত এর-ওর মুখের দিকে চায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। রাত আরও গভীর হয়ে এল। তখন বুকটা দুরদুর করতে লাগল। বার-বাড়ি ঘুরে দেখে দোলগোবিন্দ। তখনও অন্ধকারে এখানে-ওখানে দু-চারটে লোক ঘোরাঘুরি করছে। আত্মীয়-অভ্যাগত অনেকে চলে গেছে, অনেকে আবার এ বাড়িতেই শোবে। দোলগোবিন্দ ঘরের ভেতরে গিয়ে সকলের মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

—কী দেখছেন ঘটক মশাই?

দোলগোবিন্দ সে কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। একবার এ-ঘর একবার সে-ঘর। ঘর ছেড়ে বারান্দা, উঠোন, বার-বাড়ি, ভেতর-বাড়ি। একেবারে পাগলের মত হন্যে হয়ে ছটফট করতে লাগল। নহবত-বাজিয়ে তখন দরবারী কানাড়ায় কোমল গান্ধারটাকে মীড় দিয়ে মোচড়াচ্ছে। সমস্ত বাড়ি আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে।

—কী খুঁজছেন ঘটক মশাই, কাকে খুঁজছেন?

তখন আর সময় নেই। দোলগোবিন্দর তখন শুধু পাগল হতে বাকি। শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি।

হঠাৎ সামনে পাওয়া গেল সদানন্দকে। দোলগোবিন্দ একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরেছে তাকে। এবার? এবার কোথায় পালাবে তুমি?

—কী হে, আমার সোনা?

লোকটাও হতভম্ব। থতমত খেয়ে গেছে সে।

—বলি আমাকে যে সোনা দেবে বলেছিলে? পনেরো ভরি গিনি সোনার গয়না?

—কে সোনা দেবে বলেছিল? কখন বলেছিলাম? পাগল হয়ে গেলেন নাকি আপনি ঘটক মশাই?

চারদিকে সবাই হৈ-হৈ করে উঠেছে। বিয়ে-বাড়ির গোলমালের মধ্যে যে-যেখানে ছিল ছুটে এল। কী হয়েছে ঘটক মশাই? কে সোনা দেবে বলেছিল? কাকে?

—দেখুন না, আমাকে বলছেন কিনা আমি পনেরো ভরির গয়না দেব বলেছিলাম। আমি অত গয়না চোখে দেখেছি জীবনে? আমার অত সম্পত্তি থাকলে আমি পরের বাড়িতে কাজ করি?

—ছাড়ুন, ছাড়ুন—

সবাই ধরে করে ছাড়িয়ে দিলে ঘটক মশাইকে। দোলগোবিন্দর তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। কাঁধের চাদর মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আর ওদিকে ফুলশয্যার খাটে তখন নববধূ ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে বসে আছে। এই নতুন বৌ। এই নতুন বৌ-ই তখন নববধূর বেশে ঘোমটার আড়ালে বসে থর থর করে কাঁপছে।

আর বাড়ির সদরের মাথায় মাচার ওপর তখন মুলতান ধরেছে নহবতওয়ালা।

এ-সব ঘটনা আজকের নয়। এই আজ যখন কর্তামশাই কলকাতা থেকে হরতনকে খুঁজে নিয়ে কেষ্টগঞ্জের গাঁয়ে ফিরে আসছেন, তখন আর কারো সে-ঘটনা মনে থাকবার কথা নয়। মনে থাকলে থাকতে পারে এক সদানন্দর। তা সে সদানন্দও তো নিখোঁজ।

সদানন্দকে যে এত খাতির, সদানন্দকে যে রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে বসিয়ে এমন খাওয়ান-দাওয়ান, তার মূলেও ছিল এই ঘটনা।

দোলগোবিন্দ সেই বিয়ের দিনের ঘটনার পর থেকেই যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। সদানন্দ প্রথমে বলেছিল বিয়েটা হয়ে গেলেই তার পাওনা মিটিয়ে দেবে।

তা হল না।

সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তবে বিয়ে। বরযাত্রীরা দল বেঁধে গিয়েছিল সবাই। দুলাল সা' বরকর্তা হয়ে গিয়েছিল। নিতাই বসাকও ছিল। বরপক্ষের লোক যখন গিয়ে পৌঁছুল, তখন ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেল। এতগুলো লোক গেল, আপ্যায়ন করবার তেমন কেউ নেই।

নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করলে—কই হে, ঘটক কোথায় গেল? দোলগোবিন্দ প্রামাণিক আমাদের?

দোলগোবিন্দ ব্যস্ত হয়ে এসে বলেছিল—ডাকছেন নাকি আমাকে বসাক মশাই?

নিতাই বসাক বললে—তা ডাকব না? বলি পান-তামাক কোথায়? খাতির করবার লোকজন সব কোথায় গেল?

—বড় মুশকিল হয়েছে বসাক মশাই, ব্যবস্থা সবই ঠিক আছে, একটা গোলমাল হয়ে গেছে শুধু—বলে কাকে যেন ওদিকে ডাকতে ডাকতে চলে গেল। বললে—অ নিবারণ, নিবারণ কোথায় গেল···

দোলগোবিন্দ সেই যে নিবারণকে ডাকতে গেল আর তার পাত্তা পাওয়া যায় নি। কিন্তু বিজয়ের বিয়ে তা বলে আটকে থাকে নি। পাত্রীর বুড়ি পিসীমা জ্বরে ধুঁকছিল বিছানায় শুয়ে। সেই পিসীমাই জ্বর নিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল।

নিতাই বসাক বললে—থাক থাক, আপনাকে উঠতে হবে না কষ্ট করে—

বুড়ো মানুষ বটে, কিন্তু টাকা ছিল বুড়ির। সেই টাকার জন্যেই গ্রামের লোকজন এসে জুটেছিল তারাই পরিবেশন করলে। তারাই সমস্ত আয়োজন-আপ্যায়ন করলে শেষপর্যন্ত। একটু রাত হল বটে, কিন্তু কাউকে অভুক্ত ফিরতে হল না। শেষ পর্যন্ত সবাই লুচি, বেগুন ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, মাছের কালিয়া, চাটনি, দই মিষ্টি খেয়ে পান চিবোতে লাগল। শোবার বন্দোবস্ততেও কোনও ত্রুটি হয় নি কোথাও। কোথা থেকে বালিশ, বিছানা, তোশক, মাদুর সব যোগাড় হয়ে গেল। কারো কোনও অসুবিধেই হল না।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হল দুলাল সা'। নিশ্চিত হল নিতাই বসাক।

আরো বেশি করে সবাই নিশ্চিন্ত হল বউ দেখে। একেবারে দুর্গা প্রতিমা।

ছোট মেয়ে দেখেই পছন্দ করেছিল দুলাল সা'। একেবারে ছোট বয়েস থেকেই এসে দুলাল সা'র সংসারের ভার মাথায় তুলে নেবে। বাপ নেই। মাও কিছুদিন আগে মারা গেছে। শুধু এই নাতনীটির বিয়ে দেবার জন্যেই দিদিমা বুড়ো হাড় নিয়ে বেঁচে ছিল।

দোলগোবিন্দ বলেছিল—মেয়ে পাবেন আর সম্পত্তিও পাবেন। ওই দিদিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলের হাতেই বর্তাবে—

বিজয়ও তখন ছোট। বড় মানিয়েছিল তার সঙ্গে নতুন-বৌকে।

পরের দিন নৌকো যখন তৈরি হয়েছে তখন দোলগোবিন্দ এসে হাজির।

নিতাই বসাক তাকে দেখে অগ্নিশর্মা। এই মারে তো সেই মারে।

বললে—তুমি কোথায় ছিলে দোলগোবিন্দ ? তুমি কোথায় পালালে আমাদের ফেলে ?

দোলগোবিন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে—পালাব কেন আমি বসাক মশাই ? আমার পাওনা-গণ্ডা না নিয়েই পালাব ? আপনি বলছেন কি ?

—তাহলে তোমার সারারাত টিকি দেখতে পেলাম না যে ?

দোলগোবিন্দ বললে—তাহলে ওগুলো খেলেন কি ? এতগুলো লোকের খাবার ব্যবস্থা করলে কে ?

—তুমিই সব করলে নাকি ?

—আজ্ঞে, সম্বন্ধ করে দিয়েই পালাব তেমনি ঘটক পান নি

আমাকে বসাক মশাই। পিসীমার ঠিক দিন বুঝেই যে অসুখ হয়ে গেল, নইলে আমি ভাবতাম ?

তা দোলগোবিন্দও বর-কনের সঙ্গে কেষ্টগঞ্জে এসেছিল। এসেও কিন্তু তার উৎকণ্ঠা কমে না। যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো, সদানন্দ বাবু কোথায় গেল ? সেই পাটের আড়তের সদানন্দ ?

কেউ বললে—আছে এখানেই কোথাও—

সদানন্দ এমন কেউ নয় এ-বাড়ির যে, সে না হলে লোকজন উপোস করবে। সুতরাং তার খবর রাখবার কথা নয় কারো। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। দোলগোবিন্দর কোনও কাজই নেই। বৌভাত চুকে গেলেই তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবে নিতাই বসাক। সমস্ত দিন দম্ ভরে তামাক খেয়ে বেড়ালেই হয়। যজ্ঞি-বাড়িতে এসে আর কী করবে সে ?

কিন্তু বৌভাত মিটে গেল, তখনও উৎকণ্ঠা কমে না। তখনও সদানন্দকে খুঁজে বেড়ায়। শেষে অনেক রাত্রে যখন সবাই খেয়ে-দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাড়ি চলে গেছে, বর-কনে বাসরঘরে ঢুকেছে, তখনও দোলগোবিন্দ চারিদিকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।—হ্যাঁ গো, সদানন্দকে দেখেছ তোমরা কেউ ? সদানন্দকে ?

নিতাই বসাককে কে একজন খবর দিলে। বললে—ঘটক-মশাই কেমন আবোল-তাবোল বকছে—

বাইরে তখন কেউ নেই। এঁটো কলাপাতার ডাঁই পড়ে আছে রাস্তার ওপর। যে-যেখানে পেরেছে সারাদিন খাটুনির পর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সানাই-ওয়ালারাও মাচার ওপর ঘুমে অচেতন। নীচে ক'টা ঘেয়ো কুকুর কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে এঁটো কাঁটা নিয়ে। তারই মধ্যে দোলগোবিন্দ আপন মনেই বিড়বিড় করেই বকছে—সদানন্দ কোথায় গো, সদানন্দ কোথায় ?

অন্ধকার নির্জন আবহাওয়ায় দোলগোবিন্দর সেই অস্পষ্ট কথাগুলোও যেন বড় তীক্ষ্ণ হয়ে বাতাসের বুকে গিয়ে বিঁধছে।

—আমাদের সদানন্দকে দেখেছ? সদানন্দ?

নিতাই বসাক গিয়ে ধমক দিলে—কি গো দোলগোবিন্দ, কি বলছ মনে মনে?

—আজ্ঞে?

—বলি, কি বলছ তুমি মনে মনে?

দোলগোবিন্দর চোখে তখন নেশার ঘোর লেগেছে যেন।

নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললে—সদানন্দকে দেখেছ তুমি? সদানন্দকে?

নিতাই বসাকের তখনি সন্দেহ হল।

জিজ্ঞেস করলে—নেশা করেছ নাকি, ও দোলগোবিন্দ, নেশা করেছ তুমি? আমাকে চিনতে পারছ না তুমি? আমি নিতাই বসাক—

দোলগোবিন্দর তখন যেন এক মুহূর্তের জন্যে একটু চেতনা ফিরে এল, কিন্তু আবার তারপরই বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল—

নিতাই বসাক আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি খেয়েছ?

—সদানন্দকে দেখেছ তুমি? সদানন্দকে?

এ যেন এক অনন্ত প্রশ্ন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দোলগোবিন্দকে। সারা জগৎ জুড়ে তার কাছে যেন আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। শুধু সদানন্দ আর সদানন্দ। সদানন্দই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক এবং আদি সত্য। দোলগোবিন্দর কাছে আর সমস্ত মিথ্যে, আর সমস্ত অহেতুক, আর সমস্ত নিরর্থক। তারপর নিতাই বসাকও আর দাঁড়াল না সেখানে।

পাগলের সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলে কোনও লাভ নেই। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল এক দিনেই। এই সেদিনও বেশ ছিল।

কথা বার্তা বলেছে, পাওনা গণ্ডা নিয়ে দর বাড়িয়েছে, কমিয়েছে, আর সেই বৌভাতের রাত্রি থেকেই যেন অন্য-মানুষ হয়ে গেল।

নিতাই বসাকও তখন বাড়ির ভেতরে গিয়ে নিজের শোবার বন্দোবস্ত করে নিলে।

তার পরদিন সকাল থেকেই কেষ্টগঞ্জের লোক দেখতে পেলে। লোকটা সারারাত ঘুমোয় নি। চোখ দুটো লাল। প্রথম দিন পায়ে জুতো ছিল। হাতে ছাতাটাও ছিল। গায়ে একটা জামাও ছিল। সারাদিন এখানে-ওখানে ঘুরতে লাগল। তার পর দিন ঘাটের কাছে। সেই মুখের বিড়-বিড় শব্দ। সদানন্দ আছে? সদানন্দ?···

তার পরদিন থেকে আস্তে আস্তে চেহারাটা আরও শুকিয়ে আসতে লাগল। মুখের দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরোতে লাগল। পায়ের জুতোটা আর নেই। ক্রমে জামাটাও ছিঁড়ে আসতে লাগল। সমস্ত দিনরাত সেই এক বিড় বিড় শব্দ। সদানন্দর নামটাই যেন জপমালা করে ফেললে দোলগোবিন্দ। দোলগোবিন্দকে দেখলে লোকে আর গ্রাহ্য করত না আগের মতন। সেও কারো দিকে চাইত না। সে-ও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বিড় বিড় করে চলত।

সদানন্দ যেদিন ছুটির পর গদিতে এসে আবার মাল গুণতে লাগল, সেদিন অনেকে বললে—কি হে সদানন্দ, দোলগোবিন্দ তোমায় খোঁজে কেন?

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল।

বললে—দোলগোবিন্দ কে ?

—দোলগোবিন্দ পরামাণিক।

তবু সদানন্দ চিনতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—কে দোলগোবিন্দ পরামাণিক ? কোথায় বাড়ি ? তা কে জানে ? ঘটক ঘটকই ঘটকের আবার বাড়ির খবর কে রেখেছে ?

—চিনতে পারলে না তুমি ?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে চিনব কি, ও নামই কখনও শুনি নি আমার বাপের জন্মে।

—কিন্তু এত লোক থাকতে তোমায় খোঁজ করে কেন হে ?

—তা আমি কি জানি কর্তা।

—তা তুমি একবার চল না, কথা বলবে তার সঙ্গে ?

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—আমার আর কাজ কম্ম নেই, আমি যাব যার তার সঙ্গে কথা বলতে ? আমার পাটের গাঁট কে গুণবে ?

শুধু একজন নয়। আরও অনেকেই এল সদানন্দের কাছে। সদানন্দ যে ছুটি থেকে ফিরে এসেছে তা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে এল দেখতে। সবাই ওই একই কথা বলে। সবার মুখেই ওই এক প্রশ্ন। আর কোনও লোকের নাম করছে না, শুধু সদানন্দের নাম। দোলগোবিন্দর চেহারা তখন আর চেনবার উপায় নেই। খালি গা, খালি পা। তেল না মেখে-মেখে মাথায় জটা হয়ে গেছে। দাড়িতে উকুন বাসা করেছে। তখন আঁস্তাকুড়েই ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে দোলগোবিন্দ। যা-তা খায়। কোমরে কাপড়ের ঠিক থাকে না।

সদানন্দ সকলের পীড়াপীড়িতে আর থাকতে পারলে না।

বললে—চল তাহলে দেখেই আসি—লোকটা কে ?

তারপর বললে—তোমরা ঠিক জানো আমার নাম করছে ?

—হ্যাঁ গো, তোমার নামই করছে—বলছে সদানন্দ কোথায়—

—তা ভগমানের রাজ্যিতে আমি ছাড়া আর কোনও সদানন্দ থাকতে নেই ?

তারপর একটু থেমে বললে—তা চল দেখেই আসি মজাটা—

সামনে এসে দাঁড়াল সদানন্দ।

রাস্তার এক পাশে একটা গাব গাছ। তারই তলায় ধুলোবালির ওপর তখন নোংরা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে আবোল-তাবোল বকছিল দোলগোবিন্দ। এতগুলো লোক সামনে আসতেও তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একমনে বিড়বিড় করে চলেছে—সদানন্দকে দেখেছ, সদানন্দ—

সদানন্দ এবার সামনে এগিয়ে গেল।

বললে—বলি, কাকে খুঁজছ গো তুমি ? খুঁজছ কাকে ? আমিই তো সদানন্দ, এই তো আমি এসেছি।

দোলগোবিন্দ সদানন্দর দিকে চাইলেও না। যেন জানতেও পারলে না কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

সদানন্দ সাহস করে আরও ঝুঁকে দাঁড়াল। বললে—ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমিই সদানন্দ, আমাকে খুঁজছ কেন ?

এতক্ষণে ঘোলাটে চোখ তুলে চাইল দোলগোবিন্দ।

বললে—সদানন্দকে দেখেছ, সদানন্দ ?

সদানন্দ বললে—আরে কি আশ্চর্য, আমিই তো সদানন্দ—আমাকে চেন তুমি ?

দোলগোবিন্দ তবু বিড় বিড় করছে—সদানন্দকে দেখেছ—সদানন্দ ?

—আরে, এ তো আচ্ছা পাগলের ডিম! এ কোত্থেকে এল কেষ্টগঞ্জে ?

নিরঞ্জন পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—আজ্ঞে, এই পাগলটাই তো সা'মশাই-এর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল—

সদানন্দ জিভ দিয়ে একটা চুকচুক আওয়াজ তুলল।

—আরে, এ যে একটা আস্ত পাগল। এই পাগলের কথায় ছেলের বিয়ে দিলে সা'মশাই ? ভূ-ভারতে আর ঘটক পেলে না ?

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—তা ভাল করে দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন তো ? আরে রাম রাম, ছেলের বিয়ে বলে কথা ! যার-তার কথায় বিয়ে দিলেই হল ! কুটুম কেমন ?

কুটুম আর কেমন ! দিয়েছে-থুয়েছে তো ভালই। তবে দুলাল সা' তো চায় নি কিছুই। দাবি-দাওয়া কিছুই ছিল না দুলাল সা'র। মেয়েটি ভাল লেগেছে চোখে। আর মেয়ে দেখতে যাবার আগেই ঠিক একটা তিসির অর্ডার এসেছিল হাজার দশেক টাকার। লক্ষণটা ভাল।

আর ছেলের বিয়ের পর থেকেই যেন কোথা থেকে আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসতে লাগল কারবারে। পয়মন্ত বউ না হলে কি এমন হয় ?

সদানন্দ বললে—ভাল হলেই ভাল রে বাবা ! আবার অতি ভালর গলায় দড়িও তো পড়ে—

তা সে-সব কথায় আর কেউ সায় দেয় নি। ' সা'মশাই খাইয়েছে ভাল, বউ ভাল হয়েছে, আর কি চাই ? এখন ভবিতব্য। ভবিতব্য-র হাত তো কেউ এড়াতে পারবে না ? তুমি ভাল ঘরে ছেলের বিয়ে দিলে, তারপর মেয়ের বাপের বাড়ি ঝেঁটিয়ে লোক এসে জুটল তোমার ঘাড়ে। তখন ?

—মেয়ের বাপ-মা ?

—বাপ-মা নেই, এক পিসীমা আছে, তাও আজ আছে কাল নেই এমনি অবস্থা—

সদানন্দ যেন নিজের মনেই বলতে লাগল—কে জানে বাবা, বংশ-টংশ দেখে বিয়ে দিয়েছেন কি না সা'মশাই, আমার তো ভয় করছে হে—

—তা ছেলের বিয়ে যখন দিয়েছে, তখন কি আর দেখে দেয় নি সা'মশাই ?

—কে জানে ভাই, আমার তো ভয় করছে। শেষ চাঁড়াল-ফাঁড়াল না হয়—

বলে আর দাঁড়াল না সদানন্দ। সেখান থেকে চলে গেল নিজের কাজে। দোলগোবিন্দ তখনও সেখানে বসে বসে বিড় বিড় করছে—সদানন্দ আছে, সদানন্দ—

যতদিন দোলগোবিন্দ ছিল কেষ্টগঞ্জে ততদিন ওইটেই ছিল তার বাঁধা বুলি। কথাটা কেমন করে নিতাই বসাকের কানে গেল একদিন। সংসারে একজনের কথা আর একজনের কানে তোলবার লোকের অভাব হয় না কখনও। সদানন্দর কথাটা তখন রং চড়িয়ে চড়িয়ে সেটার অন্য চেহারা দাঁড়িয়েছে।

নিতাই বসাক একদিন ডেকেই পাঠালে সদানন্দকে।

সদানন্দ আসতেই নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করলে—বলি, সদানন্দ, তোমার কি চাকরি-বাকরি করার ইচ্ছে নেই ?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে, চাকরি না করলে খাব কি ?

—তা, সে-কথাটা সব সময় মনে থাকে না বুঝি ?

—আজ্ঞে, মনে না থাকলে চাকরি করছি কেন ?

নিতাই বসাক সদানন্দের আগা-পাশ-তলা একবার ভাল করে দেখে নিলে। তারপর বললে—খুব বেয়াদপি হয়েছে তোমার, না ?

—আমার বেয়াদপিটা কোথায় দেখলেন বসাক মশাই ?

নিতাই বসাক ধমক দিয়ে উঠল—চোপ্‌রাও—চাবকে তোমায় লাল করে দেব, তা জান ?

সদানন্দর মুখ দিয়ে অনেক কথা বেরোতে পারত, কিন্তু সময় মত সামলে নিলে সে।

নিতাই বসাক বলতে লাগল—কি সব বলে বেড়াচ্ছ শুনি নতুন-বৌ-এর নামে ? আমার কানে কিছু যায় না ভেবেছ ?

সদানন্দ মুখ নীচু করে বললে—আজ্ঞে, আমি তো কিছু বলি নি—

—কিছু না বললে আমার কানে এল কেন কথাটা ? দেশশুদ্ধু লোকের সামনে তুমি যে নতুন-বৌ-এর নামে এ-সব বলে বেড়াচ্ছ, এখন যদি দুলালের কানে যায় ? তখন তোমার চাকরি কোথায় থাকবে শুনি ? চাকরি থাকবে ?

এর উত্তরে সদানন্দ কিছুই বলে নি সেদিন। নিতাই বলেছিল—যাও, দুলালের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে এস, যাও—

দুলাল সা'র পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাতেই দুলাল সা' বলেছিল—এই যে বাবা, মনে মনে তোমার অনুতাপ হয়েছে তাতেই আমি খুশী। আরে তাই তো আমি সবাইকে বলি, আমি যদি আমার নিজের ক্ষতি না করি তো সদানন্দের সাধ্যি কি আমার ক্ষতি করে সে—

তারপর সদানন্দের চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল—এত লোক থাকতে তুমি আমার ক্ষতি কেন করবে সদানন্দ ? আমি কি তোমার কিছু ক্ষতি করেছি যে আমার পাকা ধানে তুমি মই দেবে ?

তারপর কান্তর দিকে চেয়ে বললে—ওরে কান্ত, ছাখ্ ছাখ্ এই সদানন্দের দিকে চেয়ে ছাখ্, চোখ দুটো কেমন ছল ছল করছে ওর, চেয়ে ছাখ্—

আগে চোখ দুটো ছল ছল করছিল না সদানন্দর। কিন্তু দুলাল সা'র কথাতেই যেন সত্যি সত্যি ছল ছল করে উঠল। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে।

দুলাল সা' সেটা লক্ষ্য করলে। তারপর বললে—কাঁদ বাবা, কাঁদ তুই। একটু কেঁদে নে, একটু যদি বুক ভরে ভাল করে কাঁদতে পারিস তো তাতেও তোর মঙ্গল রে। তাতেও তোর ভাল হবে। কাঁদ, আহা, তোকে কাঁদতে দেখেও ভাল লাগছে বড় রে—তোর মনের সব গ্লানি কেটে গেল, তুই বেঁচে গেলি রে—

তারপর কি বলতে এসেছিল সদানন্দ আর কি-বা বলে গেল, দুলাল সা'র সামনে গিয়ে কিছুই আর খেয়াল রইল না। দুলাল সা'কে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়াও হল না। সদানন্দ দেখে অবাক হয়ে গেল, নতুন-বৌ এসে দুলাল সা'র কোন ক্ষতি হল না। বরং দিন-দিন উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। বাড়-বাড়ন্ত হতে লাগল। পাটের গাঁটের রপ্তানি বাড়তে লাগল। সব দিক থেকে পয়সা আসতে লাগল দুলাল সা'র সিন্দুকে। দুলাল সা'র ছেলে বিজয় ডাক্তারি পাস করল। বিজয় জলপানি পেলে। দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল দুলাল সা' আর নিতাই বসাক।

নিতাই বসাককে চুপি চুপি বলে দিলে দুলাল সা'—সদানন্দর মাইনে দু' টাকা বাড়িয়ে দাও তুমি—

নিতাই বসাক বললে—কেন? ওই পাজি হারামজাদাকে তুমি মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছ?

—আরে বাড়িয়ে দাও না তুমি।

—তবে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?

—ভয় পাওয়ার কথা নয়, লোকটাকে মোদ্দা ক্ষেপিয়ে দিও না, ক্ষেপলে ঘরের বেরালও বন-বেরাল হয়ে ওঠে।

তা সেই সতেরো টাকা বেড়ে তিরিশ হল। তিরিশ বেড়ে হল চল্লিশ।

কিন্তু তাতেও খুশী নয় সদানন্দ। বলতে গেলে কিছুতেই খুশী হবার লোকই নয় সদানন্দ। খুশী হবেই বা কি করে? দিন দিন তুলাল সা'র অবস্থার উন্নতি হতে থাকলে কেউ খুশী থাকতে পারে? সেই তুলাল সা'র পুত্রবধূ যেন মা-লক্ষ্মী হয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে। সে আসার পর থেকেই রমারম অবস্থা তুলাল সা'র। তুলাল সা'র ছেলে বিলেতে গেল। সেখান থেকেও ভাল খবর আসে।

কেন এমন হল? এমন তো হবার কথা নয়।

সদানন্দ তখন ম্যানেজার হয়েছে নিতাই বসাকের। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে কুলি খাটাবার কাজ পেয়েছে। রাতারাতি বেড়া দিয়ে বাঁওড়টা ঘিরে দিতে হবে এই হুকুম তার ওপর। কিন্তু মনে শান্তি নেই এক তিল। মনের মধ্যে কেবল খচ্‌খচ্‌ করে কি যেন বেঁধে। দোলগোবিন্দ বেটা কি তাকে সত্যি সত্যিই ভেল্‌কি দেখালে?

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক যেন ধূমকেতু হয়ে উদয় হয়েছিল সদানন্দের জীবনে।

নইলে অমন জল-জ্যান্ত মানুষটাই বা বলা-নেই কওয়া-নেই পাগল হয়ে যাবে কেন?

আর পাগল বলে পাগল!

শেষের দিকে তার দিকে আর চাওয়া যেত না। বিড় বিড় করে তখনও কেবল বলত—সদানন্দ আছে সদানন্দ—

তা তুলাল সা'ই বোধহয় অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে খবরাখবর দিয়েছিল তার দেশে। বড়-চাতরাতে। সেখান থেকে লোক এল। দূর-সম্পর্কের শালা না কে যেন।

দুলাল সা' জিজ্ঞেস করলে,—এই তোমার ভগ্নীপতি? ভালো করে চেয়ে দেখ চিনতে পার কি না—

লোকটা দেখলে ভাল করে। তারপর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ইনিই আমার ভগ্নীপতি—দোলগোবিন্দ প্রামাণিক—পেশা ছিল ঘটকালী—

— তা তোমাদের বংশে কারো পাগলের ব্যামো ছিল?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে পাগল হল কেন?

তা কি আর কেউ বলতে পারে।

দুলাল সা' টাকাকড়ি দিলে। পাওনা-গণ্ডা যা হয়েছিল তাও মিটিয়ে দিলে শালার হাতে। আর তার ওপরও কিছু দিলে খুশী হয়ে। বললে—তোমার ভগ্নীপতিই আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল, আমার নতুন-বৌমাও খুব মনের মত হয়েছে আমার—আমার যথাসাধ্য তোমাকে দিলাম, এখন চিকিৎসা করে দেখ, যদি ভাল হয়—

সেই যে দোলগোবিন্দ গেল, তারপর থেকে আর তার কোনও খবর নেই, খবর রাখার কেউ দরকারই মনে করে নি।

কিন্তু মনে রেখেছিল এক সদানন্দ।

সেই সদানন্দও' হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর সমস্ত প্রসঙ্গটাই চিরকালের মত একেবারে চাপা পড়ে গেল। অন্তত সেই রকমই নিতাই বসাকের ধারণা। দুলাল সা'ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

আর ওদিকে তখন কর্তামশাই-এর খবরটা এমন করে ছড়িয়ে পড়েছে যে সদানন্দর কথাটা ভাববারও কারো সময় নেই। সমস্ত কেষ্টগঞ্জটাই যেন হরতনের কথা নিয়ে মেতে উঠেছে। ওদিকে বি ডি-ও সুকান্ত রায় থেকে শুরু করে হলধর পর্যন্ত সকলের মুখেই

ওই একই কথা। সাধুর কথা ফলেছে গো। এতদিনের হারানো নাতনী আবার নাকি কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসছে।

কেষ্টগঞ্জের রেল-স্টেশনে সেদিন গ্রাম ঝেঁটিয়ে সবাই গিয়ে হাজির হল। সকাল দশটার ট্রেনেই আসবার কথা, ছ'টা থেকেই আর লোক ধরে না প্ল্যাটফরমে। গিজ গিজ করছে লোক। নিবারণ সরকার আসছে, কর্তামশাই আসছে, আর আসছে হরতন।

ছ'টা বাজল, সাড়ে ছ'টা বাজল, দশটা বাজল।

ট্রেন বুঝি লেট ছিল, শেষকালে সাড়ে দশটার সময় ট্রেন এসে পৌঁছল। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। এসেছে—এসেছে। জানলায় নিবারণ সরকারের মুখটা দেখা গেছে। সবাই রে-রে করে দৌড়ে গেল কামরাটার দিকে। ট্রেন না থামতেই সবাই গিয়ে হামলা করছে, সরে যাও, সরে যাও সব, পথ ছাড়, পথ ছাড়, দেখতে দাও—

স্টেশন-মাস্টার মশাই বুঝি আর কৌতূহল দমন করতে পারে নি। লাল পাখাটা উঁচু করে ধরে একবার ঝুঁকে দেখলে। ড্রাইভার যেন ট্রেন ছেড়ে না দেয়। খুব হুঁশিয়ার, আগের থেকে খবর দেওয়া ছিল, হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচারের ব্যবস্থাও হয়েছে। অসুস্থ নাতনীকে ট্রেন থেকেই একেবারে শুইয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। হৈ-চৈ গোলমাল যেন না হয়। ভুগে ভুগে হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে, একবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারলে হয়, তখন সবাই ভালো করে দেখ, এখন পথ ছাড়। রাস্তা দাও এখন, ট্রেন এখুনি ছেড়ে দেবে, হুঁশিয়ার।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হরতন এসেছে হরতন। হরতনকে দেখবার জন্যে গ্রামের আর কেউ বাকি নেই। সবাই কাজ-কর্ম ফেলে ছুটে এসেছে।

কেষ্টগঞ্জ এমনই একটা জায়গা যেখানে সচরাচর কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে না। এখানে ইছামতী নদীর মতই একঘেয়ে জীবন একটানা স্রোতে বয়ে চলে। এখানে জীবন যেমন মন্থর, মৃত্যুও তেমনি ম্রিয়মাণ। হঠাৎ যদি কোনও দিন ইছামতীর জলে কুমীর ভেসে ওঠে তাই নিয়েই এখানকার মানুষ এক মাস সময় বেশ কাটিয়ে দেয়। হঠাৎ যদি কোনও বছর বৃষ্টি হয়ে রাস্তা-ঘাট-মাঠ-ক্ষেত ভাসিয়ে দেয় তো সেই বৃষ্টি নিয়েই লোকে সারাটা বর্ষাকাল সময় কাটাবার খোরাক পায়।

কিন্তু রোজ-রোজ তো এমন ঘটনা ঘটে না!

নদীতে কুমীর উঠেছিল কবে সেই পঞ্চাশ বছর আগে। কুমীর এসে নন্দ হাজরার বউকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নদীর গর্ভে। নন্দ হাজরার বউ বাঁচে নি। কিন্তু বেঁচে ছিল পেতলের ঘড়াখানা। কাঁকালে ঘড়া নিয়ে নন্দর বউ নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। তারপর স্নান সেরে পেতলের ঘড়ায় জল ভর্তি করে কাঁকালে ঘড়াখানাকে নিয়ে ডাঙায় উঠছিল, এমন সময় কুমীরটা সোজা টিপ করে ঘড়ায় দিয়েছিল এক কামড়। ঘড়ার সঙ্গে সঙ্গে বউটাও পড়ে গিয়েছিল ডাঙার ওপর। তারপর কুমীরটা বউটাকে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল দাঁত-বসান ঘড়াটাকে। নন্দ হাজরার ছেলেরা এখনও সেই ফুটো ঘড়াটাকে রেখে দিয়েছে যত্ন করে। লোককে দেখায় এখনও। বলে—এই দেখ, সেই ঘড়ায় কুমীরের দাঁতের ফুটো—

তারপর যেবার বর্ষা হল উপর্ঝরণ, সেও অনেক দিনের কথা।

পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে কতখানি জল উঠেছিল, রেলের পুলটা কতখানি ডুবে গিয়েছিল, মালোপাড়ার মালোরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে কেমন করে ইছামতীর বাঁধের ওপর গিয়ে রাত কাটিয়েছিল, সে-সব গল্প রসিয়ে রসিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক লোককে বলেছে কেষ্টগঞ্জের লোকেরা।

এ-সব ক্বচিৎ-কদাচিৎ !

ওই যেমন দুলাল সা'র বাড়িতে সাধু আসা। এসে সাধুর ভূত-ভবিষ্যৎ বলা। সে-ও বলতে গেলে কেষ্টগঞ্জের লোকের কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন আর কোনও কিছুই তেমন ঘটে নি যা নিয়ে কেষ্টগঞ্জের লোক বেশ গোল হয়ে বসে জাবর কাটতে পারে। যা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে ভাত হজম হয়।

কিন্তু এবার তাই-ই হয়েছে। এবার কেষ্টগঞ্জের মানুষ আবার আলোচনা করবার মত মুখরোচক খবর পেয়েছে।

তা খবর শুধু শুনেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সরেজমিনে না দেখলে আর মজাটা কি হল !

আর লোকও কি একটা ? দলে দলে সব আসে আর উঁকি মেরে দেখে। একটুখানি দেখলে আশ মেটে না। বাপ দেখে তো ছেলে দেখে যায় পরে। ছেলে দেখে তো বোনও দেখতে আসে। তারপর এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে তাদের আত্মীয়-কুটুম্বরা পর্যন্ত দেখতে আসে। গরুর গাড়ি ভাড়া করে গাঁটের কড়ি খরচ করে দেখতে আসে। ভটচায্যি-বাড়ির সামনে মেলা বসে যায় দর্শনার্থীর।

কীর্তীশ্বর ভটচায্যির বাড়িতে অনেক কাল আগে এমন আনা-গোনা ছিল লোকের। আবার এতকাল পরে সেই রকম হয়েছে।

দোতলার বড় ঘরখানাতেই হরতনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য নিজের ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন বিছানা, নতুন চাদর, নতুন বালিশের ওয়াড়—সব নতুন। বিছানার

পাশে হরতনের ওষুধ-পত্র, ফল-মূল রাখবার জন্যে টেবিল রেখে দিয়েছেন।

লোকেরা ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওই ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই অপলক দৃষ্টিতে দেখে।

বলে—আহা—

সাধারণতঃ ওই একটা শব্দই বেশির ভাগ লোকের মুখে বেরোয়। যাকে এতদিন হিসেবের বাইরেই রেখে দিয়েছিল তারা, তার পুনরাবির্ভাবে আনন্দ-উৎসব করা যেন বড় গর্হিত কাজ। এতদিন পরে তাকে পাওয়া যাওয়াতে, পাওয়ার আনন্দের চেয়ে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাটার কথাই যেন সকলের মনে বেশি করে পড়ছে। কর্তামশাইও সকলের বেদনার সঙ্গে নিজের বেদনা মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়ে নাতনীকে ফিরিয়ে পাওয়ার আনন্দ যেন ডবল করে উপভোগ করছেন।

কেউ কেউ বলে—দেখি, ভাল করে দেখি মা তোমাকে!

নিবারণ সরকারও বাধা দেয় না আজ। আহা! দেখুক! সবাই দেখুক হরতনকে। সবাই মন খুলে হরতনকে আশীর্বাদ করুক। কর্তামশাই-এর আনন্দের অংশ ভাগ করে ভোগ করুক সবাই। তবেই আবার ভট্টাচার্যি বংশের মঙ্গল হবে। তবেই আবার কেষ্টগঞ্জে কর্তামশাই-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। এই পনেরো বছর বড় হেনস্থা হয়েছে কর্তামশাই-এর। এই পনেরো বছরে দুলাল সা' আর নিতাই বসাক, দুজনে মিলে বড় অপমান করেছে কর্তামশাইকে। মনে বড় আঘাত পেয়েছেন কর্তামশাই। অকারণে কর্তামশাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন মোটরগাড়ি চড়েছে। কারণে-অকারণে গ্রামশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে গাওয়া ঘি-এ ভাজা লুচি খাইয়েছে। যাতে সেই গন্ধ এসে কর্তামশাই-এর নাকে লাগে। ছেলের বিলেত যাবার সময় কলকাতায় গিয়ে খবরের কাগজের লোকদের পয়সা

দিয়ে সেই খবর ছাপিয়েছে। এর কোনও প্রতিকারও ছিল না তখন। প্রতিকার করবার ক্ষমতাই ছিল না কর্তামশাই-এর। তিনি কেবল কান পেতে সব শুনেছেন, চোখ মেলে সব দেখেছেন, আর মনে মনে সব সহ্য করেছেন।

কিন্তু এখন? এবার?

—এখন কেমন লাগছে মা? কেমন বোধ করছ? একটু হাওয়া করব?

কর্তামশাই জীবনে কখনও কাউকে নিজের হাতে পাখার বাতাস করেন নি। বরাবর অন্য লোকের হাতে পাখার বাতাস খেয়ে এসেছেন। অথচ আজ আর কোনও কষ্টই হচ্ছে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে এখানে আসার পর এতদিন কেটে গেল তবু এতটুকু বিশ্রাম করবার অবসর পান নি। অথচ যেন ক্লান্তিও নেই তাঁর। সেই যে কলকাতায় একদিন নাতনীকে খুঁজে পেয়েছেন, তারপর থেকেই ক্লান্তি কাকে বলে তাও জানেন না, বিশ্রাম কাকে বলে তাও জানেন না।

নিবারণ বললে—আপনি সরুন কর্তামশাই, আমি বাতাস করছি—

—তুমি সরো—

বলে হটিয়ে দিয়েছিলেন নিবারণ সরকারকে। বললেন—তুমি সরো তো, পাখার বাতাস কি সবাই করতে পারে? দেখছ জ্বর রয়েছে—

হরতন বললে—আপনার কষ্ট হবে দাদু—

—দূর পাগলী,—কর্তামশাই হেসে উঠলেন—নাতনীকে বাতাস করতে কি দাদুর কষ্ট হয়? হয় না। তোর আবার যখন নাতনী হবে, তখন দেখবি—বলে যেমন বাতাস করছিলেন, তেমনি বাতাস করতেই লাগলেন।

তারপর নিবারণকে বললেন—তা তুমি এখানে হাঁদার মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে, তুমি যাও না, তোমার কাজ নেই ? তোমাকে বলেছিলাম যে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করতে—তা করেছ ?

শুধু ইলেকট্রিক নয়, অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে। হরতন যখন এসে গেছে তখন তো আর এই ভাঙা-চোরা বাড়িতে থাকা চলবে না। সমস্ত বাড়িখানাই রং করতে হবে। চুন-বালি খসে গেছে আগা-পাশ-তলার। বাড়ি তো ছোট নয়। এখন না হয় লোকজন নেই। কিন্তু এককালে তো লোকজন দাস-দাসী ঘোড়া-হাতী সবই ছিল। তখন যেমন পুজো ছিল, তেমনি ছিল নৈবিদ্যি। বড় বড় থাম-খিলেন বার-বাড়ি অন্দর-মহল সবই সেই রকমই আছে। শুধু বে-মেরামত অবস্থা। তা, সব আবার হবে। আবার এই দালানে-দালানে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলবে। এবার তেলের ঝাড়-লণ্ঠন নয়, ইলেকট্রিকের। ইলেকট্রিকের পাখা হবে। যেমন-যেমন আছে দুলাল সা'র বাড়িতে, সবই তেমনি হবে। সুইচ টিপলে আলো জ্বলবে, সুইচ টিপলে বন্-বন্ করে পাখা ঘুরবে।

এসব পরিকল্পনা সেই কলকাতা থেকেই করে ফেলেছেন কর্তামশাই।

তাই এসেই নিবারণকে পাঠিয়েছিলেন ইলেকট্রিক-মিস্ত্রীর কাছে। কেষ্টগঞ্জের রেল-বাজারে একজন নতুন ইলেকট্রিকের দোকান খুলেছিল। তাদেরই ডেকে এনেছিল নিবারণ।

তারা মাপ-জোপ করলে, দেখলে চারদিক ঘুরে ঘুরে। কর্তামশাই বলে দিলেন কোথায় আলোর ঝাড়-লণ্ঠন বসবে, কোথায়-কোথায় পাখা বসবে। সব বুঝিয়ে দিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

শেষে বললেন—পারবে তো তোমরা ঠিক, না কলকাতা থেকে মিস্ত্রী ডেকে আনব, খুলে বল—

—আজ্ঞে পারব না কেন ? পয়সা দিলে আমরাও কলকাতার

মিস্ত্রীদের মত কাজ করব, আর আমরাই তো সা' মশাই-এর বাড়িতে কাজ করেছি—সা' মশাই, নিতাই বসাক মশাই আমাদের কাজ দেখে খুশী হয়েছেন—

দুলাল সা'র নাম শুনেই চটে গেলেন কর্তামশাই।

বললেন—তবেই হয়েছে, তোমাদের দিয়ে তো কাজ হবে না বাপু—

—আজ্ঞে, কেন? পছন্দ না হলে আপনি দাম দেবেন না, কথা রইল।

কর্তামশাই বললেন—আরে না না, তা নয়, দুলাল সা'র বাড়ির কাজ আর আমার বাড়ির কাজ কি এক হল? এই তো সেদিনও দুলাল সা' রাস্তায় রাস্তায় ঘুনসী ফিরি করে বেড়াত, আমিই তো ওকে জমি দিয়েছি হরিসভা করতে, সেই জমির ওপরেই বাড়ি করেছে ও। ওরকম কাজ হলে আমার চলবে না হে! এ বনেদী বাড়ি, এ বাড়ি কেদারেশ্বর ভট্টচার্যির তৈরি, তিনি হাতীতে চড়ে রাজ-বাড়িতে নিত্য-পুজো করতে যেতেন—তুমি এ বাড়ির সঙ্গে দুলাল সা'র বাড়ির তুলনা করলে?

—আজ্ঞে, তুলনা তো আমি করি নি!

—তুলনা করলে, আবার বলছ তুলনা কর নি? তুমি তো বড় বেয়াদপ লোক দেখছি হে—তোমার বাড়ি কোথায়? দেশ? কি জাত? মাহিষ্য, না সদ্‌গোপ?

হেন-তেন সাত-সতেরো নানা কথা শুনিয়ে দিলেন তাকে কর্তামশাই। ভদ্রলোকের ছেলে, নতুন দোকান খুলেছিল ইলেকট্রিকের। ভেবেছিল, একটা নতুন মোটাদরের কাজ পেয়ে গেল বুঝি! কিন্তু সামান্য কথার বেচালে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল

তার সামনেই নিবারণের দিকে চেয়ে কর্তামশাই বললেন—কি সব যা-তা লোক তুমি আমদানী কর বল দিকি নি, ছাগল দিয়ে কি

আর ধান-মাড়ানো হয় ? তুমি কলকাতায় যেতে পারলে না ? কলকাতা থেকে মেকার-মিস্ত্রী আনতে পারলে না ? মেকার-মিস্ত্রী না হলে আমার বাড়িতে কাজ হয় কখনও ? এ কি তুলাল সা'র বাড়ি পেয়েছ যে তুটো ফন্-ফনে বাহারে জিনিস দিয়ে চোখ ভুলিয়ে দিলাম ? জান এ বনেদী বংশ—

এর পরে আর ভদ্রলোকের ছেলের দাঁড়ান চলে না। বেচারী সামনে থেকে চলে গিয়ে মানসম্ভ্রম যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু বাঁচাল।

নিবারণ সরকার বললে—আজ্ঞে, কলকাতার মিস্ত্রীরা অনেক টাকা চাইবে—

—তা, চাইলে দেব ! টাকার জন্যে কি কীর্তীশ্বর ভটচাযি কখনও পেছ-পা হয়েছে ? কত টাকা নেবে, শুনি ? হাজার, তু'হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার, না তারও বেশি ?

—আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারি নে—

—টাকার জন্যে তুমি কাজটি খারাপ করবে না নিবারণ, এইটি তোমায় আজ আমি বলে রাখলাম ! তুমি যাও, কলকাতায় গিয়ে সেরা মেকার-মিস্ত্রী সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

—আজ্ঞে, টাকা তো···

কর্তামশাই ধমকে উঠলেন—টাকা নেই ?

—ত'বিলে কিছু সামান্য টাকা ছিল, সেই তুলাল সা' কলকাতায় যাবার সময় দিয়েছিল···

কর্তামশাই বললেন—তা তাই নিয়েই যাও এখন, টাকার জন্যে কাজ খারাপ করবে না। মিস্ত্রী সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, সে দেখে যাবে আমার বাড়ি। আমার পছন্দমত কাজ করবে, তখন আমি খুশী হয়ে টাকা দেব। আমার কি টাকা নেই ভেবেছ ? তুলাল সা'র একলারই টাকা আছে ? আমার নেই ? তুমি কত টাকা চাও ?

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়তো কর্তামশাই-এর বকুনি শুনতে হত, কিন্তু তার আগেই ওপর থেকে ডাক এল। হরতন দাদুকে ডাকছে। বঙ্কু এসে খবরটা দিতেই কর্তামশাই থেমে গেলেন।

আর থাকতে পারলেন না। আজকাল হরতন-হরতন করে যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন। হরতনের নাম শুনলেই আর মাথার ঠিক থাকে না। সোজা ভেতর-বাড়িতে গেলেন।

তা তাই-ই হল। রাজমিস্ত্রী আগেই লেগেছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার কাজ তাদের। দিন-রাত কাজ করে।

কর্তামশাই বলে দিয়েছিলেন—পনেরো দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই, বুঝলে বাপু?

—আজ্ঞে পনেরো দিনের মধ্যে সবটা না হোক্, ভেতরটা আপনার পনেরো দিনের মধ্যেই শেষ করে দেব।

—আর বাইরেটা?

—বাইরেটা আরও ধরুন গিয়ে এক মাস।

—একমাস তো সময় দিতে পারব না বাপু, আমার হরতন এসেছে, তার অসুখ। এই অসুখ এইবার সারো-সারো, তখন যদি বাড়ির মেরামত শেষ না হয় তো কোথায় সে থাকবে? এই অসুখের পর উঠে ধুলো-বালি সহ্য হয় কারও? বল না, তোমরাই বল না—সহ্য হয় কারো?

তা সেই কথাই পাকা হল। দেরি করলে চলবে না কর্তামশাই-এর।

কর্তামশাই-এর চললেও হরতনের চলবে না। হরতনের অসুখ তো এই সেরে গেল বলে! আর ধর দিন দশেক। জ্বর এখন আছে বটে। তা জ্বর থাকবে না? এতদিন পেটে কি ওষুধ-বিষুধ কিছু পড়েছে? ফল-মূল কিছু খাইয়েছে চণ্ডীবাবু? এই দামী-দামী ওষুধ যোগাবে কোত্থেকে সে মানুষটা? তার কিসের দায়? সে মানুষটা যাত্রা-গান করে খায়। পেশা তার সেটা। দেখ না, মেয়েটাকে এতদিন না-খাইয়ে দাইয়ে কোথায় কোথায় ঘুরিয়েছে! কোথায় জোড়হাট, ডিব্রুগড়, কুচবিহার, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান। এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বসতে পায় নি, বিশ্রাম করতে পায় নি, নিয়ম করে খেতে পায় নি পর্যন্ত। কেবল রাত জেগে জেগে গান গেয়েছে আর শরীর খারাপ করেছে।

—ভগবানের দয়া মা, নইলে তোমাকেই বা আবার পনেরো বছর পরে খুঁজে পাব কেন, আর কোথা থেকে এক সাধুই বা এসে তোমার কুষ্ঠি দেখবে কেন? ভগবানই বাঁচিয়েছেন—

বড়গিন্নী সেই প্রথম দিনই দেখেছিলেন। যেদিন প্রথম নিয়ে এলেন কেষ্টগঞ্জে। গাড়ি তৈরি ছিল স্টেশনে। অসংখ্য মানুষের ভিড়।

—দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ, চিনতে পারছ?

বাড়িতে নিয়ে আসার পর প্রথমে আর কাউকে ঢুকতে দেন নি কর্তামশাই। একে নাতনীর শরীর খারাপ, তায় অত ভিড়। গাড়ি থেকে নামিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলতে হয়েছিল দোতলায়। বড় দুর্বল ছিল তখন হরতন। নিবারণ সরকার একদিকে ধরেছিল, আর একদিকে বঙ্কু।

বঙ্কুও সঙ্গে এসেছিল কলকাতা থেকে।

তা আসুক, দলে একজন জোয়ান ছোকরা থাকলে সুবিধেই হয়। ফাই-ফরমাস, দেখা-শোনা করতেও তো লোকের দরকার—

—ও কে ?

বড়গিন্নী চিনতে পারেন নি নতুন মুখ দেখে।

কর্তামশাই বলেছিলেন, ওর সামনে তোমায় লজ্জা করতে হবে না, ও ওদের যাত্রার দলে অ্যাক্টো করে—

বঙ্কুও সুযোগ বুঝে বড়গিন্নীর পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করেছিল।

—আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণ, হরতনের অসুখ হবার পর আমিই রূপকুমারীর পার্টটা করতাম, আমাকে আপনি আপনার নাতির মত দেখবেন। দিন্, শ্রীচরণের ধুলোটা দিন্—

বলে বঙ্কু বড়গিন্নীর দু'পায়ের তেলো থেকে ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে হাতটা মাথায় মুছে ফেলেছিল।

কিন্তু কর্তামশাই তখন বড়গিন্নীকে তাড়া দিচ্ছেন।

বললেন—চল চল, ওসব কথা পরে হবে, এখন নাতনীকে দেখবে চল—বাইরে ভিড় হয়ে গেছে, তারাও দেখতে আসবে—

হরতনকে তখন বিছানার ওপর শোয়ানো হয়েছে। দুর্বল শরীর। ভাল ওষুধপত্র কিছু পেটে পড়ে নি। চিৎপুরের অন্ধকার ঘুপসি ঘরের ভেতর থেকে তুলে এনেছেন। চণ্ডী অধিকারীবাবু না দিয়েছে একখানা ভাল শাড়ি, না একখানা ভাল জামা। মাথায় মাখবার মত ভাল তেলও দেয় নি কখনও। একখানা ভাল সাবানও দেয় নি। মাথা ভর্তি চুল হরতনের। সারা মাথায় যেন জটার মতন ছড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে একখানা কচি ফরসা মুখ। আর সেই মুখের ওপর কালো কুচকুচে একজোড়া চোখ।

—তুমি সেই বলতে বড্ড চুল মেয়েটার, সেই চুল এখন কি রকম হয়েছে দেখ। তবু যদি এক কৌটা তেল পড়ত তো আর দেখতে হত না।

—আর দেখেছ কি রকম হাড়-জির্‌জিরে করে দিয়েছে মেয়েটাকে, খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কাহিল করে দিয়েছে—

বঙ্কুও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

সে বললে—আজ্ঞে, চণ্ডীবাবু তো খেতে দিত না আমাদের, শুধু খেসারির ডাল আর ভাত খেয়ে দিন কাটিয়েছি, সঙ্গে কোনও দিন আলুভাতে···

—খেসারির ডাল! খেসারির ডাল খাইয়েছে হরতনকে? তা আগে বল নি তো তুমি আমাকে?

—আজ্ঞে খেসারির ডাল দিলে তবু তো কথা ছিল, তার সঙ্গে আবার ফ্যান্ মিশিয়ে বাড়িয়ে দিত। চণ্ডীবাবুকে কি কম কঞ্জুষ ভেবেছেন? আমরা যদি বলতে যেতাম তো চণ্ডীবাবু বলতেন, তোরা সব জমিদারের নাতি নাকি যে খেসারির ডাল খেতে পারিস না?

কর্তামশাই রেগে গেলেন। বললেন—তাই বল! ওই খেসারির ডাল খাইয়ে-খাইয়েই এই দশা করেছে মেয়েটার। কি সর্বনাশ! মুগের ডালের আর কতই বা দাম, মুগের ডাল দিলেই হত—

—হ্যাঁ, মুগের ডাল দেবে! মুগের ডালের দর কত তা জানেন?

কর্তামশাই বলেন—তা দরটা বড় হল, না শরীরটা? এই যে এখন এতগুলো টাকার ওষুধ কিনতে হচ্ছে, এখন? এখন কত খাবে খেসারির ডাল, খাও! এখন আমিও তোমাদের খেসারির ডাল খেতে দেব, খাবে?

বঙ্কু বললে—আজ্ঞে, খেসারির ডাল আর এ-জন্মে খাব না। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আমার—

কর্তামশাই বললেন—ছোটবেলায় আমি হরতনকে রোজ এক সের করে দুধ খাইয়েছি, তা জান? তখন আমার ঘরে গরু ছিল—

—দুধের কথা বলছেন, সেই যেবার উনিশ বছর আগে জোড়হাটে

আশ্বিনে-ঝড় হল, সেইবার ওখানকার জমিদার-বাড়িতে শেষ দুধ খেলাম, তারপর দুধ আর চোখে দেখি নি।

কর্তামশাই বললেন—যা খেলে শরীর ভাল হয় তা তো খাবে না তোমরা, কেবল যত সব খেসারির ডাল, তেলে-ভাজা, কচু-ঘেঁচু এই সব খাবে—

—আজ্ঞে, তেলে-ভাজা আমরা খুব খেয়েছি। হরতন আলুর-চপ, বেগুনি, ফুলুরি খেতে খুব ভালবাসত।

—তাই নাকি? ওই সব খেয়ে-খেয়েই তো এই হয়েছে!

তারপর নিবারণের দিকে ফিরে বললেন—নিবারণ, এই আজ থেকে নিয়ম করে দিলাম; তেলে-ভাজা এ বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঢুকতে পাবে না। তেলে-ভাজা যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছি তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, খবরদার—

নিবারণ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে—আজ্ঞে কর্তামশাই, আমার কি মাথাখারাপ, রুগীকে কি আমি তেলে-ভাজা খাওয়াতে পারি?

—আরে তা নয়, এখনকার কথা বলছি না। রোগ তো দুদিন বাদেই সেরে যাচ্ছে! আর দুটো মাত্র দিন! তারপর সেরে উঠে হরতন যে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে তেলে-ভাজা কিনে আনতে বলবে আর তুমিও আদর করে সেই বিষ কিনে আনবে, তা চলবে না।

—আজ্ঞে না, তাই কখনও আমি করতে পারি?

—না, এই তোমায় আমি বলে রাখলাম, তা চলবে না। আমার হুকুম। আমি যা কিনে আনতে বলব শুধু তাই কিনে আনবে।

—আজ্ঞে, তাই কিনে আনব।

—কিনে আনব বললে চলবে না, আগে শোন কি কি কিনে আনবে। এই ধর আঙ্গুর, বেদানা, পেস্তা, বাদাম, আপেল, কলা, ভাল পুরুষ্টু মর্তমান কলা—

বন্ধু বললে—আপেলের খুব দাম—

কর্তামশাই রেগে গেলেন—তা দাম বলে কি মনে করেছ আপেল খাবে না হরতন? আপেল না খেলে গায়ে রক্ত হবে কি করে? তুমিও আপেল খাবে, বুঝলে? তোমারও তো রোগা-প্যাটকা শরীর, তুমিও আপেল খাবে, আঙ্গুর খাবে, বেদানা খাবে, দুধ-ঘি মাখম খাবে—বুঝলে?

বলতে বলতে হঠাৎ নজর গেল বড়গিন্নীর দিকে। বড়গিন্নী তখন হরতনের বিছানার ওপর বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর তার চোখ দিয়ে গড়গড় করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—এ কি! কেঁদে ফেললে নাকি? কাঁদছ কেন বড়গিন্নী? এতদিন পরে নাতনী ফিরে পেলে, কোথায় আনন্দ করবে, তা নয় কাঁদছ! কেঁদে কি হরতনের অকল্যেণ করবে নাকি? চোখ মুছে ফেল, হাসো—

বড়গিন্নী আর থাকতে পারলে না। কথাটা শুনে বোধহয় আরও জোরে কান্না আসছিল। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে ফেললে। একদিন বড়গিন্নীর চোখের সামনেই নিজের পেটের জোয়ান ছেলে চলে গেছে, ছেলের বউও চলে গেছে। সেদিন সেই চূড়ান্ত শোকের সময়ও বোধহয় এত জল গড়ায় নি চোখ দিয়ে। আজ এই আনন্দের দিনে সেই চোখের জল তার সুদশুদ্ধ উশুল করে নিচ্ছে।

—বেশ ভাল করে দেখ, চিনতে পারছ তো নাতনীকে?

বড়গিন্নী চোখ থেকে আঁচল খুলে আবার হরতনের মাথায় হাত বুলোতে লাগল, আবার ভাল করে চোখ মেলে দেখতে লাগল।

—তখন তুমি বলতে হরতনকে লেখাপড়া শেখাবে, এখন শেখাও। এখন তোমার মনের যত সাধ সব মিটিয়ে নাও। ভাল ভাল জামা-কাপড় পরাও, ভাল ভাল খাবার-টাবার খাওয়াও, যা

মনে সাধ হয় সব মিটিয়ে নাও। যত টাকা লাগে সব আমি দেব—টাকার কথা ভেবনা। আর হরতন যখন একবার এসে গেছে, তখন হুড়হুড় করে টাকা আসবে—বড় বাড় বেড়েছিল দুলাল সা'র, বেটা চামারের একশেষ, ভেবেছিল, চিরকাল বুঝি আমার এই রকম দশা থাকবে—ওরে, তুই জানিস্ না, মুরগীর পেটে তেল হলে মোল্লার দোর দিয়েই রাস্তা। তোকে একদিন এই মোল্লার দরজাতেই আসতে হবে, এই বলে রাখলাম—

তারপর হঠাৎ বাইরের সিঁড়ির দিকে নজর পড়তেই বললেন—কে? কে ওখানে? কারা?

নিবারণ সরকার বললে—আজ্ঞে, মালোপাড়ার লোকজনেরা এসেছে হরতনকে দেখবে—

—তা দেখুক, এক-একজন করে দেখুক, বেশি ভিড় করে না যেন কেউ। সরো বড়গিন্নী, এখান থেকে সরো, তোমার নাতনী ফিরে এসেছে বলে গাঁ-শুদ্ধ সবাই আনন্দ করতে এসেছে, আর তুমি কি না কাঁদছ! হাসো, এখন থেকে তো তোমার হাসবার দিন এল গো—প্রাণ ভরে হাসো।

তা সেই কলকাতা থেকেই ইলেকট্রিকের মেকার-মিস্ত্রী এল। বাড়ি মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন আর চেনা যায় না ভট্টাচার্যি-বাড়িকে। যারা বুড়ো লোক, এই আশি-নব্বই বছর যাদের বয়েস, তারা চিনতে পারলে। ঠিক কর্তামশাই-এর বাবার আমলে এই রকম চেহারা ছিল এ-বাড়ির।

কর্তামশাই বললেন—তোমরা মেকার-মিস্ত্রী তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের চৌত্রিশ বছরের ফার্ম।

নিবারণ সরকার সঙ্গে ছিল।

বললে—আজ্ঞে এঁরাই লাটসাহেবের বাড়িতে কাজ-টাজ করে—

—তা ভাল। কর্তামশাই বললেন—আমার এ-বাড়িও এককালে লাটসাহেবের বাড়ির চেয়ে বড় বাড়ি ছিল—এখন আবার সারিয়েছি সতেরো হাজার টাকা খরচ করে। আমি চাই লাটসাহেবের বাড়িতে যেমন সব ইলেকট্রিকের কাজ আছে, সেই রকম কাজ হবে আমার বাড়িতে।

—তা, একবার দেখি জায়গাগুলো। কোন্ কোন্ জায়গায় আলো-পাখা বসবে—

—সব দেখাচ্ছে আমার সরকার। এই নিবারণ সরকারই আমার ম্যানেজার। লাটসাহেবের যেমন ম্যানেজার থাকে, এও আমার তাই। এই তোমাদের সব দেখিয়ে দেবে, দর-দস্তুর সব ম্যানেজারের সঙ্গেই হবে।

—বেশ!

—আর দেখ বাপু, টাকার জন্য যেন কাজ খারাপ না হয়। টাকা তোমাদের যত লাগবে সব আমি দেব। মানে, কাজটা আমার পছন্দ-মাফিক হওয়া চাই—

—সে আপনি দেখে নেবেন। কাজ আমাদের ফার্মের খারাপ হয় না।

নিবারণ তাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঘরগুলো দেখাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়ির আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারা যায়। গাড়ি আর ক'জনেরই বা আছে কেষ্টগঞ্জে। এক দুলাল সা'র গাড়ি, আর সুকান্ত রায়ের অফিসের জিপ্-গাড়ি। আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি কখনও এদিকে আসেন তো তাঁর গাড়ি।

—কে এল? যাকে-তাকে আসতে দিও না ভেতরে। বল আমি ব্যস্ত আছি, বুঝলে?

কিন্তু না। দুলাল সা'ই এসেছে। শুধু একলা নয়। সঙ্গে নিতাই বসাকও আছে। আর নতুন-বৌ।

দুলাল সা'র নাম শুনেই কিন্তু কর্তামশাই কেমন চিন্তায় পড়লেন।

বললেন—ও বেটা আবার এল কেন মরতে ?

—কি বলব ওদের, বলুন ?

কর্তামশাই কি ভেবে বললেন—আচ্ছা ডাক, ভেতরে ডেকে নিয়ে এস --

বলে কর্তামশাই চেয়ারখানাতে হেলান দিয়ে বসলেন। বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সত্যিই তিন জনে ঢুকল। দুলাল সা' প্রথমে, তারপর নিতাই বসাক। তারপর নতুন-বৌ।

কর্তামশাই পায়ের ওপর পা তুলে বসেই রইলেন। দুলাল সা' এসে সবিনয়ে সামনে দাঁড়াল। নিতাই বসাক পেছনে ছিল। সে-ও দুলালের পাশে এসে দাঁড়াল। নতুন-বৌ তাড়াতাড়ি এসে মাথায় ভাল করে ঘোমটা দিয়ে কর্তামশাই-এর পায়ের ধুলো নিলে।

—আমি আসতে পারি নি জ্যাঠামশাই, শুনলাম হরতন এসেছে, কোথায় সে ?

কর্তামশাই বললেন—ওপরে আছে, যাও দেখে এস গে—

দুলাল সা' সামনের চেয়ারটাতে বসল। নিতাই বসাকও তক্ত-পোশটার ওপরে বসে পড়ল।

দুলাল সা'ই প্রথম কথা বললে—কেমন আছে এখন হরতন ?

—ভাল।

কথাটা বলে কর্তামশাই একটু চুপ করে রইলেন। সামনেই ইলেকট্রিকের মিস্ত্রীরা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে চেয়ে বললেন —হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? যাও, আমার ম্যানেজারের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে সব দেখে-শুনে এস—

তারপর দুলাল সা'র দিকে ফিরে বললেন—তারপর কি খবর তোমাদের ?

দুলাল সা' মাথা নিচু করে সবিনয়ে বললে—আপনি আসা পর্যন্ত একবারও আসতে পারি নি, আমাদেরও খুব বিপদ চলছে কি না—

—বিপদ ? তোমার আবার কি বিপদ ?

—আজ্ঞে কর্তামশাই, সেই সদানন্দ, তাঁকে চিনতেন নিশ্চয়ই, সেই সদানন্দ হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। এতদিন ধরে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলাম, শেষকালে আমাকে ফাঁসালে—

কর্তামশাই অনেক দিন ধরে ভেবে রেখেছিলেন দুলাল সা' এলে কি কি কথা শোনাবেন। কি কথা কেমন ভাবে বলবেন। এত-দিনের সব অপমানের প্রতিশোধের কথাও ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু দুলাল সা'ও বোধহয় তৈরি হয়ে এসেছিল। দুলাল সা'ও জানত, কি কি কথা তাকে শুনতে হবে, কি কি কথা কর্তামশাই তাকে বলবেন।

—অথচ দেখুন কর্তামশাই আপনার দয়াতেই আমি এই কেষ্টগঞ্জে একটা মাথা গোঁজবার কুঁড়ে করতে পেরেছি। আপনি সেই জমি দিয়েছিলেন, তাতেই আমি আবার দাঁড়াতে পেরেছি কোনও রকমে। নইলে কি আমার মত লোক দাঁড়াতে পারে ?

কর্তামশাই ভাল করে চেয়ে দেখলেন দুলাল সা'র মুখের দিকে।

—তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করতে এলে দুলাল ?

দুলাল সা' জিভ কাটলে দাঁত দিয়ে। বললে—আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার মুখ যেন খসে যায় কর্তামশাই, আমি যেন পরকালে রৌরব নরকে পচি। আমি হরিকে সাক্ষী রেখে বলছি কর্তামশাই, আমি আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেই এসেছি।

এই নিতাইকে বলছিলাম আমি এতক্ষণ, টাকা-পয়সা সবকিছু হাতের ময়লা, আপনার আশীর্বাদে অনেক টাকা আমার হাত দিয়ে এল-গেল, কিন্তু তাতে মনের শান্তি পাই নি কর্তামশাই! আমার স্ত্রী মারা গেছে আজ কতকাল, একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছি, সকালবেলা উঠে রোজ নদীর ঘাটে গিয়ে নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে পৈঁঠে ধুই—কিছুতেই শান্তি পাই না। আপনি পুণ্যাত্মা মানুষ, আপনি গতজন্মে অনেক পুণ্য করেছিলেন, তাই আবার আপনার নাতনীকে ফিরে পেলেন, কিন্তু আমি কি পেয়েছি?

—তুমি বলছ কি? তুমি কিছুই পাও নি? তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ বল দিকি নি? আমিই বা কি ছিলাম আর কি হয়েছি তাও তোমার অজানা নেই।

দুলাল সা' হঠাৎ নীচু হয়ে কর্তামশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাল, তার পর হাতের আঙুলটা ভক্তি-ভরে জিভে ঠেকিয়ে আবার ভাল করে বসল।

বললে—আপনি ব্রাহ্মণ, কলিযুগ হলেও কেউটে সাপ কেউটে সাপই থাকে। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আমি ঠিক করেছি, আমি সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করব মনস্থ করেছি—

—সে কি?

দুলাল সা' বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই। আমি ভেবে দেখলাম, সংসারে থাকলে আমার মন ভগবানের দিকে ঠিকমত দিতে পারব না—আমি সংসার ত্যাগ করব ঠিক করেছি—

—তোমার ছেলে? তোমার পুত্রবধু? তারা? তারা কোথায় যাবে?

—তাদের কথা তারা ভাববে কর্তামশাই, আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি সংসারের জন্যে অনেক করেছি, কিন্তু সংসার তো আমার পরকাল দেখবে না। আমার পরকালের কথা তো

আমাকেই ভাবতে হবে—আমার হয়ে তো আর অন্য কেউ ভাববে না!

কর্তামশাই এতদিন ধরে দুলাল সা'কে দেখে আসছেন, তবু যেন কেমন সমস্যায় পড়লেন। এই এত জাঁক-জমক, এই এত বাড়ি-গাড়ি, এই এত ধান, চাল, পাট, তিসির আড়ৎ, এই সুগার-মিল সব ছেড়ে চলে যাবে দুলাল সা'! দুলাল সা'র চেহারার দিকে চেয়ে দেখলেন কর্তামশাই। সেই খালি-গা, সেই খালি-পা, সেই হাতে হরিনামের ঝোলা, কপালে তিলকের ফোঁটা, সব কি তাহলে সত্যি? এতদিন দুলাল সা' সম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা করে এসেছিলেন, সব তাহলে ভুল? সব মিথ্যে? সেই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে এত মারামারি-কাটাকাটি সবই স্বপ্ন নাকি? আসলে দুলাল সা' সত্যি-সত্যিই ভাল, সৎ মানুষ!

—আপনি আশীর্বাদ করুন কর্তামশাই, আপনার আশীর্বাদ ফলবে, আশীর্বাদ করুন যেন অন্তে শ্রীহরির চরণ-দর্শন পাই—

নিতাই বসাক এতক্ষণ চুপ করেই বসে ছিল।

বললে—আপনি একটু বলুন কর্তামশাই, আপনি বললেই দুলাল আবার সংসার করবে—ওর মন ফিরবে—

দুলাল সা' বললে—না কর্তামশাই, আমায় আর আপনি সংসার করতে বলবেন না, আশীর্বাদ করুন আমি যেন হাসিমুখে সংসার ত্যাগ করতে পারি। আমার এই চালের-ধানের-পাটের-তিসির আড়ৎ, আমার সুগার মিল, কোনও দিকেই আমার আর কোনও টান নেই।

কর্তামশাই বললেন—তা হঠাৎ তোমার এমন বেয়াড়া ইচ্ছেই বা হল কেন দুলাল?

—আজ্ঞে, হঠাৎ তো নয়, ক'দিন থেকেই গুরু আমাকে ডাকছেন, বলছেন, দুলাল, আমার কাছে চলে আয়, এখানে এলে শান্তি পাবি—

—তা, তুমি শান্তি পাচ্ছই না বা কেন ?

দুলাল সা' বললে—টাকা ছুঁলেই আমার হাত জ্বলে যায় কর্তা-মশাই—আমি যে কি করি—

—তাহলে তো তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত, টাকায় বিরাগ এসেছে, এটা তো ভাল কথা নয় ! তোমার সম্পত্তি-টম্পত্তি সব তো নষ্ট হয়ে যাবে।

দুলাল সা' এক রকম অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল।

বললে—সম্পত্তি তো বিষ কর্তামশাই, সংসার যেমন বিষ মনে হচ্ছে, সম্পত্তিও তেমনি বিষ মনে হচ্ছে আমার কাছে।

কর্তামশাই নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন নিতাই ? টাকাকে বিষ মনে হলে তো ভয়ের কথা হে—কোনদিন সত্যি-সত্যিই শেষকালে সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে যাবে, তখন মুশকিল হবে তোমাদের।

নিতাই বসাক বললে—আজ্ঞে, ডাক্তারকে দেখিয়েছি।

—কি বলছে ডাক্তার ?

—বলছে এ কিছু না, এ দুদিনের মধ্যে সেরে যাবে। বলছে আসলে এটা রোগ নয়, বাতিক।

—কোন্ ডাক্তার ? কোথাকার ডাক্তার ?

—আজ্ঞে এখানকার রমেন ডাক্তার নয়, খোদ কলকাতার ডাক্তার, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম যে দুলালকে। সেই জন্যেই তো আপনার সঙ্গে এ ক'দিন দেখা করতে পারি নি। আপনার নাতনীকে কেষ্টগঞ্জে নিয়ে এসেছেন, তাও শুনেছি, তবু দেখা করতে পারি নি—বড় ভাবনায় পড়েছি আমরা সবাই—

এতদিন ধরে সেই কথাই ভাবছিলেন কর্তামশাই। এত লোক দেখতে আসছে হরতনকে, অথচ দুলাল সা' তো একবারও এল না। নিতাই বসাকও এল না। ওদের নতুন-বৌও এল না। অথচ তিনি

যখন কলকাতায় ছিলেন তখন বড়গিন্নীকে এসে রোজই একবার করে দেখে গিয়েছে নতুন-বৌ। সমস্ত শুনেছেন তিনি নিবারণের কাছে। এতদিন কাউকে বলেন নি বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবতেন খুব। আজকে এখন কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে-মনে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন কর্তামশাই। একেই বলে ভাগ্যচক্র। দুলাল সা'র ভাগ্য এখন থেকে পড়তে শুরু করল আর তাঁর ভাগ্য এবার থেকে উঠবে। দুলাল সা'র পাটের আড়ৎ যাবে, সুগার-মিল যাবে। আর এদিকে তাঁর বাড়ি আবার নতুন হবে, ধনে-জনে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কেষ্টগঞ্জের লোক এখন যেমন দুলাল সা'র বাড়িতে যায়, তেমনি তখন আসবে তাঁর বাড়িতে।

বললেন—তা মহাজনী কারবার? সেটা এখনও করছ তুমি?

দুলাল সা' বললে—আগেকার খাতক যারা আছে তাদের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু নতুন খাতক আর নিচ্ছি নে—মন বারণ করছে।

—খাওয়া-দাওয়া? মাছ-মাংস খাচ্ছ?

—মাছ-মাংস তো আগেই ছেড়ে দিয়েছি সেই দীক্ষা নেবার সময়। আর ছুঁইনে ও-সব।

কর্তামশাই নিতাই বসাকের দিকে আবার চাইলেন।

বললেন—তা হলে তো সর্বনাশ, কি করবে ঠিক করেছ?

নিতাই বসাক বললে—সেই পরামর্শ করতেই তো আপনার কাছে দুলালকে নিয়ে এসেছি কর্তামশাই, আপনি কিছু ওকে পরামর্শ-টর্শ দিন।

কর্তামশাই বললেন—আমি এসব ব্যাপারে কি পরামর্শ দেব বল দিকি নি? আমি কি ও-সব বুঝি? আর আমার অত সময়ই বা কোথায়? এই দেখ না এখন হরতন এসেছে, এই বাড়ি নতুন করে সারিয়েছি, হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার কলকাতা

থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আনিয়েছি, এদেরও কত হাজার টাকা দিতে হবে তার ঠিক নেই—

নিতাই বসাক বললে—তা টাকার যদি দরকার থাকে তো বলুন না, দুলালের তো টাকা রয়েছে।

দুলাল সা'ও বললে—আজ্ঞে, টাকা তো এখন আমার কাছে খোলামকুচি, টাকাও যা মাটিও তাই আমার কাছে, অন্য লোকে লুটেপুটে খাবে, তার চেয়ে আপনার দরকার, আপনিই না হয় নিলেন—

কর্তামশাই একবার নিতাই বসাক আর একবার দুলাল সা'র দিকে চাইলেন। বললেন—টাকা তো নিতে পারি, কিন্তু শোধ করতে তো হবে আমাকেই, তখন কোত্থেকে শোধ করব ?

দুলাল সা' আর থাকতে পারলে না। কানে হাত দিলে। বললে —এসব কথা শোনাও পাপ কর্তামশাই। আমি অনেক অপরাধ করেছি কিন্তু এমন করে আর আমাকে অপরাধী করবেন না আপনি। আপনার পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় আপনি নিয়ে নিন, যা নিয়ে অত হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ তাও আমি আপনাকে ফেরত দিচ্ছি, যে-ক'টা টাকা আমার গেছে, তাও বুঝব না-হয় দণ্ডই দিলাম। আর তার ওপর যে সুগার-মিল করেছি আজ, তাও আপনাকে আমি দানপত্র করে দিয়ে দিচ্ছি—আপনি হাত পেতে নিলেই···'

দুলাল সা' পাগলের মত সব কথা গড় গড় করে বলে যাচ্ছে। যেন সত্যিই তার বৈরাগ্য এসেছে সংসারে। সত্যিই যেন এ-যাবৎ যত অপরাধ করেছে তার জন্যে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। এও কি সত্যিই সম্ভব ? এও তাহলে সংসারে ঘটে।

কর্তামশাই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে গেলেন দুলাল সা'র কথা শুনে। জয় মা মঙ্গলচণ্ডী ! জয় বাবা বিশ্বনাথ ! তোমার পায়ে অনেক দিন নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করেছি। অনেক কেঁদেছি মা লুকিয়ে

লুকিয়ে। আমার মনের দুঃখ বাইরের কেউ বোঝে নি মা। কেউ সে কথায় কান দেয় নি। এতদিনে বুঝি তুমিই শুনলে, এতদিনে বুঝি তুমিই আমার উপায় করে দিলে।

কর্তামশাই-এর পা দুটো থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। হাত দিয়ে পা দুটোকে চেপে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক এমনি অবস্থা তাঁর হয়েছিল হাওড়ার জুট-মিলে গিয়ে, যেদিন প্রথম হরতনকে পাওয়া গিয়েছিল। আজ এতদিন পরে যখন ভাবছেন, কেমন করে হরতনের চিকিৎসা হবে, কেমন করে এই বাড়ি আবার প্রাসাদ হয়ে উঠবে, তখন ভাগ্যের এ কি অভাবনীয় লীলা! সেই দুলাল সা' তাঁকে টাকা দেবে? তাঁর পৈঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা ফিরিয়ে দেবে? এ-সব কে করাচ্ছে? এ কার লীলা? এ লীলা দেখবেন বলেই কি এতদিন তিনি বেঁচে আছেন? তা হলে কি তাঁর ছেলে সিদ্ধেশ্বরও ফিরে আসবে? কেদারেশ্বর ভট্টাচার্যের বংশ আবার কি ধনে-জনে ভর-ভরাট হয়ে উঠবে? আবার হাতীশালে হাতী উঠবে, ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠবে? আবার দুর্গোৎসব হবে বাড়ির সামনের উঠোনে? আবার সামিয়ানা খাটানো হবে মাঠে, আবার 'নল-দময়ন্তী' পালা-যাত্রা হবে, মতি রায়ের দলের যাত্রা শুনতে দলে দলে হাজির হবে এসে কেষ্টগঞ্জের লোক? আবার তিনি চিৎকার করে উঠবেন এ্যায়ও—চোপ্—। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব গোলমাল থেমে যাবে তাঁর গলার আওয়াজে? আগে তাঁকে দেখে যেমন লোকে রাস্তার মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত, আবার সেই রকম প্রণাম করবে? আবার তিনি বলবেন—কি রে, কেমন আছিস্ রে জগা?

জগা বলবে—হুজুর, যেমন রেখেছেন—

—তোর জামাই কেমন আছে? বড় জামাই?

—আজ্ঞে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, সারছে না, পিলে বেড়েছে—

—পিলে বেড়েছে তো ডাক্তার দেখা।

—হুজুর, ডাক্তার-ওষুধের যে মেলা পয়সা লাগে।

—পয়সা নেই তোর ?

নিবারণ পাশেই থাকবে। নিবারণকে ডেকে বলবেন—নিবারণ, জগাকে কালই পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিও তো।

শুধু জগা কেন, কেষ্টগঞ্জের তাবৎ লোকে এসে সকাল থেকে তাঁর দরজায় ধর্ণা দেবে। যেমন আগে দিত। কখন কর্তামশাই ঘুম থেকে উঠে নীচেয় নামবেন, কখন দর্শন দেবেন, তাই ভেবেই তারা উদগ্রীব হয়ে থাকবে। তারপর তখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত লোকে-লোকারণ্য থাকবে বার-বাড়ি। সদর থেকে এস-ডি-ও আসবে কর্তামশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি দেখা করতে পারবেন না। সময় হবে না কর্তামশাই-এর। এস-ডি-ও-ই হোক্ আর কলকাতার মিনিস্টারই হোক্, তিনি কি তাঁদের চেয়ে কিছু কম নাকি ? দুলাল সা' যেমন মিনিস্টারকে ডেকে নিয়ে বাড়ির সামনে মিটিং করালে, দরকার হলে তিনিও তেমনি করাবেন। মিনিস্টারের সঙ্গে ফোটো তোলাবেন। সেই ছবি আবার কলকাতার খবরের কাগজে ছাপাবেন। তার পরে আজকাল তো রায়সাহেব রায়বাহাদুর ও-সব পাঠ উঠে গেছে। এখন পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ ভারত-রত্ন হয়েছে। ইচ্ছে হলে তারই মধ্যে একটা কিছু হবেন। কেষ্টগঞ্জে কোনও নতুন লোক এলে এই ভট্টাচার্যি-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে—এটা কার বাড়ি হে ?

পাশের লোকটা বলবে—কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যির বাড়ি।

—কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যি কে ?

—কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যির নাম শোন নি ? এঁরই পূর্বপুরুষ তো গৌড়েশ্বরের রাজপুরোহিত ছিলেন, রোজ হাতীর পিঠে চড়ে রাজবাড়িতে যেতেন গৃহবিগ্রহের পুজো করতে, রোজ একশো আটটা

পদ্মফুল দিয়ে পুজো হত ঠাকুরের। ইনিই তো এবার ভারত-রত্ন উপাধি পেয়েছেন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে।

আর হরতন?

হরতন তখন দৌড়তে দৌড়তে এসে কাছে দাঁড়াবে। বলবে—দাদু—

কর্তামশাই বলবেন—কি দাদু?

—আমায় একটা গাড়ি কিনে দাও দাদু, আমি মোটর চালাব।

সে হাতীর যুগ আর নেই এখন। এখন গাড়ির যুগ। একটা গাড়িও দরকার। এই এখান থেকে ওখান পর্যন্ত মস্ত এক গাড়ি কিনতে হবে হরতনের জন্যে। কেষ্টগঞ্জের রাস্তা এখন পিচ-বাঁধানো হয়েছে। বাস চলছে। স্টেশন থেকে একেবারে সোজা মুড়োগাছা পর্যন্ত বাস চলে। হরতনের পাশে বসে আছেন কর্তামশাই। দূরে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টার ওপর সুগার-মিলের বড় চিমনিটা দেখা যাচ্ছে। তার ওপর ধোঁয়া উঠছে। ওইখানে গিয়ে একবার নামবেন। দুলাল সা'কে যেমন সবাই সেলাম করে, তেমনি করে সবাই তাঁকে সেলাম করবে।

—কি খবর দরোয়ান, সব ঠিক আছে তো?

দরোয়ান বলবে—জী হুজুর—

ম্যানেজার এসে সামনে দাঁড়াবে।

—কাজকর্ম কেমন চলছে সব ম্যানেজার?

—আজ্ঞে, সব ঠিক চলছে।

এই রকম দু'-একটা খুচরো কাজ। একবার করে রোজই যেতে হবে মিল-এ। নিজে না দেখলে কি কাজ-কর্ম চলে? তিনি নিজে আর হরতন। হরতন সব সময়েই সঙ্গে থাকবে। তার পর হু হু করে চলে যাবেন মালোপাড়ার দিকে। কোনও কোনও দিন একেবারে মুড়োগাছা পর্যন্ত। মুড়োগাছার পর শ্রীনাথপুর।

শ্রীনাথপুরের পর ফতেহাবাদ। তারপর নদী। ইছামতী আবার বাঁক নিয়েছে দক্ষিণদিকে। সেখান থেকে সামনে চেয়ে দেখলে শুধু দেখা যাবে কাশক্ষেত। মাটির ওপর কাশক্ষেত আর মাথার ওপর আকাশ। শুধু আকাশ আর আকাশ। আকাশের পর···

—কর্তামশাই!

হঠাৎ চমক ভাঙল। চার দিকে চেয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। দুলাল সা' আর নিতাই বসাক দু'জনেই কখন চলে গেছে টের পান নি। শুধু নিবারণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর মেকার-মিস্ত্রী।

কর্তামশাই জিজ্ঞেস করলেন—দুলাল সা' কখন গেল?

—আজ্ঞে, তারা তো অনেকক্ষণ চলে গেছে—নতুন-বৌও হরতনকে দেখতে এসেছিলেন, তিনিও চলে গেছেন।

—কই, যাবার সময় আমাকে বলে গেল না তো?

—আজ্ঞে, বলেই তো চলে গেল। যাবার সময় আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল যে!

—ও, তাই নাকি?

কথাটা বলে নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন! তা হলে এতক্ষণ দুলাল সা' যা কিছু বলে গেল সমস্তই স্বপ্ন নাকি?

—আজ্ঞে, মিস্ত্রীরা বলছে ওরা সমস্ত এস্টিমেট্ পাঠাবে, তারপর এস্টিমেট্ দেখে আমরা মত্ দিলে ওরা কাজ করবে। এরা বলছে অন্ততঃ দশ হাজার টাকার মত পড়বে।

কর্তামশাই বললেন—তা পড়ুক, দশ হাজারই পড়ুক আর বিশ হাজারই পড়ুক, কাজ আমার ভাল হওয়া চাই, টাকার জন্যে কাজ খারাপ করা চলবে না তা বলে।

আরও কি কি সব কথা বলতে লাগল মিস্ত্রীরা। সে সব কথা তখন আর ভাল লাগছিল না কর্তামশাই-এর। তারা প্রণাম করে চলে যেতেই কর্তামশাই নিবারণকে ডাকলেন—শোন নিবারণ—

নিবারণ সামনে এল।

কর্তামশাই বললেন—নিবারণ, ছুলাল সা' যা বলছিল, শুনেছ?

—শুনেছি, আমাদেরও বলেছেন—

—তোমাকেও বলেছে? কি বলেছে?

—আজ্ঞে, বলেছেন উনি সন্নিসী হয়ে চলে যাচ্ছেন। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় আমাদের ফিরিয়ে দেবেন, আরও সব অনেক কথা বলে গেলেন।

—তোমার বিশ্বাস হল কথাগুলো?

—আজ্ঞে, আপনার দয়াতেই তো দাঁড়িয়েছেন উনি, তাই এখন বোধহয় ধর্মভয় জেগেছে মনে। আর নতুন-বৌও তো একখানা গয়না দিয়ে মুখ দেখে গেল হরতনের।

—গয়না? কিসের গয়না, সোনার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সোনার। সোনার বালা একজোড়া। তা, হাত দিয়ে দেখলাম ওজনে আট ভরিটাক্ হবেই, বেশ ভারি ভারি।

—কই, দেখে আসি, চল তো।

বলে কর্তামশাই উঠলেন। বললেন—বঙ্কু কোথায়?

—হরতনের কাছেই আছে।

কর্তামশাই চলতে চলতে বললেন—হরতনের ওষুধ এনেছ?

—আজ্ঞে, ওষুধ তো কালকেই এনেছি।

—ওষুধ খাইয়েছ?

—আজ্ঞে, ওষুধ তো সব বঙ্কুই খাওয়ায়, আমার হাতে তো ওষুধ খেতে চায় না হরতন, বড়গিন্নীর হাতেও খেতে চায় না, কেবল বঙ্কুর হাতে খাবে।

—আর ফল? আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, ও-সব?

—সবই খাওয়াচ্ছে বঙ্কু। আমাদের কারোর কথাই তো শুনবে না, বঙ্কুই তো দিনরাত কাছে থাকে, আর দেখা-শোনা করে।

তা বটে। কেষ্টগঞ্জে আসার পর দিন থেকেই সেই যে বঙ্কু হরতনের সেবার ভার নিয়েছে, সে এখনও চলছে। কোথাকার যাত্রাদলের ছেলে, চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে উঠল, আর যাওয়া হল না তার।

কর্তামশাই বলেছিলেন—তোমার চাকরিটা যাবে না তো বাবা ?

বঙ্কু বলেছিল—এই হরতন ভাল হয়ে গেলেই চলে যাব—আর তো ছুটো দিন, একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে দিন—

কর্তামশাই বলেছিলেন—সেই কামনাই কর বাবা তোমরা, তুমিও ছুটি পাও, আমার হরতনও ছুটি পায়।

তা সেই থেকে রয়ে গেছে বঙ্কু এখানে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই সেই যে গিয়ে বসে হরতনের সামনে, তার পর আর তার ছুটি নেই। হরতনের মুখ ধুইয়ে দেয়, দাঁত মেজে দেয়, ওষুধ খাইয়ে দেয় তাকে। ফলগুলা ছাড়িয়ে মুখে পুরে দেয়। তালপাতার পাখাটা নিয়ে মাথায় নাগাড়ে বাতাস করে।

মুখটা নীচু করে একবার জিজ্ঞেস করে—এখন কেমন আছ গো তুমি ?

হরতন জেগে থাকলে উত্তর দেয়, নইলে আর উত্তরই দেয় না।

অন্য সময়ে বলে—বঙ্কুদা—

বঙ্কু মুখ নীচু করে বলে—কিছু বলবে ?

হরতন বলে—কোথায় ছিলাম আমরা আর কোথায় এলাম বল তো ?

বঙ্কু বলে—আমি বরাবরই বলতাম তোমায়, তুমি রাজরাণী হবে।

হরতনের মুখে ফ্যাকাশে হাসি ফুটে ওঠে। বলে—কিন্তু আমি যে সত্যিকারের রাজকন্যে তা তো জানতাম না—

—ভালই তো হল।

বঙ্কু আরও জোরে জোরে পাখার বাতাস করে। বলে—ভালই তো হল, তোমার ভাল হলেই আমার ভাল।

—আমি সেরে উঠলে তুমি কি করবে?

বঙ্কু বলে—তুমি সেরে উঠলে আবার চণ্ডীবাবুর দলে চলে যাব, আবার গোঁফ কামিয়ে 'রাণী রূপকুমারী' সেজে আসরে নামব—আবার আসরে নেবে বলব—

কোথা যাব কোথা যাব অবলা রমণী,
কে আছে আমার!
কার কাছে মাগিব আশ্রয়, বল অন্তর্যামী?

কথাটা সুর করে বলে বঙ্কুও হাসে, হরতনও হাসে।

বঙ্কু বলে—আর লোকে যদি টিট্‌কিরি দেয় তো চণ্ডীবাবুর গালাগালি খাব—! আগে গালাগালি খেলে তবু তোমার মুখ চেয়ে সব হজম করতাম, এখন তুমি চলে এলে, এখন কষ্ট হলে ফকিরের কাছ থেকে হুঁকো চেয়ে নিয়ে কষে টান দেব।

হরতন বলে—তামাকটা তুমি ছেড়ে দিও, বুঝলে? বেশি তামাক খেলে শুনছি বুকের রোগ হয়।

বঙ্কু বলে—হোক্ গে বুকের রোগ—আমার বুকের রোগ হলে কার কি? কারুর তো কিছু এসে যাচ্ছে না—চণ্ডীবাবু আর একটা লোক খুঁজে নেবে—

হরতন বলে—তা বুকের রোগ হওয়া ভাল নাকি, তোমারই তো কষ্ট, তুমিই তো ভুগে ভুগে কষ্ট পাবে।

বঙ্কু বলে—তোমাকে আর তার জন্যে ভাবতে হবে না, তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর দিকি নি।

হরতন একটু থেমে বলে—আচ্ছা, বঙ্কুদা, আমি যেমন রাজকন্যে হয়ে গেলাম তুমিও যদি তেমনি হঠাৎ রাজপুত্তুর হয়ে যেতে?

বঙ্কু হাসে। বলে—তা হলে খুব মজা হত সত্যি, না? কিন্তু

আমার চেহারা যে বাঁদরের মত, আমি রাজপুত্তুর হলেও মানাত না।

হরতন বলে—আমার চেহারার উপর নজর দিচ্ছ তো? দেখবে, ঠিক আমার অসুখ সারবে না—মোটে সারবে না—

বঙ্কু হাত দিয়ে হরতনের মুখখানা চাপা দেয়।

বলে—তোমার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি—

হরতন রেগে যায়। বলে—আবার ছুঁলে তো আমাকে?

—বেশ করব ছোঁব, কেন তুমি বার-বার অমন অলুক্ষুণে কথা বলবে—

—কিন্তু আমার তো ছোঁয়াচে রোগ, আমাকে এত ছোঁয়াছুঁয়ি করা কি ভাল? আমাকে না-হয় এখন তুমি দেখছ, তখন তোমার রোগ হলে তোমাকে কে দেখবে? তোমার কে আছে শুনি? তোমার রোগ হলে চণ্ডীবাবু তোমাকে ভাগাড়ে ফেলে দেবে, দেখো—

বঙ্কু রেগে যায়। বলে—আমার কথা আর তোমায় অত ভাবতে হবে না গো ধনি, তুমি তোমার নিজের ভাবনাটা ভাব আগে।

হরতন কিন্তু কথাটা শুনে হাসে।

বলে—আমার ভাববার অনেক লোক আছে। দেখছ না, কত লোক আসছে আমাকে দেখতে, কত লোক কত আশীর্বাদ করে যাচ্ছে এসে, কত লোক কত আদর করে কথা বলছে আমার সঙ্গে! এমন আদর আমাকে আগে কেউ জীবনে করেছে?

বঙ্কু বললে—করে নি?

—কে করেছে বল?

—কেন, আমি করি নি? আমি···

হঠাৎ বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে দুজনেই চমকে উঠেছে। বাইরে বড়গিন্নী তখন নতুন-বৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বঙ্কু দেখলে, হরতন দেখলে, বড়গিন্নীর সঙ্গে একজন বৌ ঘরে ঢুকেছে। বেশ

দামী শাড়ি, গায়ে দামী দামী সোনার গয়না। বঙ্কুকে দেখে বৌটির বুঝি একটু সঙ্কোচ হল। মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে জ্যাঠাইমা—

বড়গিন্নী বললে—ওই ওদের সঙ্গেই তো ছিল এতদিন আমার নাতনী, অসুখ বলে রয়েছে। এই হরতনের অসুখ সেরে গেলেই আবার চলে যাবে।

বঙ্কু তখন একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। নতুন-বৌ কাছে এল। তার পর হাতের একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট হরতনের হাতে দিয়ে বললে—এইটে তোমায় দিলাম ভাই, আমার শ্বশুর তোমাকে দিয়েছেন—

হরতন মুখখানার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

আসলে দুলাল সা'র কথাগুলো কর্তামশাই-এর বিশ্বাস করতে ভাল লাগল। জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য যেমন নেই, জীবনটাও যে মিথ্যে নয়, এ-সত্যটাও তেমনি একটা মস্ত বড় সত্য। আর এই সত্যটাকেই পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে হলে অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য। জীবন যে অনিত্য, তা কর্তামশাই-এর মত দুলাল সা'ও জানত। যেমন পৃথিবীর আরও হাজার হাজার লোক জানে। কিন্তু সেই অনিত্য বস্তুটাই অর্থ ছাড়া যে অনিত্যতর হয়ে ওঠে একথা কর্তামশাই-এর চেয়ে আর কেউ বেশী মর্মান্তিক করে অনুভব করে নি। তাই দুলাল সা'র এই হঠাৎ পরিবর্তনে কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ছ'মাসের মধ্যেই ভট্টাচার্য-বাড়ি আবার নতুন চেহারায় মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠল। আবার চুনকাম করা হল দেওয়ালে। বাড়ির গায়ে বালির পলেস্তারা লাগল। রং লাগল। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো-পাখা ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলল।

লোকে বাড়ির সামনে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকত। বলত—বাঃ—

ভেতরে এসে কর্তামশাই-এর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করত। কর্তামশাইও পা বাড়িয়ে দিয়ে হাত উঁচু করে আশীর্বাদ করতেন।

তারা জিজ্ঞেস করত—নাতনী কেমন আছে কর্তামশাই? আপনার হরতন?

কর্তামশাই বলতেন, এই ভাল হয়ে উঠেছে, আর ত্'দিন, আর ত্'দিন পরেই উঠে-হেঁটে বেড়াবে।

সকাল থেকে লোকের আর কামাই নেই যেন। লোক আসে, কর্তামশাইকে প্রণাম করে, আর তারপর কর্তামশাই-এর সামনে বসে তাঁর কথাগুলো চুপ করে শোনে। যেমন করে এতদিন শুনত তুলাল সা'র কথা।

কর্তামশাই বলতেন, ধর্ম আছে, বুঝলে হে কালিপদ, এই কলিযুগেও ধর্ম আছে, ভগবান আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে—সবই আছে। আমরা শুধু দেখতে পাই না, এই যা—

তারপর আবার একটু থেমে বলতেন, মানুষ অন্ধ, সংস্কারে সব মানুষ অন্ধ হয়ে আছে বলেই কিছু দেখতে পায় না। নইলে তোমরা তো নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছ—

তারা সবাই বলত, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

কর্তামশাই বলতেন, চোখ-কান খুলে রাখ, আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে।

—কি দেখতে পাব হুজুর?

—দেখতে পাবে পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়। আমি জীবনে কোনও পাপ করি নি। কারোর কোনও অনিষ্ট-চিন্তা করি নি। কারও ক্ষতির কথা স্বপ্নেও দেখি নি। তোমরা তো জান আমাকে। আমি চিরকাল লোকের ভাল চেয়েছি—চাই নি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো আপনি চেয়েছেনই।

—এখনও তাই-ই চাই। এখনও চাই সকলের ভাল হোক। চাই বলেই তো আজ আমার এই নাতনী আবার ফিরে এল। এই বাড়ি আবার নতুন হল। এই যে ইলেকট্রিক-আলোর ঝাড় দেখছ, কলকাতার লাটসাহেবের বাড়িতেও এই ঝাড়-লণ্ঠন আছে—কলকাতার মেকার-মিস্ত্রী এসে এই সব করে দিয়ে গিয়েছে।

—কত খরচ পড়ল আজ্ঞে ?

কর্তামশাই মিটি মিটি হাসতেন। জিজ্ঞেস করতেন, তোমরাই আন্দাজ কর না কত খরচ পড়ল ?

গ্রামের সাধারণ সাদাসিধে লোক সব। তারা জীবনে এ সব দেখে নি কখনও। চারিদিকে ভাল করে চেয়ে দেখে বলত, আজ্ঞে, তা পাঁচশো ছশো টাকা হবে বেকসুর।

কর্তামশাই বিজ্ঞের হাসি হেসে বলতেন, ওই নিবারণকে জিজ্ঞেস কর।

নিবারণ পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত।

—কত খরচ পড়ল, সরকারমশাই ?

—পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

কর্তামশাই বলতেন, তাও তো এখনও কিছুই হয় নি রে! হরতনের জন্যে নতুন মোটরগাড়ি কিনতে হবে আবার। তাতেও পড়বে হাজার চৌদ্দ টাকা—তারপর পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টাও তো কিনে নিচ্ছি—

—ওতে যে চিনির কল হয়েছে সা'মশাই-এর।

—চিনির কলটাও তো কিনে নেব।

সবাই অবাক হয়ে যেত খবরটা শুনে। মুখে কিছু বলত না। খানিক পরে শুধু বলত, সবই ভগবানের দয়া কর্তামশাই, সবই ভগবানের দয়া।

কর্তামশাই চেঁচিয়ে উঠতেন। বলতেন, ওরে সেই কথাই তো তোদের এতদিন বলে আসছি—ধর্মও আছে, ভগবানও আছে, কলিযুগ বলে যে সব-কিছু মিথ্যে হয়ে গেছে তা নয়, কলিযুগেও ভগবান আছে, আমি এই হাতে হাতে তার প্রমাণ পেয়েছি।

কথা আর বেশিক্ষণ হয় না। বঙ্কু কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার আনতে, সে ফিরে আসতেই আসর বন্ধ হয়ে গেল।

সাধারণতঃ কলকাতার ডাক্তার এই পাড়াগাঁয়ে আসতে চায় না। যারা নামজাদা ডাক্তার তারা হাসপাতাল, নার্সিং-হোম করেছে সবাই। বাড়িতে বসে রোগী দেখে আর দরকার হলে রোগীদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। নিবারণ নিজে গিয়েও দু'বার খালি হাতে ফিরে এসেছে।

বঙ্কু বলেছিল, আমি যাব কর্তামশাই? আমি যেমন করে পারি ডাক্তার ডেকে আনব।

তা যাক্। বঙ্কুই যাক্। সব ডাক্তারই বলেছে, হরতনকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে। এ রোগের চিকিৎসা বাড়িতে হয় না। বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে। ওষুধ না হয় কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া গেল। কিন্তু ইনজেক্‌শন দিতে লোক চাই। তা সে ব্যবস্থাও হয়েছিল। হরিসাধন সামন্ত কেষ্টগঞ্জের বাজারে নতুন ডাক্তারি পাস করে দোকান খুলেছিল। সে-ই এসে কলকাতার ডাক্তারের পরামর্শ-মত ইনজেক্‌শন দিয়ে যেত।

কর্তামশাই জিজ্ঞেস করতেন—কেমন বুঝছ তুমি, হরিসাধন?

হরিসাধন বলত—আজ্ঞে, ভাবনা করবেন না আপনি, ভাল হয়ে যাবেই।

কর্তামশাই রেগে যেতেন। বলতেন—আরে ভাল তো হবেই, সেটা কি আর আমি বুঝি না? তুমি আমাকে তাই বোঝাবে? আমি কখনও কোনোও পাপ করি নি, কারও অনিষ্ট-চিন্তা করি নি, তা ভাল হবে না মানে?

মুশকিল সবচেয়ে বেশি হয়েছিল বঙ্কুর। দুপুর রোদের মধ্যে একবার যেত ডাক্তারের কাছে আবার এসে বসত হরতনের পাশে। তারপর হরতনের মাথায় পাখার বাতাস করত। মাথার ওপর ইলেকট্রিকের পাখা বন্ বন্ করে ঘুরত, তবু পাখার বাতাস না করে শান্তি পেত না বঙ্কু। নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকত না বঙ্কুর।

—হ্যাঁ বাবা, তুমি খাবে না আজকে?

বড়গিন্নীরই ছিল জ্বালা। কর্তামশাই সারাদিন হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছেন, সরকারমশাইও তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্যে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বঙ্কু তো সারাদিন হরতনকে নিয়েই আছে। এদের সকলের খাওয়া-দাওয়ার দিকটা বড়গিন্নীকেই দেখতে হয়। তার ওপরেই বলতে গেলে সমস্ত সংসারটার ভার। হরতনের ডাবের জল, তার দুধ, তার ফল, তার ভাত, তার সবকিছুর দিকটা বড়গিন্নী না দেখলে কে দেখবে?

বঙ্কুকে ডেকে খাওয়াতে হয়। বঙ্কুর লজ্জা-টজ্জার তেমন বালাই নেই।

বলে—আর দুটো ভাত দিন মা-মণি, ডালটা বড্ড ভাল রান্না হয়েছে।

বড়গিন্নী বলে—তাহলে আর একটু ডালও দিই বাবা তোমাকে।

—তা দিন। অনেক দিন এমন করে খাই নি আমরা মা-মণি। শ্রীমানী অপেরায় আমাদের এক-একদিন পেটই ভরত না, হরতন এক-একদিন আধপেটা খেয়েই কাটিয়েছে।

—তা দুটো ভাত, তাই-ই তোমরা পেট ভরে খেতে পেতে না? আহা—

—আজ্ঞে, কি বলব আপনাকে চণ্ডীবাবুর ওই মুখটাই যা মিষ্টি, মুখের কথা শুনলে মনে হবে একেবারে যেন যুধিষ্ঠির, বুঝলেন, আসলে শকুনি, শকুনিকে জানেন তো? কুরুবংশ একেবারে ধ্বংস করে ছেড়ে দিয়েছিল?

খেতে খেতে অনেক গল্প করে বঙ্কু।

বলে—অঞ্জনাকে আমি কদ্দিন বলেছি, জানেন মা মণি, বলেছি এই চণ্ডীবাবুর দলটা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে চল আমরা চলে যাই যেদিকে দুচোখ যায়। এই খাওয়ার কষ্ট আর ভাল লাগে না—কিন্তু কিছুতেই শুনত না। শুকনো দুটো মুড়ি খেতে ইচ্ছে হলে খাবার উপায় নেই. জানেন?

—কেন? কেন?

—আজ্ঞে, সবাই তো উপুসী! সকলকে না দিয়ে কেমন করে খাই বলুন দিকিনি? কতদিন থেকে অঞ্জনার ইচ্ছে ছিল ভাতের সঙ্গে আলুভাতে খাবে, তা একদিনও দেবে না চণ্ডীবাবু।

—কেন? আলুভাতে দিলে কিসের ক্ষতি?

বঙ্কু বলে—আলুভাতে যে দেবে চণ্ডীবাবু, তা আলুর দাম নেই? চণ্ডীবাবু বলত—আর আলুভাতে খেতে হবে না, আলুর দাম কত করে তা জানিস?

—ওমা, আলুর তো ভারি দাম, তাই নিয়েই এত হেনস্তা?

—ওই বুঝুন! আমরা কি কম কষ্ট করেছি মা-মণি। তা যাক. এখন অঞ্জনার সুখ হয়েছে, তাই দেখেই আমারও সুখ। আমি গিয়ে সব বলব চণ্ডীবাবুকে।

বড়গিন্নী বললে—না বাবা, তুমি যেন এখন চলে যেও না—হরতন আগে একটু ভাল হোক, তার আগে আর তোমাকে ছাড়ছি না।

বঙ্কু বলে—এই দেখুন, হরতন না সেরে উঠলে আমিই কি যাব

নাকি ভেবেছেন ? আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি ওকে এই অবস্থায় ফেলে যাচ্ছি না—এই আপনাকে বলে রাখলাম।

তারপর খেতে খেতেই হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হয়।

বলে—উঠি মা-মণি, হরতনকে একলা ফেলে এসেছি ওদিকে।

বলে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়েই আবার দৌড়ে গিয়ে হাজির হয় হরতনের কাছে।

নিতাই বসাকের কাজের তাড়াটাই সবচেয়ে বেশি। সুকান্ত রায় ক'দিন থেকে নিতাই বসাককে ধরবার চেষ্টা করছিল। অনেক দিন থেকেই পেছনে পেছনে ঘুরছে। কলকাতায় যায়, বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে, একটা কথা বললেই সুকান্তর বদলিটা হয়ে যায়।

নিতাই বসাক বলেছিল—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সুকান্তবাবু, সব মিনিস্টার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

সেদিন এল দুলাল সা'র বাড়ি।

দুলাল সা' বসে বসে মালা জপছিল কাছারি-ঘরের সামনে।

নমস্কার করে সুকান্ত সামনে গিয়ে বসল।

জিজ্ঞেস করলে—বসাকমশাই আছেন নাকি সা'মশাই ?

দুলাল সা' এমনিতে কথা বলতে পেলেই বেঁচে যায়। কিন্তু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। কথায় কথায় বলে—আমি আর ক'দিন রে বাবা, তোরা সংসার-ধর্ম কর, আমি আমার পরকালের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

যারা শোনে তারা জিজ্ঞেস করে—কিন্তু আপনার সংসার? আপনার সংসার কে দেখবে ?

—যিনি দেখবার তিনিই দেখবেন।

—কিন্তু আপনার ছেলে ফিরে আসুক, সে এলেই না হয় যা করবার করবেন।

দুলাল সা' হাসে। বলে—আমি যদি হঠাৎ মারাই যাই তো তখন যদি যমরাজাকে বলি যে, আমার ছেলে আসুক তখন আমি মরব—তা বললে কি শুনবে ? বল্ না তোরা, শুনবে যমরাজা ?

নিতাই বসাককেও সবাই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ বসাক মশাই, সা'মশাই নাকি সংসার ছেড়ে চলে যাবেন ?

নিতাই বসাক বলে—তাই তো বলছে দুলাল।

কিন্তু এত বড় একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে অথচ সবাই যেন নির্বিকার। কেউ যেন বিশেষ বিচলিত নয়। খবরটা সুকান্ত রায়ও শুনেছিল।

বললে—সা'মশাই, একটা কথা শুনলাম, আপনি নাকি সংসার ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাশীধামে চলে যাচ্ছেন ? সত্যি ?

দুলাল সা' বললে—যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না বাবা, মন কেবল পেছু টান দিচ্ছে—বলছে, তোর এই সংসার, তোর এই ছেলে, তোর এই পুত্রবধু, সবই যে তোর—

সুকান্ত বললে—তা তো বটেই—

—আসলে বাবা কেউ কারও নয়, তোমার পাপের বোঝা কেউ নেবে না—

বোধহয় আরও কিছুক্ষণ কথা হত। কিন্তু বাধা পড়ল। নিবারণ সরকার গুটি গুটি এসে হাজির হল।

—কি নিবারণ ? তোমার হরতন কেমন আছে ?

—সেই রকমই সা' মশাই !

—ডাক্তার এসেছিল কলকাতা থেকে ?

—এসেছিল।

—কি বলে গেল ?

—বলছে তো সবাই, সারবে। এখন ভগবান যা করেন !

বলে ভগবানের উদ্দেশ্যে চোখ দুটো তুলে নামিয়ে নিলে।

দুলাল সা' মালা জপতে জপতে বললে—ভগবানই একমাত্র সার বস্তু হে। এ সংসারে আর সবই মায়া। তাই তো আমি এই সুকান্তকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম।

নিবারণ হঠাৎ বললে—আমার একটু তাড়া আছে সা' মশাই—আমাকে আবার একবার ওষুধ কিনতে যেতে হবে কলকাতায়। দামী দামী ওষুধ সব, এখানে পাওয়া যাবে না—

দুলাল সা' কান্তর দিকে চেয়ে বললে, ওরে কান্ত, দে বাবা দে—নিবারণের আবার তাড়া আছে, নিবারণ কলকাতায় আবার ওষুধ কিনতে যাবে—

কান্ত তৈরিই ছিল। কান্ত তৈরিই থাকে বরাবর। নিবারণ এখানে আসা মানেই টাকা ধার নেওয়া। দু-তিন দিন অন্তর আসে আর যা টাকার দরকার তাই-ই নিয়ে যায়। সা' মশাই-এর ঢালা হুকুম আছে। তিনি তো চলেই যাচ্ছেন, এ-সংসারের ওপর, এ টাকার ওপরে তো তাঁর আর কোনও আকর্ষণই নেই। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই তিনি সংসার থেকে বিদায় নেবেন।

কান্ত তখন একটা-একটা করে নোট গুণছিল। নোটগুলো গুণে নিবারণ সরকারের হাতে দিতেই নিবারণও একটা কাগজে স্ট্যাম্পের ওপর সই করে দিলে, কর্তামশাই একটা কাগজে যা লেখবার লিখে দিয়েছিলেন আগেই। সেইটেই হল তমসুক। কান্ত তমসুকটি অতি যত্নে আবার তুলে রেখে দিলে ক্যাশ-বাক্সের ভেতরে।

—নিলে ?

নিবারণ টাকাটা পেট-কাপড়ে গুঁজে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, নিলাম সা' মশাই—

—কত নিলে?

—দশ হাজার।

—দশ হাজারে কুলোবে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ যাত্রা এতেই কুলিয়ে যাবে।

—না কুলোয় তো আরও হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে যাও না। ও-টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি তো সংসার ছেড়ে চলেই যাচ্ছি হে—

তার আর দরকার হল না। সত্তর হাজার আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, এখন দশ হাজার আরও। মোট হল গিয়ে আশি হাজার।

দুলাল সা' বললে—তুমি যেন লজ্জা করো না নিবারণ! কর্তা-মশাইকে গিয়ে বল যে, হরতনের অসুখের জন্যে, আর ওই বাড়ি সারাবার জন্যে, যা টাকা লাগে সব আমি দেব। কিছু সংকোচ করবার দরকার নেই, বুঝলে?

নিবারণ সরকার চলেই যাচ্ছিল। দরজা পর্যন্ত যায় নি। হঠাৎ নিতাই বসাক ঢুকল।

সুকান্ত রায় এতক্ষণে উঠে বসল নিতাই বসাককে দেখে।

—কি বসাক মশাই, কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন?

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই পেছনে পেছনে আরও দুজন ঢুকল। কেষ্টগঞ্জ থানার পুলিসের দারোগা আর একজন কনস্টেবল।

নিতাই বসাকই এগিয়ে এসে দুলাল সা'র দিকে চেয়ে বললে—এই দেখ দুলাল, দারোগাবাবু এসেছেন, সদানন্দর লাশ পাওয়া গিয়েছে বলছেন—

সদানন্দর লাশ!

সুকান্তই বেশি চমকে উঠেছে। দুলাল সা'র মুখে কিন্তু কোনও বিকার নেই।

বললে—তুমি আগে বোস দারোগাবাবু, পরে শুনব সব—

দারোগাবাবু একটা চেয়ারে বসল। খাকি পুলিসের পোশাক, হাতে একটা বেতের ছড়ি, কনস্টেবলটার হাতেও একটা মোটা লাঠি। সে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হয়েছিল বাবা তার? কে মারলে তাকে? আহা—

দারোগাবাবু দুলাল সা'র অনুগৃহীত। অনেকবার নানা উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। টাকাটা-সিকেটাও বরাবর পেয়ে এসেছে কারণে-অকারণে। আর তাছাড়া এই দুলাল সা'র বাড়িতেই এসে একদিন অতিথি হয়েছিলেন পুলিস-মন্ত্রী।

—মারা তো আজকে যায় নি সা' মশাই। লাশ দেখে মনে হচ্ছে সাত-আট দিন আগে কেউ তাকে মেরে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে ওখানে। এতদিন যে শেয়াল-কুকুরে খায় নি এইটেই আশ্চর্য!

দুলাল সা' মুখের ভেতর জিভ দিয়ে এক রকম চুক্-চুক্ আওয়াজ করলে।

—আহা, কে এমন কাজ করলে বল দিকিনি বাবা? কে শত্রুতা করলে আমার এমন করে?

—সে তো ইন্‌ভেস্টিগেশন্ করে দেখা যাবে। এখন দুই-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব আমি।

—তা কর না বাবা। যেমন করে পার, যে আসামী তাকে বাবা তোমার ধরে জেলে পোরা চাই। এ কি কথা! দিনে-দুপুরে আমার কর্মচারীকে হাসপাতাল থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলবে, এ তুমি সহ্য করো না। তাকে ধরে ফাঁসি দিতে হবে—

নিতাই বসাক বললে—কিন্তু খুন যে করেছে তার প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা?

দারোগাবাবু বললে—খুন হতে পারে আবার সুইসাইডও হতে পারে। সমস্ত ইন্‌ভেস্টিগেশনেই বেরিয়ে যাবে। বডিটা পাওয়া গেছে হাসানপুরের হোগলা-বনের মধ্যে—

দুলাল সা' বললে—না বাবা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ও খুন, ও খুন না হয়ে যায় না। আমি অত আরামে রেখেছিলাম ওকে হাসপাতালে। সেখান থেকে পালিয়ে ও আত্মঘাতী হতে যাবে কেন? কিসের দুঃখে! ও দেখো বাবা নিশ্চয়ই খুন—খুনীকে তোমার ধরতেই হবে, আর ধরে একেবারে ফাঁসি দিতে হবে—

সদানন্দ যে এমন করবে তা যেন দুলাল সা', নিতাই বসাক কারো জানা ছিল না। সদানন্দর নিরুদ্দেশের ঘটনাটা যেন তাই সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিল।

পুলিসের লোকজন সবাই সদানন্দর মৃতদেহটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল পাশে নিতাই বসাক ছিল, দুলাল সা'ও ছিল।

সদানন্দর দিকে চেয়ে চেয়ে দুলাল সা' জিব দিয়ে একটা চুক্ চুক্ আওয়াজ করলে। অর্থাৎ—আহা!

প্রতিদিন হাসপাতালে এই লোকটাকেই গিয়ে দেখে এসেছে যতদিন সদানন্দ হাসপাতালে ছিল ততদিন দুলাল সা' নিজে তাকে খাবার দিয়ে এসেছে।

দুলাল সা' বললে—আহা, এত বড় সব্বনাশ কে করলে রে এর!

কথাটা নৈর্ব্যক্তিক, সুতরাং এর উত্তরও কেউ দিলে না।

দুলাল সা' আবার বললে—এর একটা বিহিত তোমাকে

করতেই হবে দারোগাবাবু, পাপীর দণ্ড হওয়া চাই, নইলে লোকে যে কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে গালাগালি দেবে, বলবে, ইংরেজরা চলে গেছে আর দেশে অরাজক এসে গেছে—

নিতাই বসাকও সেই একই কথা বললে। পুলিসের যা করণীয় তারা করবেই। শুধু সনাক্ত-করণের জন্য দুজনকে ডেকে আনা। এতদিন লোকটা এদের গদিতেই চাকরি করত, এদের দয়াতেই মানুষ, এরা বললেই লোকটাকে চিনতে সুবিধে হবে, রিপোর্টও সেই রকম দেবে তারা।

—আপনার কাকে সন্দেহ হয়, সা' মশাই ?

দুলাল সা' বললে—ওই তো বিপদে ফেললে বাবা আমাকে। আমি যে দুনিয়াতে সকলকেই বিশ্বাস করে ফেলি. আমি আবার কাকে সন্দেহ করব ?

—আপনি ওকে ঠিক মাসে মাসে মাইনে দিতেন তো ?

—মাইনে আমি কারো ফেলে রাখিনে বাবা, আমি কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করিনে, মাইনেও ফেলে রাখিনে—আমার কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে দেখ তুমি, আমার সে স্বভাব নয়।

—কারো সঙ্গে কি এর শত্রুতা ছিল, আপনি জানেন ?

—কি করে তা জানব বাবা আমি, আমি তো কারো মনের ভেতর ঢুকতে পারি নে !

—কারো কাছে কিছু টাকা-কড়ি ধার করেছিল ?

—তাই বা বলব কি করে বাবা ? কেন ধার করবে ? কিসের জন্যে ? সদানন্দকে কি আমি কম মাইনে দিতাম যে পরের কাছে হাত পাততে যাবে ? একটা তো পেট ওর, কে খাবে ওর টাকা ?

—ওর টাকা কার কাছে রাখত ?

—তা ও-ই জানে ! আমার বাবা অত খবর রাখবার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও নেই। সেই জন্যেই তো কর্তামশাইকে বলছিলাম আমি,

এ সংসার থেকে মুক্তি পেলেই আমি বাঁচি, আমার আর সংসারে দরকার নেই—

নিতাই বসাককেও ওই একই প্রশ্ন করা হল। নিতাই বসাকও ওই একই উত্তর দিলে। সে-ও কারো সাতে নেই, পাঁচে নেই। সে দুলাল সা'র ম্যানেজার। দুলাল সা'র যাবতীয় কাজ-কর্ম সে-ই দেখে। ওই পর্যন্ত। আর কিছু জানে না সে।

শেষ কালে দারোগাবাবু বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না সা' মশাই, সরকারী চাকরীতে আমাদের অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, নইলে আপনাদের কষ্ট দিতাম না—

দুলাল সা' বললে—আলবৎ বলবে তুমি, হাজার বার বলবে। আসামীকে খুঁজে বার কর, নইলে কেষ্টগঞ্জের বদনাম হবে না? গভর্মেণ্টের বদনাম হবে না?

বাড়িতে এসে দুলাল সা' বেশিক্ষণ কাছারিতে বসল না। অনেক লোক এসে বসেছিল, সকলকে যেতে বলে নিতাইকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গেল।

বললে—জানলা-দরজা ভাল করে বন্ধ করে দাও।

নিতাই বসাকও কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। জানলা-দরজা ভাল করে এঁটে বন্ধ করে দিলে।

দুলাল সা' জিজ্ঞেস করল—কি রকম বুঝলে?

নিতাই বসাক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কিসের কি রকম?

—কর্তামশাই-এর ব্যাপারটা? খোঁজ নিয়েছিলে কলকাতায়?

—নিয়েছিলাম।

—তারপর?

নিতাই বসাক বললে—যত টাকা চায় কর্তামশাই, তুমি দিয়ে যাও।

—সব খরচ-খরচা নিয়ে প্রায় আশি হাজার টাকা তো দেওয়া হয়ে গিয়েছে—

—আরো চাইলে আরো দেবে, তোমার কোনও ভয় নেই, সব উস্থুল হয়ে আসবে, এখনও তো কর্তামশাই-এর তিন হাজার বিঘে জমি রয়েছে, তার পর বাস্তুভিটেটাও তো কম নয়—

একটু থেমে বললে—আর সদানন্দর ব্যাপার নিয়ে তুমি ভেব না—

—সে আমি ভাবছি নে।

—যাকে যা টাকা দেবার আমি দিয়েছি, পেট ভর্তি করে দিয়েছি তাদের। এমন খাইয়েছি যে, তাদের আর ঢেঁকুর তোলবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই।

—বড় শত্তুর চারদিকে! যদি কেউ টের পেয়ে যায় তখন যেন না বিপদে পড়তে হয়!

—বিপদেই যদি পড়ব তা হলে আর মিনিস্টারকে এখানে এনে অত খরচ করতে গেলাম কেন? হাজার তিনেক টাকা তো খরচ হয়েছে তার জন্যে? সেটাও কি আমি পকেট থেকে দেব বলতে চাও? আমি সেই লোক? আমি একজন মন্ত্রীর সেক্রেটারীকে স্পষ্ট বলে এসেছি তার ভাইপোর নামে সুগার-মিলের যে শেয়ার দিয়েছি সেটাই যথেষ্ট, তার বেশি আর আমি কিছু করতে পারব না—

—কিন্তু টাকাও দেব আবার কাজও হাসিল হবে না, এটা তো ভাল কথা নয়! আমার পাঁচ লাখ টাকার মেশিন আনতে যদি এক লাখ ঘুষ দিতে বেরিয়ে যায়, তা হলে লাভ থাকবে কি?

নিতাই বসাক বললে—লোকসানটাই বা কোথায়? আমি তো নিজের ঘর থেকে লোকসান দিচ্ছি না। দিল্লীতে গিয়ে এবার তো সেই কথাই হল। সুগারের দাম বাড়াতে তো রাজী হয়েছে

ওরা। এক লাখ টাকা তোমার তখন এক দিনে উঠে আসবে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?

কথাটা শুনে দুলাল সা' যেন একটু শান্ত হল। অনেক দিন থেকেই দুলাল সা'র মনে একটা অশান্তি চলছিল। মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছে নিতাই বসাক। আগে দু'পাঁচশো টাকার কারবার করত সে। তারপর হাজারে দাঁড়াল, হাজার থেকে লাখ। এখন লিমিটেড কোম্পানি। বছর কয়েকের মধ্যে একেবারে ফুলে ফেঁপে একাকার। কেষ্টগঞ্জে মহাজনরা এলে দুলাল সা'র কারবারের বহরটা দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। যত তাজ্জব হয় ততই দুলাল সা'র কোম্পানি আরো লালে লাল হয়ে ওঠে। এই ক'টা মাত্র বছর। এই ক'টা বছরেই একেবারে কেষ্টগঞ্জে সুগার-মিল হয়ে অন্য রকম চেহারা হয়ে গেছে। পেঁপুলবেড়ের ওদিকে গেলে আর চেনা যায় না। সেই বাদা জমি আর হোগলা-বনের জায়গায় নতুন শহর গজিয়ে উঠেছে। নতুন-নতুন রাস্তা হয়েছে সেখানে। লাল খোয়া-বাঁধানো রাস্তা। পার্ক হয়েছে। নাম হয়েছে দুলাল পার্ক। ছোট ছোট কোয়ার্টার করে দিয়েছে মিলের লোকজনদের থাকবার জন্যে। এলাহি কাণ্ড করে দিয়েছে নিতাই বসাক। সাহেব-সুবো-গুজরাটি-মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা আসে, থাকে, আবার চলে যায়। তাদের থাকবার জন্যে আবার গেস্ট-হাউস্ আছে। সে সব সাহেবী কায়দার বাড়ি।

এত যে কাণ্ডকারখানা হয়েছে, তার জন্যে দুলাল সা' কিন্তু এতটুকু বদলায় নি। সে এখনও সেই ঝাঁটা নিয়ে ভোর রাত্রে ঘাটে গিয়ে সিঁড়ি ধোয় নিজের হাতে। আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি করে ফিরে আসে।

যারা দেখে, যারা হঠাৎ এক-আধদিন দেখতে পায়, তারা বলে—মানুষ নয় তো সা'মশাই, শিব—

দুলাল সা' বলে—দূর গাধা, ওসব কথা বলিস্ নে, ওতে মনে অহঙ্কার হয়—

—অহঙ্কার নেই বলেই তো আপনাকে শিব বলি সা' মশাই—

দুলাল সা' বলে—না, ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই রে, ওতে পাপ হয়—

বিরাট-বিরাট গাড়ি আসে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে দিয়ে, বড় বড় মহাজন-ইন্সপেক্টর আসে, এমন কি বি-ডি-ও সুকান্ত রায়ও অফিসের জিপ-গাড়িটা নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে আসে। কিন্তু দুলাল সা' বিরাট মোটর গাড়িটার ভেতরে বসেও যে-ভিখিরি সেই ভিখিরি। সেই খালি গা, বড় জোর কাঁধে একটা চাদর। চটি পায়ে। মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। সেই প্রথম যখন এই কেষ্টগঞ্জে এসেছিল তখনও যেমন, এখনও তেমনি। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলে গাড়ি থামাতে বলে। কুশল প্রশ্ন করে, বাড়ির খবরাখবর নেয়।

কেউ যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা সা'মশাই, চিনির দর বাড়ল কেন হঠাৎ ?

—তাই না কি, বেড়েছে না কি ?

বড় অবাক্ হয়ে যায় দুলাল সা।

—আজ্ঞে, শুধু চিনি কেন, তেল-নুন চাল-ডাল সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে বাজারে, আর তো পারছি নে আমরা—

দুলাল সা' বলে—কত বেড়েছে ?

—এই দেখুন না আজ্ঞে, আগে চোদ্দ আনা সের কিনেছি চিনির, এখন একটাকা দশ আনা—

—য়্যাঁ ? বলিস্ কি ?

যেন ভয়ে আঁতকে ওঠে দুলাল সা'। যে-মানুষ দিনরাত ভগবানের চিন্তায় বিভোর, তার পক্ষে তো এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর রাখা সম্ভব নয়।

দুলাল সা' বলে—হাজার হাজার টাকা মাইনে দিয়ে কেমিষ্ট আর ম্যানেজার সুপারভাইজার রেখে আমার তো ভারি লাভ। দেশের লোক যদি খেতেই না পেল তো কিসের দরকার আমার চিনির কলের? আমি কি টাকা উপায় করবার জন্যে মিল খুলেছি?

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলে—দাঁড়া, কিছু ভাবিস্ নে, আমি দেখছি, আমি সব বেটাকে শায়েস্তা করছি। হয়েছে কি, আমাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে আর কি! জানে তো আমি কেবল হরিনাম নিয়ে থাকি—

বলে গাড়ি চালিয়ে চলে যায় দুলাল সা'।

তারপর আবার হঠাৎ একদিন সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হতেই গাড়ি থামিয়ে ডাকে—এই, এই কেদার, শোন্, শুনে যা ইদিকে—

কেদার মাঠে যাচ্ছিল। দৌড়ে গাড়ির কাছে এসে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

—তুই সেদিন বলছিলি না, চিনির দাম বেড়েছে কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সা'মশাই!

—তা তুই কিছু ভাবিস্ নে, আমি সেই দিনই ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অমনি ছাড়ি নি। আমি ধম্‌কে দিলাম। বললাম—আমার দেশের চাষা-ভূষোরা খেতে পাবে না এটা তো ভাল কথা নয়! ম্যানেজার বললে—আমি কি করব, গভর্নমেণ্ট যে যন্তর-পাতির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে! আমি বললাম, গভর্নমেণ্টকে তা হলে যন্তর-পাতির দাম কমাতে বল—

কেদার ততক্ষণে কৃতার্থ হয়ে গেছে দুলাল সা'র কথায়।

—তা তুই কিছু ভাবিস্‌নে বাবা, গভর্নমেণ্টকে সেই দিনই চিঠি লিখে দিতে বলে দিয়েছি যে জিনিস-পত্তোর যন্তোর-পাতির দাম না-কমালে চিনির দাম কমাতে পারছি না। আমার দেশের গরীব

চাষা-ভুষোরা খেতে পাচ্ছে না। সব কথা খুলে লিখে দিতে বলেছি, খুব কড়া করে লিখতে বলেছি—তুই কিছু ভাবিসনে বাবা, বুঝলি ? আরে, তোরা তো জানিস, টাকার জন্যে আমি মিল করি নি—

গাড়ি আবার ছেড়ে দেয়। কেদার কথাটা বুঝল কি বুঝল না, তা আর দেখা গেল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেশি দিন দুলাল সা'কে আটকে রাখা গেল না। একদিন নতুন-বৌ-এর কাছে খুলেই সব বললে দুলাল সা'।

বললে—নতুন-বৌমা, এ-হপ্তায় বিজয়ের চিঠি পেয়েছ ?

নতুন-বৌ বললে—হ্যাঁ বাবা—

—কিছু লিখেছে কবে আসবে ?

নতুন-বৌ বললে—পরীক্ষার ফলটা বেরোবে এই মাসে, বেরোলেই চলে আসছেন—

—কিন্তু আমি তো আর থাকতে পারছি নে মা, আমার যে এ শৃঙ্খল আর ভাল লাগছে না।

এ-কথা অনেক দিন থেকেই শুনে এসেছে নতুন-বৌ। বার বার কথাটা শুনে পুরনোই হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। নতুন-বৌ সে-কথায় বিশেষ কান দিলে না।

বললে—আমি কর্তামশাই-এর বাড়িতে একবার যাচ্ছি বাবা—

—কেন মা ?

—হরতনের অসুখ আবার বেড়েছে, জ্যাঠাইমা ভাবছেন খুব, আমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন—

নতুন বৌ চলে গেল। বাইরে গাড়ি তৈরিই ছিল। নতুন-বৌ গিয়ে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। গাড়ির শব্দটাও কানে এল দুলাল সা'র। হাতের মালাটা নিয়ে ঘন ঘন জপতে লাগল। এমন কখনও হয় না। মনটাকে বশে না রাখতে পারলে কোনও কাজই করা যায় না সংসারে। মনটাই হচ্ছে সব। এই মনটা বেঁধে ফেলতে পেরেছিল

বলে দুলাল সা' আজ দুলাল সা' হতে পেরেছে কেষ্টগঞ্জে। একখানা কাপড় আর একটা গামছা সম্বল করে এই কেষ্টগঞ্জে এসে আজ এতগুলো কারবারের মালিক হতে পেরেছে। ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে পেরেছে। আজ মিনিস্টারের সঙ্গে পাশাপাশি তার ফটো ছাপা হয়ে কাগজে বেরিয়েছে। এ সবই হয়েছে মনের জোরের জন্যে। নতুন-বৌ ও-বাড়িতে যাচ্ছে যাক। যাওয়াটা ভাল। কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে কিছু লাভ হয় না। মিষ্টি-কথায় ছুরি মারলেও রক্ত পড়ে না। এ শিক্ষা দুলাল সা'র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতেই লাভ হয়েছে ।

হঠাৎ কি খেয়াল হল। দুলাল সা' ডাকলে—কান্ত—

কান্ত খাতাপত্র দেখছিল পাশের ঘরে। ডাক শুনে কাছে এল।

দুলাল সা' বললে—আচ্ছা, শোন কান্ত—তুমি খোকার বিয়ের সময়ে তো ছিলে ?

—আজ্ঞে, ছিলাম আমি কত্তা !

—তা হলে তুমি তো সবই জান! তোমার মনে আছে সেই ঘটকটার কথা ? কি যেন নাম ?

—সেই দোলগোবিন্দ ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি তোমার মনে আছে ঠিক !

কান্ত বললে—আজ্ঞে, মনে থাকবে না! সব মনে আছে। সদানন্দ তখন গদিবাড়িতে বস্তা গোণার কাজ করত—বিয়ের রাত্তিরে পাগল হয়ে গেল ঘটক মশাই, সব মনে আছে, পনেরো ভরি সোনা না কি যেন সদানন্দ তাকে দেয় নি—! অনেক দিনের কথা তো সে-সব, ভাল মনে নেই—

দুলাল সা' বললে—আমারই মনে নেই, তা তুমি! ও সব বাজে কথা কখনও মনে থাকে ? না ওই সব বাজে কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় !

কথাটা বলে ছুলাল সা' আবার মালা জপতে লাগল।

কান্ত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললে—সেই দোলগোবিন্দকে কিছু করতে হবে ?

—আরে না! হঠাৎ মনে পড়ল তাই তোমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি তোমার নিজের কাজ কর গে বাবা! মনকেও বলিহারি, এত লোক থাকতে হঠাৎ কি না সেই দোলগোবিন্দর কথা মনে পড়ল! হরি, হরি,—

কান্ত চলে গেল। কিন্তু কথাটা বার বার মনে পড়তে লাগল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেও মনে পড়ে, মালা জপতে জপতেও মনে পড়ে। নতুন-বৌ পুজোর জায়গা করে দিয়ে ডাকতে আসে। অন্যমনস্কের মত মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। তারপর চোখ ছুটো সরিয়ে নেয়।

নিতাই বসাক একসঙ্গে বেশিদিন থাকে না কেষ্টগঞ্জে। এই কেষ্টগঞ্জ, আবার এই কলকাতা। কলকাতা থেকে আবার কখন হঠাৎ দিল্লী চলে যায়। দিল্লীতে আজকাল ঘন-ঘন যেতে হয় নিতাই বসাককে। সে সারা ইণ্ডিয়াটা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সেবার নিতাই বসাক কেষ্টগঞ্জে আসতেই ডেকে পাঠালে ছুলাল সা'।

—কি হল! এত ব্যস্ত কেন? আমি যখন আছি তখন তোমার এত ভাবনার কি আছে? ব্যালান্স-শীটের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম, গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েই চলে এসেছি—

—তা এবার এত দেরি হল আসতে ?

—দেরি হবে না? অ্যাকাউন্‌টেন্টদের সঙ্গে লেগে ছিলাম যে! ডিভিডেণ্ডের ব্যাপার আছে, সেলস্‌-ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, ইনকাম-ট্যাক্স আছে, সব সেরে কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে এলাম যে।

দুলাল সা' বলল—যাক্ গে, সে যা করেছ, করেছ। আমি ডেকেছিলাম অন্য ব্যাপারে—সেই ঘটক বেটার কথা মনে আছে তোমার ?

—ঘটক কে ? কিসের ঘটক ?

—সেই যে দোলগোবিন্দ না কি যেন তার নাম ?

—কেন ? তার কথা হঠাৎ তোমার মনে পড়ল কেন আবার ?

দুলাল সা' বললে—অত হুড়োহুড়ি করে কাজ করা আমার ধাতে সয় না। এই হুড়োহুড়ি করতে গেলেই ঠিকে ভুল হয়—তা জান ?

—আমার ঠিকে কখনও ভুল দেখেছ তুমি ?

—হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ ? কথাটা তোমায় বুঝিয়ে বলি।

বলে দরজা-জানলার দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে দুলাল সা' বললে—সদানন্দর সঙ্গে ওই ঘটক বেটাও তো ছিল। তা সদানন্দকে যখন সরালে তখন সেটার কথা কি কখনও ভেবেছ ?

—সে কি করবে ? সে তো আমার স্টাফ নয় !

দুলাল সা' বললে—ওই তো, ওইখেনেই তোমার সঙ্গে আমার তফাত নিতাই, আমি শত্তুরের জড় রাখিনে। শত্তুর হচ্ছে বটগাছের মত, ওর ডালপালা বেরোয়—

—তা কি করতে চাও তুমি ?

দুলাল সা' দরজা-জানলাগুলোর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। ছিটকিনি হুড়কো সব বন্ধ আছে তো ?

হঠাৎ নজরে পড়ল পূবের জানলার মাথার ছিটকিনিটা খোলা।

বললে—আরে, জানলাটা খোলা যে, তোমারও হুঁশ হয় নি—

বলে নিজেই উঠে গিয়ে জানলার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিলে দুলাল সা'। বাইরে থেকে আর কারও জানবার সুযোগ রইল না ভেতরে কি কথা হল দু'জনের।

বঙ্কু ছেলেটা সত্যিই কাজের বটে। এই এখানে যাচ্ছে, এই সেখানে দৌড়ল। ওষুধ ডাক্তার সব একলা সামলাচ্ছে। আবার একলাই সারা রাত জেগে হরতনের পাশে বসে মাথা টিপে দিচ্ছে। মাঝখানে যখন অবস্থাটা খুব খারাপ হয়েছিল হরতনের, তখন ছেলেটার দিন-রাত্রি জ্ঞান ছিল না একেবারে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে গিয়েছিল। বেটাছেলে যে এত কাঁদতে পারে তা আগে কখনও কেউ দেখে নি। তার কান্না দেখে কর্তামশাইও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বড়গিন্নীকেই সান্ত্বনা দেবার কথা। কিন্তু সে-ই সান্ত্বনা দিলে বঙ্কুকে।

বললে—কেঁদো না বাবা, দৈবের কৃপা যদি থাকে তো হরতন আমার বাঁচবেই—

তা সত্যিই হরতন আবার সেরে উঠল ক'দিনের মধ্যেই। আবার বঙ্কুর মুখে হাসি ফুটল। আবার হরতনের সামনে গিয়ে বললে—ক'দিন আগে তুমি আমায় যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে—

হরতন বললে—তুমি নাকি মেয়েমানুষের মত কেঁদেছিলে?

—কে বললে তোমায়?

—কেন, মা-মণি!

বঙ্কু যেন কেমন লজ্জায় পড়ল। বললে—তা তুমি শিগ্‌গির সেরে উঠলেই পার, তা হলে আর আমার কষ্ট হয় না—

হরতনও হাসে। বলে—কেন, মনে পড়ে না জোড়হাটে গিয়ে

আমায় কি-রকম কষ্ট দিয়েছিলে ? জ্বরের ঘোরে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে বমি করতে, আমার বুঝি কষ্ট হত না ? আমি অত করে বলতাম, বিড়ি খেও না, বিড়ি খেও না, তখন শুনতে তুমি !

—এখন তো ছেড়ে দিয়েছি। আজ কতদিন একটাও বিড়ি চোখে দেখি নি—

—সত্যি ?

হরতনের চোখে-মুখে যেন আনন্দের ঝলক্ খেলে গেল।

—সত্যি খাও না বিড়ি ?

—সত্যি ! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। যদ্দিন না তোমার অসুখ সারে তদ্দিন একটাও বিড়ি খাব না—করিয়াছি ধনুর্ভঙ্গ পণ !

হরতন আরও হেসে উঠল।

বললে—তোমার দেখছি এখনও পাট মুখস্থ আছে, এখনও ভোল নি—

বঙ্কু বললে—বাঃ, ভুলব কি করে ? তুমি ভুলে গেছ ?

—কবে !

হরতন ঠোঁট ওল্টাল। বলল—আমি আর সে-সব কথা ভাবি না। আমি সব ভুলে গেছি। কিছ্ছু মনে নেই—

—তুমি দেখছি সব পার !

—তার মানে ?

—তুমি দেখছি আমাকেও ভুলে যাবে কোনদিন !

হরতন বললে—ভুলে যাবই তো। তা বলে তুমি আর আমি তোমার সঙ্গে আমার তুলনা ? আমি তো জমিদারের নাতনী আর তুমি ?

বঙ্কু বললে—আমি জমিদারের নাতনীর প্রতিহারী—

হরতন বললে—তোমার চাকরিটা যা-হোক খুব ভাল হয়েছে ভাল-ভাল খাচ্ছ-দাচ্ছ, আরাম করছ, আর কাঁসি বাজাচ্ছ—

—কিন্তু মাইনে পাচ্ছি না—

—মাইনে পাচ্ছ না বলে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—না।

হরতন হাসতে লাগল। বলল—এ রকম প্রতিহারীর চাকরি তো ভাল। বিনি-মাইনের চাকরকে কোথায় পায় আজকাল, বল ? দেখছি ভাগ্যটা আমার খুবই ভাল—

বঙ্কু বললে—ভাগ্য ভাল না হলে কি আর জমিদারের নাতনী হতে পেরেছ ? কোথায় ছিলে আর কি হয়েছ ভাব তো ! তোমার জন্যে দাদু কত খরচ করছে জান ? কত বড় বাড়ি হয়েছে কত বড় বাগান হয়েছে, মোটর কিনেছে তো তোমার জন্যেই। তুমি চড়বে বলে—

সত্যিই কর্তামশাই হরতনের জন্যে যেন মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। দুটো গরু কিনেছিলেন হরতন দুধ খাবে বলে। কোথা থেকে সব ফল-ফুলরি আনাতেন হরতনের অসুখ ভাল হবে বলে। হরতন একটু খুশি হবে বলে ফুলগাছ পুঁতেছিলেন বাগানে। চারদিকে যখন ফুল ফুটবে তখন হরতন বাগানে বেড়াবে। গাড়ি কিনেছিলেন হরতন বেড়িয়ে হাওয়া খাবে বলে। জলের মত দুহাতে টাকা খরচ করেছিলেন। টাকার দরকার হলেই নিবারণ যেত দুলাল সা'র কাছে। আর টাকা নিয়ে আসত। আজ দুহাজার, কাল পাঁচ হাজার। দুলাল সা'র কাছে গেলে টাকার জন্যে কখনও দরবার করতে হয় নি। যাওয়া মাত্রই টাকা দিয়ে দিয়েছে। দুলাল সা' বলত—তুমি দেখছি নিবারণ বড় লজ্জা-লজ্জা করছ, আমার কাছে তোমার আবার লজ্জা কিসের হে ? কর্তামশাই কি আমার পর ?

নিবারণেরই একটু সঙ্কোচ হত।

বলত—আজ্ঞে অনেকগুলো টাকা হয়ে গেল তো।

—তা হোক, আমি তো বলেই দিয়েছি, হরতনের অসুখ না

সারা পর্যন্ত আমি টাকা দিয়ে যাব। তুমি জমি বন্ধক দিচ্ছ দাও, আমিও নিচ্ছি, কিন্তু এটা তো জানি মরতে একদিন সবাইকেই হবে। তোমার টাকা থাক আর না থাক, মৃত্যু কাউকেই রেহাই দেবে না—

নিবারণ বলত—তা তো বটেই—

—তবে ?

এর উত্তরে নিবারণ আর কিছু বলত না।

দুলাল সা' তখন নিজেই বলত—এই যা-কিছু টাকা-কড়ি বাড়ি-গাড়ি একদিন এ-সবই ফেলে রেখে চলে যেতে হবে, জানলে নিবারণ ? সব ফেলে রেখে যেতে হবে। থাকবে শুধু কর্ম ! এই যে তোমার বিপদে আমি দেখছি, আমার বিপদে তুমি দেখছ, এইটেই থাকবে শুধু, আর কিছুই থাকবে না হে, কিচ্ছু থাকবে না—এই তোমায় বলে রাখলাম—

তারপর এমনি করে একটা জমির তমস্সুক লিখে দিয়ে যেত নিবারণ আর টাকা নিয়ে যেত। সেই টাকা দিয়ে গরু কেনা হত, বাড়ি মেরামত হত, মোটরগাড়ি কেনা হত। হরতনের সুখ-সুবিধে-আরামের জন্যে যা করা দরকার সমস্ত করতেন কর্তামশাই।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ চণ্ডীবাবু এসে হাজির। চণ্ডীবাবু একলা নয়, দলের সবাই। ভাজনঘাট্ না কোথায় এসেছিল গান করতে। এতদূর এসেছে আর কেষ্টগঞ্জে এসে একবার মেয়েটাকে দেখে যাবে না ?

কর্তামশাইও অবাক্। বৈঠকখানার ঘরে বসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। সামনে মোটরটা থামতে ভেবেছিলেন বুঝি দুলাল সা'। দুলাল সা'ই বুঝি নতুন-বৌকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু না, গাড়িখানা পুরনো। ভাড়া করা গাড়ি। ভাঙা রং-চটা।

চণ্ডীবাবু বললে—তারপর আমার মেয়ে কেমন আছে বলুন ?

কর্তামশাই বললেন—চলুন, আপনি নিজের চোখেই দেখবেন চলুন—

চণ্ডীবাবু বললে—সবই ঈশ্বরের কৃপা ভট্‌চার্যি মশাই, ভগবান আপনার সহায়, আপনার ক্ষতি কে করতে পারবে বলুন—

—চলুন চলুন—হরতন আপনাকে দেখলেও খুশি হবে—চলুন—

সবাই উঠলেন—সঙ্গে ফটিকও ছিল। দলের আরও সবাই ছিল। সবাই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

কেষ্টগঞ্জের জীবনে এ-এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটা মানুষ একদিন সকলের কাছে মান্যগণ্য ছিল, সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসার পাত্র ছিল। একদিন এই কেষ্টগঞ্জের মানুষ কর্তামশাইকেই তাদের দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু কখন যে দিনকাল সব উল্টে গেল, দুলাল সা'ই তাদের নতুন দেবতা হয়ে গেল, তা তারা নিজেরাও টের পায় নি।

কিন্তু এতদিন পরে আবার যেন পাশার খেলা উল্টে যেতে বসেছে।

চণ্ডীবাবুকে দেখে হরতনও কেমন যেন আবার অনেক দিন পরে সতেজ হয়ে উঠেছে।

—কেমন আছ মা?

—বাবা।

শুধু মাত্র একটি কথা। কিন্তু ওই একটি কথাতেই দুজনের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কত মাস কত বছর কত রাত একসঙ্গে কেটেছে

বাপ আর মেয়ের। কত নগণ্য গ্রামের কত অখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপে এই মেয়েকে নিয়ে চণ্ডীবাবু যাত্রা করতে গিয়েছে। কত লোক কত মেডেল দিয়েছে এই মেয়েকে,আজ এইখানে কর্তামশাই-এর বাড়ির অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা মনে করতে ভাল লাগল। চণ্ডীবাবুর চোখের সামনে যেন রাণী-রূপকুমারীর রূপটা ভেসে উঠল জ্বল্‌জ্বল্‌ করে।

—কে করছে এখন রূপকুমারীর পার্ট বাবা?

—আর বলিস্‌ নি মা, তুই নেই, আর আমার সব গেছে। দল এবার তুলে দেব ভাবছি—

—না বাবা, দল তুলে দিতে পারবেন না। দল আমি তুলে দিতে দেব না—যা টাকা লাগে আমি দেব, দাদু দেবে—

কর্তামশাই পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—না না, দল কেন তুলে দেবেন আপনি? দল তুলে দেবেন না। আমি টাকা দেব—দল চালিয়ে যান—

চণ্ডীবাবু বললে—টাকা থাকলেই তো আর দল চালান যায় না কর্তামশাই, মেয়ে চাই যে! এই আপনার হরতনের মত আর একটা মেয়ে দিন, আমি দল চালাচ্ছি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—সায়েব-সুবোরা সেকালে ছিল, আমার এই মেয়ের পার্ট দেখে কত বক্‌শিশ্‌ দিয়েছে তা তো আমি ভুলি নি। এই মেয়েই তো ছিল আমার লক্ষ্মী কর্তামশাই, এই লক্ষ্মী যাবার পর থেকেই আমার দল ভেঙে পড়ছে—

তা কথাটা মিথ্যে নয়। যারা চণ্ডীবাবুর দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে তারাও হাড়ে-হাড়ে কথাটা বুঝেছে। তারাও জানে আর একজন ভাল 'রাণী রূপকুমারী' না পেলে ভাঙা দল আর জোড়া লাগান যাবে না।

কর্তামশাই বললেন—আমার বাড়ির উঠোনে একদিন গাওনা হোক চণ্ডীবাবু, আপনার খরচ-পত্তোর যা লাগে দেব—হরতনও একবার দেখবে যাত্রাগান—

চণ্ডীবাবু বললে—সে তো অতীব আনন্দের কথা কর্তামশাই—

—আমার পক্ষেও আনন্দের কথা চণ্ডীবাবু। আমার এখানে একজন নতুন বড়লোক হয়েছে সে কথায়-কথায় যাত্রাগান দেয়, আমার বহুদিনের ইচ্ছে আমিও একদিন যাত্রাগান দিই—

ভারি খুশী চণ্ডীবাবু।

—আপনার সামনে গাইব, এ তো আনন্দের কথা। তাহলে আমরা একবার ঘুরে আসি—বায়না নিয়ে বসে আছি দু' জায়গায়, সেটা সেরে ফেরবার পথে কেষ্টগঞ্জ ঘুরে যাব—

তারপর চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল চণ্ডীবাবু। কি চমৎকার বাড়ি। বাংলাদেশের অনেক বাড়ি দেখেছে চণ্ডীবাবু। অনেক রাজা-মহারাজার জমিদারিতে গিয়ে গাওনা করে এসেছে। কিন্তু এ যেন নিজের বাড়ি মনে হল তার কাছে।

চণ্ডীবাবু বললে—আপনার হওয়াও যা, আমার হওয়াও তাই কর্তামশাই—

কর্তামশাই বললেন—আমার আর বলছেন কেন, এ সবই তো আমার মা-র, আমার হরতনের—ওই মায়ের জন্যেই তো আমার আবার সব হল চণ্ডীবাবু। দয়া করে মা আমার এলেন ঘরে তাই লক্ষ্মী এলেন, নইলে এ সব তো শ্মশান হয়ে পড়ে ছিল এ্যাদ্দিন।

হরতনও শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। কিন্তু আর বেশিক্ষণ শুতে ভাল লাগছিল না।

বললে—আমি উঠব দাদু—

বঙ্কু ছিল পাশে। হাঁ হাঁ করে উঠল।

বললে—উঠ না, উঠ না—তোমার বুকে ব্যথা—

—তুমি থাম দিকি নি, আমার শরীর ভাল আছে কি না আমি বুঝি নে?

কর্তামশাই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন—না-ই বা উঠলে মা—

ফটিক সমস্ত বাড়িটা এতক্ষণ ঘুরে দেখে এসেছে। এত এলাহি কাণ্ড দিদিমণির! এতখানি কল্পনাও করতে পারে নি সে। ঘরের মধ্যে এসে বললে—তুমি যে সত্যিই রাজরাণী হয়েছ দিদিমণি—

হরতন হাসতে লাগল।

বললে—বাবা, ফটিক এখনও তোমার সেই তামাক চুরি করে খায়?

চণ্ডীবাবু ফটিকের দিকে চেয়ে বললে—ওই গ্যাখ, দিদিমণি এখনও তোকে মনে রেখেছে রে! ওর খাওয়ার কথা আর বল না মা, ওর পেট নিয়েই গেলাম—ওর পেটের মধ্যে হুতাশন ঢুকেছে—

চণ্ডীবাবুও কর্তামশাই-এর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সঙ্গে ফটিক বন্ধু সবাই। নিবারণও ছিল।

—এই দেখুন, আমার মা আসবার আগে এই সব ভেঙে পড়ে ছিল, এখন আবার সব জোড়া লেগেছে। আবার এক লাখ টাকা খরচ করে সব জোড়া লেগেছে। এ সবকিছুই মায়ের দয়ায়—

—কত টাকা খরচ পড়ল সবশুদ্ধ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, তা প্রায় এক লাখ—

—লাখ টাকা যে অনেক টাকা!

কর্তামশাই বললেন—তা অনেক টাকা লাগলে আমি কি করব? টাকা দেবার কি আমি মালিক চণ্ডীবাবু? মা-ই মালিক। মা নিজেই ফিরে এসেছেন, এখন মা নিজেই আবার নিজের থাকবার-খাবার ভোগ করবার ব্যবস্থা করছেন। মা নিজেই কেড়ে নিয়েছিলেন, এখন আবার নিজেই দিচ্ছেন, আমি আর কি করব? কি করতে পারি আমি বলুন?

ফটিক বললে—তাহলে আমাদের একদিন ভোজন করিয়ে দিন কর্তামশাই—

—তুই থাম্ তো ফটকে, থাম্ তো—

কর্তামশাই বললেন—না না, ফটিক তো অন্যায় কিছু বলে নি মশাই, আমার তো একদিন আপনাদের দল্‌বল্‌কে খাওয়ানই উচিত। আমাদের এখানে একটি লোক আছে, সে কথায় কথায় লোককে খাওয়ায় মশাই,—তা আমিও খাওয়াব চণ্ডীবাবু, কবে আপনাদের সময় হবে বলুন ?

চণ্ডীবাবু বললেন—কেন আবার ও-সব হ্যাঙ্গাম করতে যাবেন? ও ফটিকের কথায় কান দেবেন না আপনি! এই এত টাকা খরচ করে আপনি বাড়ি-ঘর সারালেন, আবার কেন মিছিমিছি টাকা খরচ করবেন ? এদের খাওয়ান মানেই তো ভূত-ভোজন করান—

চলতে চলতে সদরের দিকে আসতেই দেখা গেল বৈঠকখানা ঘরের সামনে দুলাল সা' আর নিতাই বসাক দাঁড়িয়ে আছে।

কর্তামশাইকে দেখেই দুলাল সা' উঠে দাঁড়াল।

অতি বিনীত ভঙ্গি। নীচু হয়ে হয়ে দুজনেই প্রণাম করলে।

—তোমার আবার কি দুলাল ? আবার কি চাও ?

দুলাল সা' সবিনয়ে বললে—আমি আর কি চাইব কর্তামশাই, আমার তো চাওয়ার আর কিছু বাকি নেই, আমি শুধু একটা কথা বলতে এলাম আপনাকে, আমার বিজয় আসছে বিলেত থেকে আগামী সোমবারে, আপনাকে অনুগ্রহ করে একবার আমার কুটিরে পদধূলি দিতে হবে—

কর্তামশাই বললেন—বিজয় আসছে সে তো ভাল কথা, তা আমি গিয়ে কি করব ?

—আজ্ঞে,আপনি আশীর্বাদ করবেন, আমার তো কেউ নেই। এক আছে নিতাই, তা সে একলা মানুষ, সে কদিক দেখবে ? আপনাকেই সব দেখতে হবে, আপনি না দেখলে কে দেখবে তাকে ?

কর্তামশাই হাসলেন মনে মনে। দুলাল সা' এখনও তার

চালবাজি ছাড়ে নি। এই চালবাজি দেখিয়েই একদিন তাঁকে ভুলিয়েছিল ছুলাল সা'। আর তিনি ভুলবেন না এখন থেকে।

বললেন—আমি? আমার কথা বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই নিতাইকেও তাই বলেছি, দেখবার তো অনেক লোকই আছে, কিন্তু সবাই কি আপনার মত করে দেখবে? তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না—

—কেন, তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

নিতাই বসাক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। সে-ই ছুলালের হয়ে বললে—ও তো চলে যাচ্ছে কর্তামশাই, ছেলে এলে ও আর সংসারে থাকবে না—

—থাকবে না মানে? যাবে কোথায়?

ছুলাল সা' বললে—যাব যেখানে ছুচোখ যায়। গুরু আমায় ডেকেছেন যে—

—থাকবে কোথায়? খাবে কি? টাকা-কড়ি কিছু লাগবে না? খরচ-পত্তর কে যোগাবে?

ছুলাল সা' হাসল।

—সংসারই যখন ছেড়ে দিচ্ছি, তখন আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাব কেন কর্তামশাই। মাথা ঘামাবার যিনি মালিক তিনিই মাথা ঘামাবেন। আমি কে?

তারপর একটু থেমে বললে—তা সে সব নিয়ে আমি ভাবছি নে, আপনি শুধু আমার কুটিরে এসে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাবেন, এই আমার বিনীত কামনা—

কর্তামশাই যেন তখনও ভাল করে তাল সামলাতে পারেন নি।

জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু তোমার এই এত সম্পত্তি? ছেলে সব দেখবে? ছেলে তো তোমার ডাক্তার! ডাক্তারি সে করবে কখন? আর ব্যবসাই বা কখন দেখবে?

দুলাল বললে—আমি আর ওসব নিয়ে ভাবব্ না কর্তামশাই, যিনি সব কিছু দিয়েছেন তিনিই সব দেখবেন। আর না দেখেন তো সব যাবে—সব গোল্লায় যাবে।

তারপর এতক্ষণে যেন চণ্ডীবাবুর দিকে নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে?

চণ্ডীবাবু নিজেই নিজের পরিচয় দিলে।

বললে—অধীনের নাম চণ্ডী শ্রীমানী—আমার যাত্রার দল আছে কলকাতায়।

নিতাই বসাক লাফিয়ে উঠল—ও, আপনিই বুঝি কর্তামশাই-এর নাতনীকে উদ্ধার করে দিয়েছেন?

চণ্ডীবাবু বললে—ছি, আমি কেন উদ্ধার করতে যাব? যাঁর কাজ তিনিই করেছেন, আমি তো কেবল নিমিত্ত মাত্র—

—খাঁটি কথা। খুব খাঁটি কথা বলেছেন চণ্ডীবাবু! আমরা কেউ কিছু নই, সবই তিনি। তিনি করান আর আমরা করি। তিনি যন্ত্রী আর আমরা যন্ত্র। লোকে কেবল আমি-আমি বলে বড়াই করে—

তারপর কর্তামশাই-এর দিকে চেয়ে দুলাল সা' বললে—তাহলে আসতে অনুমতি করুন কর্তামশাই, আমায় আবার সব বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে তো—

বলে আর একবার মাথা নীচু করে প্রণাম সেরে দুলাল সা' গাড়িতে গিয়ে উঠল। নিতাই বসাকও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কিন্তু সোমবারের আগেই ঘটনাটা ঘটল।

কবে একদিন কোন্ কুক্ষণে সদানন্দকে এনে ঢুকিয়েছিল দুলাল সা'। সে কবেকার কথা। কিংবা হয়তো সে নিজেই এসে ঢুকেছিল সা'মশাইয়ের পাটের আড়তে। কিন্তু সে যে এমন কাণ্ড বাধিয়ে যাবে তা কে জানত।

সেদিন দুলাল সা'র ছেলে এসেছে বিলেত থেকে। কলকাতার হাওড়া ইস্টিশানে তাকে আনতে গিয়েছিল সবাই। দুলাল সা', নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসার সময় গ্রামের সমস্ত লোক যাতে স্টেশনে ভিড় করে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফুলের মালা দিয়ে তাকে গ্রামের লোক অভ্যর্থনা করবে। ক্যামেরা দিয়ে ফোটো তোলা হবে। আর ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সুকান্ত রায় তার জীপ-গাড়িটা নিয়ে দলবল সমেত হাজির থাকবে।

সুকান্ত শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল সবাইকে। ট্রেনটা এসে পৌঁছলেই একজন চিৎকার করে উঠবে—বন্দেমাতরম্—

আর সবাই এক সুরে বলে উঠবে—বন্দেমাতরম্—

একজন জিজ্ঞেস করেছিল—বন্দেমাতরম্ কেন? এ তো স্বদেশী ব্যাপার নয়—

সুকান্ত বলেছিল—স্বদেশী ব্যাপার নয়ই বা কেন বল? সা'মশাই-এর ছেলে ফিরে আসছে দেশের উপকার করতে—জননী-জন্মভূমির সেবা করতে, তাতে দেশেরও কল্যাণ হবে, আমাদের সকলেরই ভালো হবে—

নিতাই বসাক বলেছিল—দরকার হলে সকলকে মাথাপিছু আট আনা করে জলখাবার খাইয়ে দেবেন—অতক্ষণ ধরে রোদে পুড়বে সবাই, কেউ যেন না বিরক্ত হয়, দেখবেন—

সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল।

তুলাল সা' এই ছেলের বিলেত থেকে ফেরার দরুন হাজার পাঁচেক টাকার বাজেট তৈরি করেছিল। এত লোকের জলখাবার, তারপর দান-ধ্যান, তারপর কেষ্টগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে পুলিস-কমিশনার সকলের কাছে মাছ-দই-মিষ্টি পাঠানোর প্ল্যানও ছিল। মোটমাট এলাহি কাণ্ড করে ফেলেছিল সা'মশাই।

কিন্তু বাড়িতে এসে সরাই যখন বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত, তখন সা'মশাই হঠাৎ কান্তকে জিজ্ঞেস করলে—কি রে কান্ত, কর্তামশাই-এর বাড়ি থেকে কেউ আসে নি ?

কর্তামশাই-এর বাড়িতে কে আর আছে যে আসবে। আসলে এক আসতে পারে কর্তামশাই, আর না হয় নিবারণ।

তা নিবারণ সরকার এসেছিল।

—নিবারণ এসেছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সা'মশাই, আপনি কলকাতায় যাবার পর সরকার মশাই এসেছিল টাকার জন্যে।

—তা টাকা দিয়েছিস ?

—আমি কি করে দিই, আজ্ঞে।

—কত টাকা ?

—বলছিল হাজার তুয়েক !

—কেন অত টাকা আবার দরকার হল হঠাৎ ? বাড়ি-গাড়ি সব তো হয়েই গেছে আগে।

কান্ত বললে—আজ্ঞে নাতনীর নাকি আবার বড় বাড়াবাড়ি —কলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার আসছে, মোটা-মোটা টাকা

নিচ্ছে, ওষুধ-পত্তোর অনেক খরচ চলছে—তাই আমার কাছে এসেছিল টাকা নিতে—

দুলাল সা' জিজ্ঞেস করলে—তুই কি বললি ?

—আমি আর কি বলব সা'মশাই, আমি বললাম সা'মশাই নেই, আমি কি করে হাতচিটে নিয়ে টাকা দেব—

—নিবারণ কি বললে ?

—কি আর বলবে, ফিরে গেল। অন্য কোথাও টাকা হাওলাৎ করতে গেল বোধহয়, আমি আর ও-সব জিজ্ঞেস করি নি। দেখলাম চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে—

তখন বাড়িতে লোক-জন আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা। এতদিন পরে ছেলে এসেছে ডাক্তার হয়ে। এও যেন ঠিক আবার তার নতুন করে বিয়ে হচ্ছে আজ। তার বিয়ের দিনের মতই উৎসব আরম্ভ হয়েছে বাড়িতে। তফাৎ শুধু এই যে, সেই গোলগোবিন্দ ঘটক শুধু নেই। সেই বৌভাতের রাত্রে সেই পাগলের মত বিড় বিড় করে বকা নেই। সেই সদানন্দকে খোঁজা নেই। সেই পনেরো ভরি সোনার জন্যে হা-হুতাশ নেই। আজ এখানে শুধুই আনন্দ।

সকাল থেকেই সবাই আসছে-যাচ্ছে আর অতিথিদের আপ্যায়ন চলেছে।

কান্ত হঠাৎ এসে বললে—সা'মশাই, নিবারণকে দেখে এলাম—

—নিবারণকে ? কোথায় ? কি বললে সে ?

—জিজ্ঞেস করছিল আপনি বাড়ি আছেন কি না ?

—তুই কি বললি ?

—বললাম এখন সা'মশাই বড় ব্যস্ত আছেন।

—তা জিজ্ঞেস করলি না কি জন্যে দেখা করতে চায় ?

—হ্যাঁ, বললে কিছু টাকার দরকার ছিল। হরতনের অসুখ নাকি বেড়েছে খুব ক'দিন থেকে। এই যায়, সেই যায়।

—আচ্ছা, তুই যা—

কান্তকে কথাটা বলে কাছ থেকে সরিয়ে দিলে সা'মশাই। তারপর কান্ত চলে যেতেই আবার ডাকলে।

—শোন্ কান্ত, শুনে যা—

তারপর কান্ত কাছে আসতেই দুলাল সা' বললে—তুই একবার কর্তামশাই-এর বাড়িতে যেতে পারবি ?

কান্ত বললে—কেন পারব না সা'মশাই—

—তাহলে যা। হাজার দু-এক টাকা নিয়ে যা তুই কর্তামশাই-এর কাছে। বলবি, আমি টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছি—

—আর কিছু বলতে হবে ?

—না।

কান্ত ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে চলে যেতেই দুলাল সা' আবার মালা জপতে বসল। কাছারি-ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলে ভেতর থেকে। আজকে সবাই তার সঙ্গেই কথা বলতে চাইবে। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতেই ভাল লাগল না আর। বিজয় আসবার পর থেকেই যেন কেমন সব ওলট পালট হয়ে গেল। এতদিন বিলেতে থেকে ছেলে যা হবে ভেবেছিল তা হয় নি। বিজয় সেই রকমই আছে। কলকাতা থেকে এখানে এই কেষ্টগঞ্জে আসা পর্যন্ত একটা সিগারেট কি চুরোট পর্যন্ত খেলে না। ট্রেন থেকে নেমে সমস্ত লোকের সামনে সেই প্লাটফর্মের ওপরেই দুলাল সা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। এমন হবে ভাবে নি দুলাল সা। অথচ অন্য রকম হলেও কিছু বলবার ছিল না।

—রাস্তায় তোমার কোনও কষ্ট হয় নি তো বাবা ?

—না, আপনি কেমন আছেন ?

দুলাল সা' সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তোমার নিতাইকাকার পায়ের ধুলো নিলে না যে ?

সত্যিই চিনতে পারে নি বিজয়। সে কত বছর আগের কথা যেন। যেন তার চোখে সবাই বদলে গেছে। এই হাওড়া স্টেশনের চেহারাটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। তারপরে কেষ্টগঞ্জের স্টেশনে নেমেও চারদিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিজয়।

—ওই দেখ, ওই আমাদের সুগার-মিল। চিম্‌নি দেখা যাচ্ছে—

—ওই দেখ, ওই আমাদের নতুন গদি-বাড়ি—

দুলাল সা'র নতুন বাড়িটাও দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। বিজয় যখন কেষ্টগঞ্জ থেকে যায় তখন এ-বাড়ি এত বড় হয় নি। তখন ছোট বাড়ি ছিল। চারিদিকে পাঁচিল দিয়েও ঘেরা ছিল না। আজ চারদিকে বাগান হয়েছে। কেষ্টগঞ্জের সমস্ত গাঁ ঝেটিয়ে এসে হাজির হয়েছে স্টেশনে।

—ইনি হলেন মিস্টার সুকান্ত রায়, আর ইনি মিসেস রায়, এঁর স্ত্রী—নিতাই বসাক পরিচয় করিয়ে দিলে।

সমস্ত লোকের ভিড়ের মধ্যেও দুলাল সা' কেবল একখানা মুখ খুঁজছিল। কর্তামশাই-এর এখানে আসাটা অসম্ভব কথা। সে কখনও সম্ভব হতে পারে না। এখানে তাঁকে আশা করাই অন্যায়। তবু যেন একবার দেখাতে ইচ্ছে হল দুলাল সা'র। অনেক ঐশ্বর্য, অনেক বিলাস অনেক ব্যসন হয়েছে দুলাল সা'র। আজকে তার বিজয়ের পাস করে কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসাটাও একটা ঐশ্বর্য। এ-ঐশ্বর্যটা যেন কর্তামশাইকে দেখাতে পারলে ভাল হত।

হঠাৎ নজরে পড়ল। দেখলে দূরে প্ল্যাটফর্মের এক পাশে নিবারণ যেন মানুষের ভিড়ের মধ্যে হিম্‌সিম্ খেয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এখানে নিশ্চয় বিজয়কে দেখতে এসেছে।

—ও নিবারণ, নিবারণ—

ভিড়ের মধ্যেই একবার ডাকতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ততক্ষণে

নিবারণ অন্যদিকে চলে গেছে। দুলাল সা' ভাল করে সেই দিকে ফিরে দেখবার চেষ্টা করলে। সেই ট্রেন থেকেই বুঝি কে একজন নামল। সেই একই ট্রেন থেকে। কোট-প্যাণ্ট পরা চেহারা। গলায় ডাক্তারের স্টেথিস্‌কোপ ঝুলছে। সঙ্গে আর একজন লোক। তার হাতে একটা ব্যাগ। বোধহয় ডাক্তারের ব্যাগ।

—ওদিকে কি দেখছেন সা'মশাই ?

—ও কে বল তো হে, নিবারণ মনে হচ্ছে না ?

লোকটা বললে—হ্যাঁ সা'মশাই, নিবারণ যে ইস্টিশানে, কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে কি না এই ট্রেনে—

ওই পর্যন্ত! কেষ্টগঞ্জের প্ল্যাটফরমে ওই পর্যন্তই। তারপর দলে দলে লোক এসেছে বাড়িতে। সবাই বিজয়কে দেখতে এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার এলাহি কাণ্ড হয়েছে বাড়িতে। লুচি-মাংসর গন্ধে গঞ্জের বাতাস একেবারে ভরপুর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস-কমিশনার সাহেব সবাই এসে খেয়ে গেছে। গ্রামের কাওরা-বাগ্দী-মালোরা এখনও উঠোনে বসে খাচ্ছে। কিন্তু দুলাল সা' সকলের কাছ থেকে দূরে কাছারি-ঘরের মধ্যে বসে নিজেকে যেন আড়াল করে রেখেছে। কর্তামশাই কোনওদিন আসেন না এ-বাড়িতে। একবার মাত্র এসেছিলেন। সে সেই গুরুদেব আসার দিনে। নিজের কোষ্ঠি দেখাতে। তারপর থেকে কেবল নিবারণকে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। আর আসেন নি। এবার দুলাল সা'র বলে আসা কর্তব্য। তাই বলতে গিয়েছিল কর্তামশাইকে। আর সকলের সঙ্গে তাঁকে নেমন্তন্ন করে এসেছিল।

—বাবা!

হঠাৎ নতুন-বৌ অন্ধকার ঘরে ঢুকে অবাক।

—আপনি এখানে বাবা, আর আমরা আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছি। আপনার শরীর খারাপ নাকি ?

—না মা, শরীর খারাপ নয়। তুমি আমার জন্যে ভেব না।

—কিন্তু আপনার খাওয়া ?

—আমি আজ খাব না মা, আর খেলেও তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

তারপর একটু থেমে দুলাল সা' আবার জিজ্ঞেস করলে—বিজয় কোথায় ?

—উনি তো ওপরে, ওঁকে খাইয়ে দিয়েছি—

—তুমি মা আজকে বিজয়কেই দেখ। এতদিন পরে বিজয় এল, তুমি ওকেই দেখ, আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

—সে বললে শুনব না বাবা।

বলে নতুন-বৌ একেবারে দুলাল সা'র সামনে এসে তার হাত ধরলে।

—আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দিয়েছি, সব জোগাড়-যন্তর করেছি, আর আপনি এখানে এমনি করে বসে থাকবেন তা হবে না। আহ্নিক সেরে জল খেয়ে আপনি যা খুশী করুন আমি কিচ্ছু বলতে যাচ্ছি নে—অনেক রাত হয়েছে—

দুলাল সা' নতুন-বৌ-এর মুখখানার দিকে ভাল করে চাইলে। ভাল করে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলে। যেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিতে চাইলে। যেন না মিললেই ভাল হয়।' না মিললেই যেন সব দিক রক্ষে হয়।

হঠাৎ বাধা পড়ল।

কান্ত এসে হাজির।

—কি রে দিয়ে এলি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হাতে দিলি ?

—নিবারণ সরকারের হাতে।

—ঠিক আছে।

কথাটা বলে কান্ত চলে যাচ্ছিল।

দুলাল সা' আবার ডাকলে—হ্যাঁরে কান্ত শোন, রোগীর অবস্থা কেমন দেখলি ?

কান্ত বললে—মনে হল খারাপ—কলকাতা থেকে তিনজন ডাক্তার এসেছে—নিবারণ সরকারের মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। হাত-চিটেতে সই নিয়ে আমি চলে এলাম, ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না—

কান্ত চলে যেতেই নতুন-বৌ জিজ্ঞেস করলে—হরতনের কথা বলছেন বুঝি বাবা ?

কথাটা চাপা দেবার জন্যেই দুলাল সা' উঠে দাঁড়াল।

বললে—তোমার আর আজকে ও-সব কথা শোনবার দরকার নেই মা, আজকে এত বছর পরে বিজয় এল, তুমি যেন কিছু পাগলামী করো না—

বলে দুলাল সা' নতুন-বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে চলতে লাগল।

কিন্তু রাত যখন অনেক, যখন কেষ্টগঞ্জের সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে, যখন শুধু রাস্তায় ঘেয়ো কুকুরগুলো এঁটো কলাপাতা নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করেছে দুলাল সা'র সদরের সামনে, তখন হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল দুলাল সা'র।

প্রথমটায় তন্দ্রার ঘোর ভাল করে কাটে নি।

কিন্তু দ্বিতীয়বার শব্দ হতেই কানটা সজাগ হয়ে উঠল।

—বল হরি, হরিবোল।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুলাল সা' নিজের দুই কান দুই হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিলে। যেন কানে হাত চাপা দিলে পৃথিবীর লোকের কান থেকে শব্দটা চেপে রাখা যাবে।

কিন্তু হাতটা আবার একটু আলগা করতেই সেই শব্দটা আরো জোরে কানে এল। আবার কান চাপা দিলে। আর যেন শব্দটা না শুনতে হয়। কিন্তু শব্দটা তখন কাছে এসে গেছে। তখন আর কান দু'টো দু হাতে চাপা দিয়েও শব্দটা চেপে রাখা গেল না। তখন শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—বল হরি, হরিবোল !

সকাল বেলাই দুলাল সা'র কাজ-কর্ম শুরু হয়ে যায়। সকাল মানে সেই যার নাম ভোর পাঁচটা। সেই ভোর পাঁচটার সময়ই নিত্যকর্ম পালন করা তার চিরকালের নিয়ম। ইছামতীর ঘাটে গিয়ে নিজের হাতের ঝাঁটা দিয়ে সিঁড়ি ধোয়া।

কিন্তু সেদিন মনটা বড় খারাপ ছিল। দুলাল সা'র নিজেকেই যেন বড় দুর্বল মনে হতে লাগল। এ-রকম দুর্বলতা দুলাল সা'র অনেকবার মনে উদয় হয়েছে। কোনটা বল আর কোনটা দুর্বলতা তা নিয়ে দুলাল সা' বহুকাল মাথা ঘামিয়েছে। কিন্তু এখন এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল যেখান থেকে তাকে আর নাড়াবার ক্ষমতা নেই কারও। যদি বল অত্যাচার, যদি বল অন্যায় তো তারও উত্তর আছে দুলাল সা'র কাছে। উত্তরটা বাইরের লোককে দেয় না, দেয় সে নিজেকেই।

কেউ যখন কাছে থাকে না, তখন অনেক সময় হরিনামের মালা নিয়ে জপ করতে করতে নিজের সঙ্গেই কথা বলে।

বলে, আমি কি করব বল, পৃথিবীটাই যে এই রকম হয়ে গেছে গো, আমি ভাল থাকতে চেষ্টা করলেও যে কেউ আমাকে ভাল থাকতে দেবে না—

আবার বলে—কেউ কেউ বলে আমি নাকি সাধুপুরুষ! তা কে বললে আমি সাধুপুরুষ নই? টাকা আছে বলেই তো লোকে আজ আমাকে সাধুপুরুষ বলে—আগে কর্তামশাই-এর টাকা ছিল, তখন কর্তামশাইকেও লোকে সাধুপুরুষ বলত—

তারপর মালাটা আর একটু জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, এইবার এখানে একটা বড় করে আমার পাথরের মূর্তি করে দিয়ে যাব, যাতে মারা যাবার পর সবাই আমাকে পুজো করে—

মনে মনে প্ল্যানটাকে বেশ তারিফ করতে লাগল দুলাল সা'।

—আর তারপর টাকা থাকলে আরও অনেক কিছু করা যায়। যেমন ধর ছেলেদের টেক্‌ষ্ট বইতে নিজের জীবনীটাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। শুধু টাকা খরচ, আর কিছু নয়। তারপর ধর ইস্কুলে ইস্কুলে সেই বই পড়াবার ব্যবস্থাও করা যায়। টাকা দিলে কেন পড়ানো হবে না? হেড-মাস্টারদের টাকা দেওয়া হবে। টাকা থাকলে তো আরও অনেক কিছুই করা যায়।

দুলাল সা' নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলে, কি করা যায় শুনি?

—কেন? এই যে কেষ্টগঞ্জ, এই কেষ্টগঞ্জের নামটা পর্যন্ত বদলে দুলালগঞ্জ করা যায়।

—তাও করা যায়?

—খুব করা যায়। কলকাতার রাস্তার নাম বদলাচ্ছে লোকে টাকা দিয়ে, আর এই গাঁয়ের নাম বদলানো যাবে না?

বেশ! বেশ! প্ল্যানটা মাথায় আসতেই দুলাল সা'র মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল আবার। তাহলে একেবারে অমর হয়ে যাওয়া গেল। দুলাল সা'কে আর কেউ ঠেকাবার রইল না তাহলে। এবার বিদ্যাসাগর, রবি ঠাকুর, গান্ধীর সঙ্গে তার নামটাও চিরস্থায়ী হয়ে গেল। স্টেশনের নামটাও বদলানো যায়। রেল-অফিস তো ঘুষের রাজা। টাকা দিলে তারা সমস্ত করতে পারে।

তাও দেওয়া যাবে। ঘুষ দিলে যদি স্টেশনের নাম বদলায় তো তাও দেওয়া যাবে। এক হাজারে যদি না হয় তো এক লাখ দেব। এক লাখে না হলে ত্বলাখ দেওয়া যাবে। নিতাই বসাক বলছিল, কলকাতার কোন হাসপাতালেও নাকি টাকা দিয়ে কোন মাড়োয়ারী নিজের নাম করে দিয়েছে। তখন ইস্টিশানে রেলগাড়ি এসে থামবে। প্যাসেঞ্জাররা জিজ্ঞেস করবে—এটা কোন ইস্টিশান গো?

লোকেরা বলবে—এ ত্বলালগঞ্জ।

—ত্বলাল সা'র নামেই বুঝি এর নাম হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের এই গাঁয়েই তিনি থাকতেন, বড় সাধু-পুরুষ ছিলেন। চিরজীবন নিজের হাতে এই নদীর ঘাট ঝাঁটা দিয়ে ধুতেন তিনি, বড় দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি—

আসলে তো এমনি করেই বড়লোকদের নাম ছড়ায়। ছোট-বেলা থেকে বইতে তারা বিদ্যাসাগরের নাম পড়ে। প্রথম ভাগ পড়ে। নইলে সবাই-ই তো মানুষ। মানুষের দোষ-ত্রুটি থাকবে না, এ-ও একটা কথা হল? তেমন টাকা দিলে ত্বলাল সা'কেও তারা বিদ্যাসাগর করে তুলতে পারে। ত্বলাল সা'র দান-ধ্যানের খবর বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিতে পারে। মোট কথা সবই হয়, সবই সম্ভব।

বেশ ভোর হয়ে আসছিল।

স্নান করে মালা জপতে জপতে বাড়ির দিকে আসছিল ত্বলাল সা'। কাল রাত্রে কেমন বিদঘুটে একটা শব্দ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। সবই নশ্বর এ-পৃথিবীতে। একমাত্র নামই সত্য। তাই কথায় আছে—নামৈব কেবলম্—

—নমস্কার সা' মশাই!

—কে?

—আজ্ঞে আমি সতীশ!

—সতীশ! কোন্ সতীশ? বিধু স্যাকরার ছেলে সতীশ, না শশী কবিরাজের জামাই সতীশ? কোন্ সতীশ?

—আজ্ঞে না, আমি ব্লক-অফিসের কেরানী সতীশ জোয়ার্দার।

—ও, তা তুমি বুঝি ওই সুকান্তবাবুর আপিসে চাকরি কর বাবা? ভাল, ভাল। ভোরবেলা বেড়াচ্ছ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—খুব ভাল। ভোরবেলা বেড়াবে আর ওই সঙ্গে যদি বাবা মনে মনে একটু হরিনাম করতে পার তো আরও ভাল। কলিযুগে নামই সত্য, আর সবই মিথ্যে—জান তো, শাস্ত্রে আছে—নামৈব কেবলম্—

সতীশ জোয়ার্দার কথাটা বুঝল কি না কে জানে। হয়তো বুঝল, হয়তো বুঝল না।

বললে, আজ্ঞে, আমাদের কি আর অত পুণ্যফল আছে সা' মশাই? এই দেখুন না, কলকাতা থেকে চাকরি নিয়ে এই বন-জঙ্গলে এসে পড়েছি, কত লোক কলকাতায় চাকরি করছে, আরাম করে সেখানে বাড়ির ভাত খেয়ে টাকা রোজগার করছে, আর আমার বেলাতেই এই কর্মভোগ—

—ছি বাবা, ছি—বলে দুলাল সা' মালা জপ করতে করতেই হাত দুটো হরির উদ্দেশে কপালে ঠেকাল।

বললে, শ্রীহরির কাছে কেউ ছোট-বড় নয় বাবা সতীশ, তাঁর কাছে সবাই সমান। এই যে বাবা আমার কথাই ধর না, আমি যে বাবা এত টাকা করেছি, তার জন্যে কি এই ঘাট ধোওয়া বন্ধ করেছি? তোমাদের টাকা হোক তখন দেখবে বাবা টাকায় শান্তি নেই। টাকা থাকাও যা, ও না-থাকাও তাই। শান্তি যদি পেতে চাও বাবা তো হরিনাম সার কর, দেখবে তোমার ওই টাকা চাকরি সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাবে—

সতীশ বললে, আপনার ছেলে কালকে এসেছেন বিলেত থেকে—

—কেন, তোমরা আস নি? তোমাদেরও তো নেমন্তন্ন করেছিলাম—

—হ্যাঁ, এসেছিলাম বৈ কি! অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই আর ব্লকে ফিরে যাই নি, এখানেই এক বাড়িতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি।

বাড়ির কাছে আসতেই হঠাৎ যেন দুলাল সা'র চোখ দুটো কিসের ওপর আটকে গেল। পুলিস-দারোগা মনে হচ্ছে। ভাল করে ভোর তখনও হয়নি কেষ্টগঞ্জে। ভোর হতেই কেষ্টগঞ্জের থানা থেকে পুলিস-দারোগা এল কি করতে?

সামনে এগিয়ে গিয়ে দুলাল সা' আগ বাড়িয়ে বললে, কি বাবা, আবার কি হল? কিছু বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি?

নিতাই বসাককে এতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় নি। দুলাল সা'কে দেখে সে এগিয়ে এল।

—কি হল? সদানন্দর খুনের কিছু কিনারা করতে পারলে বাবা তোমরা?

নিতাই বসাক বললে, সেই সব এনকোয়ারী করেই এঁরা আমাদের কাছে এসেছেন—

—ধরা পড়েছে তাহলে? অপরাধীকে কিন্তু শাস্তি দেওয়া চাই বাবা, আমার বড় আপন-জন ছিল সদানন্দ। সদানন্দ যাবার পর থেকে আমার পাটের গদির সব তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে বাবা, তেমন লোক আর একটা পাচ্ছি নে—

নিতাই বসাক বললে, না, তা নয়—

দারোগাবাবু বললে, আসলে সেই সদানন্দর মার্ডার-কেস নিয়েই এতদিন এনকোয়ারী চলছিল, সেই এনকোয়ারী করতে করতেই আমরা খেই ধরে বড়-চাতরায় গিয়েছিলাম—

—বড়-চাতরা ? সে কোথায় ?

—আজ্ঞে, বর্ধমান জেলায়।

—তা, সেখানে সদানন্দর কে ছিল ? সদানন্দর তো তিনকূলে কেউ নেই জানতাম—

—কেউ নেই বটে, কিন্তু একজন আছে।

তুলাল সা' জিজ্ঞেস করলে, কে সে ?

—আপনি তাকে চিনবেন। তার নাম দোলগোবিন্দ প্রামাণিক।

তুলাল সা' নামটা আওড়ালে। দোলগোবিন্দ প্রামাণিক ! চিনতে পারলে বলে মনে হল না।

নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি চেন নাকি ?

নিতাই বসাককে আর উত্তর দিতে হল না। দারোগাবাবু বললে —সে একজন ঘটক, ঘটকালি করা তার পেশা, আপনার ছেলের বিয়ে দিয়েছিল সে—

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—

যেন এতক্ষণে মনে পড়ল নামটা। বললে, কিন্তু সে তো মাথা-গরমের লোক, বৌভাতের দিন কিছু খেলে না দেলে না, শুধু মাথা-গরম করে বিড় বিড় করতে লাগল—

—কেন বিড় বিড় করতে লাগল আপনি কিছু জানেন ?

—কেবল বলছিল তার পনেরো ভরি সোনা নাকি কে ঠকিয়ে নিয়েছে !

—না, ওটা বাজে কথা। আমরা বড়-চাত্‌রায় গিয়ে তার স্টেটমেণ্ট নিয়ে এসেছি। এখন সে অন্যরকম লোক।

—তা, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারলে না বাবা। তার সঙ্গে একবার কথা বলতাম। জিজ্ঞেস করতাম কেন সে সদানন্দকে খুন করতে গেল !

দারোগাবাবু বললে—না, সদানন্দকে সে খুন করে নি।

—তা হলে? তা হলে কে খুন করলে?

—তার ইন্‌ভেস্টিগেশন এখনও চলছে।

তারপর দারোগাবাবু চারদিকে চাইলে একবার।

জিজ্ঞেস করলে, আপনি কে?

সতীশ জোয়ার্দার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল। বললে —আমি সতীশ জোয়ার্দার, ব্লক-আপিসের কেরানী—

দুলাল সা'র দিকে চেয়ে দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে, এর সঙ্গে আপনার কিছু দরকার আছে? আপনার সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাই আমরা—

কেউ-ই বলতে গেলে ছিল না তখন আশে-পাশে এক সতীশ জোয়ার্দার ছাড়া। কথাগুলো হচ্ছিল দুলাল সা'র কাছারি-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। পাশেই কান্তর বসবার কুঠুরি। তখন তার আসবার কথা নয়। একটু পরেই গদি-বাড়ির চাবি নিতে আসবে দারোয়ান। গরুর দুধ দুইতে আসবে কেরষাণ। তারপর আসবে খাতক, দেনদার, চাষী, প্রজা। তখন দুলাল সা' নতুন করে এখানে মহাজনি করতে করতে হরিনামের মালা জপবে। তখন তমস্সুক, দলিল, দস্তাবেজ লেখা হবে। কান্তই বলতে গেলে দুলাল সা'র খাজাঞ্চিকে খাজাঞ্চি, আবার মুহুরীকে মুহুরী। আগে ওই সদানন্দই এই কাজ করত। সদানন্দই সব হিসেবের গরমিল, ইনকাম ট্যাক্সের গোঁজামিল, ব্ল্যাক্-টাকার হিসেব-পত্তোর রাখত।

দুলাল সা' বললে—আচ্ছা বাবা সতীশ, তুমি বাবা এস এখন। দেখছ তো, একটু যে ধীরে-সুস্থে হরির নাম করব, সংসারে তাতেও অনেক বাধা—

সতীশ আর দাঁড়ায় নি। সে যেন চলে যেতে পারলেই বাঁচে।

নিতাই বসাক বললে—চল, এখানে নয়, বাইরের লোক কেউ এসে যেতে পারে, এ-সব কথা নিরিবিলিতে হওয়াই ভাল।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

তুলাল সা' বুঝতেই পারছিল না এত লুকোচুরি করবার কি দরকার। সদানন্দ খুন হয়ে গেছে। তার খুনের কিনারা তোমরা কর। পারলে খুনীকে ধর। ধরে তার ফাঁসি দাও। আমাদের তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! তাছাড়া কালকেই বিজয় এসেছে বিলেত থেকে কতকাল পরে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত সবাই খাওয়া-দাওয়া করেছে। এখনও বাড়ির সামনে কলাপাতার ডাঁই পড়ে আছে। ভাঙা মাটির খুরি-গেলাস পড়ে আছে। আর তারপর এই ভোরবেলাই আবার এ কি হ্যাঙ্গাম রে বাবা!

ঘরের ভেতরে একটু তবু আড়াল হল।

দারোগাবাবু বললে—আপনার তো একই ছেলে, ওই কালকে যিনি বিলেত থেকে এলেন!

নিতাই বসাক বললে, হ্যাঁ।

—আপনি কোথায় বিয়ে দিয়েছেন সেই ছেলের ?

—নদীয়া জেলার মালিকান্দায়, মালিকান্দার সামন্ত-বাড়ির মেয়ে আমার বৌমা, আমি বলি নতুন-বৌ—

—সেখানে কে আছে আপনার ছেলের শ্বশুরবাড়িতে ?

নিতাই বসাক বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সদানন্দর খুনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের ?

দারোগাবাবু বললে—আছে বসাকবাবু, আছে। কিছু সম্পর্ক না থাকলে কি আর মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছি! দোলগোবিন্দ প্রামাণিক আমাদের কাছে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি।

তারপর তুলাল সা'র দিকে ফিরে বললে—এত কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি বলে আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।

আপনি ভাল করে দেখে-শুনে খোঁজ-খবর নিয়েই ছেলের বিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয় ?

—ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

—কেন জিজ্ঞেস করছি তা শিগগিরই জানতে পারবেন। আমিও চাই দোলগোবিন্দর কথা মিথ্যে হোক্। দোলগোবিন্দর কথা মিথ্যে হলে আমিও আপনার মতই খুশী হব।

নিতাই বসাক বললে, দোলগোবিন্দ পাগল মানুষ, তার স্টেট-মেণ্টের দাম কি ?

—দাম আমাদের কাছে আছে।

দুলাল সা' বললে, তা তো বটেই বাবা, সদানন্দর খুনের যদি তাতে কিনারা হয় তো নিশ্চয় দাম আছে—

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন কি যে সত্যিকারের সামন্ত-বাড়ির মেয়ে আপনার বৌমা ?

—তা দেখেছি বৈ কি বাবা। ছেলের বিয়ে দেব, আর খোঁজ-খবর নেব না ?

—কিন্তু দোলগোবিন্দ বলেছে, আপনার ছেলের সঙ্গে নাকি সে জেলের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে—

—জেলের মেয়ে ? বলছেন কি আপনি !

হঠাৎ নতুন-বৌ এই সময়ে ঘরে ঢুকল !

বললে, বাবা—

তারপর পুলিস-দারোগাকে দেখে কেমন অবাক্ হয়ে গেল। বললে—আপনার পুজোর জোগাড় করেছি যে বাবা—

দারোগাবাবু, নিতাই বসাক, দুলাল সা' সবাই নতুন-বৌ-এর দিকে যেন অন্য দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এ কি কাণ্ড ! এমন হবে তা কি জানত কেউ ! নতুন-বৌ-এর মুখে কি তার কোনও ছাপ পড়ে আছে এখনও ?

ভাদ্র মাসটাই যাত্রাদলের পক্ষে খারাপ মাস। তখন তেমন পুজো-টুজোও কোথাও থাকে না। বিয়ে-শাদিও হয় না সে-সময়ে। যাকে বলে মল-মাস, ভাদ্র মাসটাই আসলে তাই। সে-সময়ে চণ্ডীবাবুর দল আবার চিৎপুরের অফিসে বসে কেবল চেয়ার-টেবিলে ধূনো-গঙ্গাজল ছিটোয়। তখন আবার গণেশের কপালে ফুল-চন্দন জোটে।

চণ্ডীবাবু চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল এক-একবার।

চণ্ডীবাবু বলে—এবার দল তুলে দেব রে ফটিক—

ফটিক তামাক সাজতে সাজতে বলে—আর তো ক'টা দিন অধিকারী মশাই, আর ক'টা দিন দেখুন না—

—আরে দূর, একটা পয়সা আমদানী নেই, খাবার বেলায় অনেক-গুলো পেট—

ফটিক বলে—আজ্ঞে আমি তো ক'দিন ধরেই খাচ্ছি নে—

—কেন? খাচ্ছিস্ নে কেন?

চণ্ডীবাবু ফটিকের দিকে চাইলে। ফটিকটার কপালে যেমন বকুনিও জোটে, আবার স্নেহও তেমনি কম জোটে না। ফটিক তা জানে। নইলে এত কাল ধরে ফটিক আছেই বা কেন এ-দলে।

—কেন? তোর আবার কি হল? তুই আবার খাচ্ছিস না কেন?

ফটিক বললে—আজ্ঞে আমদানী-টামদানী কিছু নেই—

—তা আমদানী নেই বলে তুই খাবি নে? এত দয়া আমার ওপর?

—আজ্ঞে, দয়া নয়—

—তবে ? দয়া নয় তো কি ?

ফটিক বললে—আজ্ঞে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি দলের অবস্থা—

—ছাই দেখতে পাচ্ছিস ! তুই কি ভেবেছিস্ তুই না খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করে দিবি ? তুই ভেবেছিস কি ?

ফটিকের মুখে আর তখন কথা নেই। চণ্ডীবাবু যখন রেগে যায় তখন আর কথা না-বলাই নিয়ম। রেগে গেলে অধিকারী মশাই কি করে বসে তার ঠিক নেই।

—তুই ভেবেছিস তুই আমার এখানে না খেয়ে-খেয়ে মরবি আর আমি তাই দেখব ? আমাকে তেমনি আহাম্মক পেইছিস ? বল, কথা বলছিস্ না কেন ? কথা বল্ ? আমাকে আহাম্মক পেইছিস ?

ফটিক যেমন কলকেতে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছিল তেমনি ফুঁ-ই দিতে লাগল। রা-টি করলে না।

—আজ সকালে কি খেইছিস ? সকালে ? কথা বল্, উত্তর দে—

—আজ্ঞে, বাতাসা-মুড়ি।

—ক'পয়সার বাতাসা-মুড়ি ?

—আনা আষ্টেকের।

চণ্ডীবাবু একটু শান্ত হল। জিজ্ঞেস করলে—আনা আষ্টেকের বাতাসা-মুড়ি তুই একলা খেলি ? তবু বলছিস তুই কিছু খাস্ নি ? আর তারপর ? ভাত খাস্ নি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খেইছি।

—ভাতও খেইছিস ? ভাত কি কম পড়েছিল ?

—আজ্ঞে না, ভাত কম পড়বে কেন, তরকারি কম পড়েছিল।

—কিসের তরকারি ?

—আলু-পটলের তরকারি।

—কম পড়েছিল কেন ? পকেটে পয়সা ছিল না ?

ফটিক বললে—আজ্ঞে তা নয়, ভেবেছিলাম ইলিশ মাছ দিয়ে খাব, তাই আর তরকারি নিই নি—

—তা ইলিশ মাছ খেলি নে কেন ?

—আজ্ঞে মাংস হয়েছিল যে ! মাংস ফেলে কি মাছ খাব ?

চণ্ডীবাবু আর থাকতে পারলে না। বললে—বেটা তুমি আলু-পটলের তরকারি খেয়েছ, ইলিশ মাছ খেয়েছ, মাংস খেয়েছ, তবু বলছ তোমার খাওয়া হয় নি ? তুই বেটা রাঘব-বোয়াল এসেছিস আমার দলে। তুই নিজেকেও খাবি, আমাকেও খাবি—

—না, আজ্ঞে, সত্যি বলছি, খেয়ে আমার সুবিধে হয়নি।

—কেন, সুবিধে তোর কিসে হবে ? কবে হবে ? আমাকে খেলে তবে তোর সুবিধে হবে তো আমাকেই খা—খা আমাকে—

ফটিক এবার ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে—আপনি খামোকা চটছেন কেন ?

—চটব না ? আহম্মকের মতন কথা বললে চটব না ? পেট-ভরে খেয়ে-দেয়ে এসে এখন আমার কাছে ছিঁচকাঁদুনি গাওয়া হচ্ছে তুমি কিচ্ছু খাও নি !

ফটিক বললে—আজ্ঞে, খাওয়াটা আমার হল কোথায় বলুন তাই ?

—কেন, অত খেয়েও তোমার পেট ভরল না ? তুমি কি বৃকোদর বাপু ? তুমি যদি বৃকোদর হও বাপু তো তোমার ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, আমার যাত্রাদলে তামাক সাজতে আসা উচিত হয় নি। কিসে তোমার খাওয়াটা হল না শুনি ?

—আজ্ঞে, আমি তো খাচ্ছিলাম মাংস দিয়ে—

—তারপর ?

—শেষকালে খাওয়া যখন হয়ে এসেছে তখন হোটেলের ম্যানেজারবাবু বললেন কিনা গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া করেছে।

—অ্যাঁ! তুই গল্‌দা চিংড়ির কালিয়াও খেলি নাকি?

চণ্ডীবাবুর তখন অগ্নিশর্মা অবস্থা। ফটিককে এই মারে তো সেই মারে।

ফটিক তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আজ্ঞে না, খাই নি। মাইরি বলছি অধিকারী মশাই, খাই নি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালছি, খাই নি—

—তা, কে তোমায় সেটা গিলতে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল? গিললে না কেন?

—সেই কথাই তো আমি ম্যানেজারবাবুকে বললাম, আজ্ঞে। আমি বললাম—গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া আছে তা পূর্বাহ্ণে আমাকে বললেন না কেন? তাহলে আমি আলু-পটল-ইলিশ মাছ দিয়ে পেট ভরাতাম না মিছিমিছি—

চণ্ডীবাবু পকেট থেকে ঝনাৎ করে একটা আধুলি বার করে সামনের মেঝেতে ফেলে দিলে। বললে—যা, এখন গিয়ে সেটা খেয়ে আয়—

ফটিক কিন্তু কিন্তু হয়ে বললে—না হুজুর, থাক—

—না, থাকবে না, শেষকালে সারারাত তোমার ঘুম হবে না রাত্তিরে, তখন আমাকে জ্বালিয়ে খাবে। যা, খেয়ে আয় গে—

ফটিক তবু নড়ে না। বলে—না, দলের আমদানী নেই—

—তোকে আর দলের আমদানীর কথা ভাবতে হবে না, আমি একলাই যথেষ্ট। যা—

—তাহলে বলছেন, যাব?

—হ্যাঁ, যা তুই, গিলে আয়—

ফটিক হুঁকোটা এগিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দরজা দিয়ে বন্ধুকে ঢুকতে দেখে অবাক্!

—আরে, বঙ্কুদা!

চণ্ডীবাবুও অবাক্ হয়ে গেছে। বঙ্কুর চুল উস্কো-খুস্কো। বঙ্কুর চেহারাটাও অর্ধেক শুকিয়ে গেছে। যেন অনেক দিন খায় নি, ঘুমোয় নি।

—কি গো? কি খবর তোমার, বঙ্কুবাবু? অঞ্জনা বেঁচে আছে, না পটল তুলেছে?

কথাগুলো বলতে পেরে যেন বড় মজা পেলে চণ্ডীবাবু। যেন বঙ্কুকে সামনে পেয়ে অনেক দিনের ক্ষোভ আজ'মিটিয়ে নিলে।

—আমি তখনই বলেছিলুম বাবা যে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ও হল রাজরোগ, ও সারে না। ও-রোগ একবার যাকে ধরেছে, তার আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই। তুমি গেলে আর আমাকেও মেরে গেলে! এখন যে তুমি এসে বলবে একটা চাকরি দিন আমাকে অধিকারী মশাই, আমি আবার অ্যাক্টো করব, তা তো দিতে পারব না—

বলে ভুড়ুক করে একবার হুঁকোয় টান দিয়ে বঙ্কুকে দেখিয়ে দেখিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চণ্ডীবাবু। বঙ্কু তখনও কিছু বলছে না। শুধু শুকনো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিকে তাকিয়ে চণ্ডীবাবু আবার বললে— কি, তখন তাই বলি নি তোমায়? উত্তর দিচ্ছ না কেন? কথার জবাবটা দাও। তখন ভাবলে চণ্ডীবাবু আর কতটুকু জানে আর কতটুকুই বা দেখেছে। তখন ভাবলে জমিদার-বাড়িতে যখন যাচ্ছি তখন চর্বচোষ্য-লেহ্যপেয় খাব আর আয়েস করে স্ফূর্তি করব! বলি পীরিত এখন ঘুচল তো? সেই জন্যেই তো কথায় আছে—খাবার খাবে চেখে আর পীরিত করবে দেখে।

তখনও বঙ্কু কথা বলে না।

—তা, তোমার বাক্স-প্যাঁটরা কোথায়? সে-সব আন নি? না কি তাও ফেলে এসেছ মনের দুঃখে? অতই যদি মনের দুঃখ তো আবার চাকরি করবার শখ কেন? পেটের কথা ভেবেই তো

এয়েছ ? ওই একটা জিনিস বাপু। সেই জন্যেই তো ভগবানকে বলি। বলি—আর যা-কিছু দিয়েছ বেশ করেছ, পোড়া পেটটা দিলে কেন মরতে ? ওই পেটটা না থাকলে তো ইহকালের সব ল্যাঠা চুকে যেত ! তোমাকেও আর চাকরির জন্যে আমার দ্বারস্থ হতে হত না, আমাকেও আর এই ভাঙা দল নিয়ে বুড়ো বয়সে টো-টো করে কাঁহা বাঁকুড়া আর কাঁহা গৌহাটি করতে হত না—

বলে আবার ভুড়ুক করে এক টান দিলে হুঁকোয়।

তারপর হঠাৎ একটা মহা অপরাধ করে ফেললে চণ্ডীবাবু।

বললে—তা ভাল করে পুড়িয়েছ তো বাপু মেয়েটাকে ? জলে ভাসিয়ে দাও নি তো···

কথাটা শেষ হবার তর সইল না। বঙ্কু বোধহয় এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। একেবারে বিদ্যুতের গতিতে সামনে এসেই চণ্ডীবাবুর মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলে। আর মারবার সঙ্গে সঙ্গেই হুঁকোশুদ্ধ চণ্ডীবাবু চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ে গেল মেঝের ওপর। কিন্তু তবু বোধহয় রাগ গেল না বঙ্কুর। আবার সেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পেছনে ফটিক এসে গেছে।

ফটিক ব্যাপারটা দেখেই চমকে উঠেছে।

—তুমি করলে কি বঙ্কুদা ? অধিকারী মশাইকে মারলে তুমি ?

বঙ্কুর তখনো রাগ যায় নি। তখনও রাগে ফুলছে সে।

—রাগব না ? এত বড়ো মিথ্যেবাদী !

—কেন, মিথ্যে কথাটা কি বললেন তোমায় ?

—আমি খুন করে ফেলি নি এই-ই যথেষ্ট, আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে ! আমি যেন ওর চাকরি করতে এখানে এসেছি ! চাইনে আমি চাকরি, চাকরির দরকার নেই আমার—

কিন্তু চণ্ডীবাবুর তখন অবস্থা বেশ সঙ্গীন। সেই মেঝের ওপর

শুয়ে শুয়েই কাত্রাচ্ছেন। বোধহয় কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও নেই। কথা বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কথা বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে গোঙাচ্ছেন।

—এখন কি হবে!

ফটিক গল্দা চিংড়ির কালিয়া খেয়ে এসেছে তখুনি, কিন্তু এই কাণ্ড দেখে খাওয়ার আনন্দটা যেন সমস্ত মাটি হবার যোগাড়। কি করবে সে তাই-ই বুঝতে পারলে না।

পাশের ঘরের লোকেরা বোধহয় শব্দ পেয়েছিল। এতক্ষণে তারা দৌড়ে এল।—কি হল? চণ্ডীবাবুর কি হল? পড়ে গেলেন নাকি?

শেষকালে অনেক লোক জমে গেল ঘরে। ছোট ছোট ফালি ফালি ঘর পাশাপাশি। তারা সবাই জিজ্ঞেস করলে—কি হল ফটিক? চণ্ডীবাবুর কি হল? একটা ডাক্তার ডাক না—

কথাটায় যেন এতক্ষণে খেয়াল হল ফটিকের। তাড়াতাড়ি একতলায় ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

বহুদিন দেশের বাইরে ছিল দুলাল সা'র ছেলে। ছোটবেলাতেও বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া করে নি সে। কলকাতায় কলেজে লেখাপড়া করেছে। কোথা থেকে তাদের আয় হয়, কি তাদের ব্যবসা তা খোঁজ রাখার সুযোগও পায় নি, সে খবর তাকে জানানোও হয় নি।

এমনি করেই কলেজে ঢুকেছে, ডাক্তারি পড়েছে। তারপর একদিন টেলিগ্রাম পেয়ে বিয়েও করতে এসেছে।

দুলাল সা' তাকে বলেছিল—তোমাকে এবার বিয়ে করতে হবে বাবা ; তোমার মা নেই, আমিও আর বেশি দিন নেই—

যাকে বিয়ে করেছে, তাকে কেমন দেখতে, তাদের বংশের পরিচয় কি, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা করবার দরকার হয় নি। স্কুলে-কলেজে যেখানেই থেকেছে, লেখাপড়া নিয়েই সময় কাটিয়েছে। নিতাই বসাক মাঝে মাঝে গিয়ে হোস্টেলে তার সঙ্গে দেখা করত। দুলাল সা'রও ভয় ছিল। কলকাতা শহর বলে কথা। দাঙ্গা, হরতাল, গণ্ডগোল লেগেই আছে কলকাতা শহরে। কিন্তু নিতাই বসাক যতবার গিয়েছে ততবার দেখে এসেছে, বিজয় তার লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। অন্য ছেলেরা যখন খেলা, সিনেমা, রাজনীতি নিয়ে মেতেছে, বিজয় তখন তার বই নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

নিতাই বসাক গিয়ে জিজ্ঞেস করত—তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ? অসুবিধে হলে বলবে আমাদের—

বিজয় বলত—আমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে না—

—টাকা-কড়ি দরকার হলে বলো—

—টাকা তো রয়েছে আমার কাছে—

—আর কিছু টাকা নেবে ?

বিজয় বলত—দরকার হলে চেয়ে নেব।

কিন্তু দরকার তার কখনও হয়নি। যে টাকাটা যেত তার কাছে, তাও পুরো খরচ হত না। খরচ করবার কিছু ছিল না।

দুলাল সা' নিতাই বসাককে জিজ্ঞেস করত—কি রকম দেখে এলে ? সিগারেট বিড়ি-টিড়ি ধরেছে নাকি—

নিতাই বসাক বলত—ধরে নি তো দেখে এলাম—

—আড়ালে-টাড়ালে খায় ?

—তাও খোঁজ নিয়েছিলাম, কিছু তো টের পেলাম না।

ভাল ভাল। কিন্তু তবু মন থেকে সন্দেহ যেত না দুলাল সা'র।

আজকালকার যুগে এ আবার কেমন ছেলে! এতখানি যে বিশ্বাস করতেও ভয় হয়।

ছেলে ছুটিতে বাড়িতে এলে লক্ষ্য রাখত। কাছারি-বাড়িতে কাছে বসিয়ে উপদেশ দিত। বিজয় শুনত সব বাপের কথা। প্রতিবাদ করত না। দেখে-শুনে দুলাল সা' মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ত। এ ছেলে কি তার এত বড় সম্পত্তি রাখতে পারবে? দুলাল সা'-ও চিরকাল থাকবে না, নিতাই বসাকও চিরকাল থাকবে না। চিরকাল থাকবার জন্যে কেউই আসে নি এখানে। একদিন তো যেতেই হবে সকলকে। তখন? তখন এত ভাল মানুষ হলে সম্পত্তি রাখা যাবে? এটা কি ভালমানুষির কাল? এ-যুগে ভালমানুষরাই তো ঠকে। ভালমানুষকেই তো সবাই ঠকিয়ে নেয়!

বিজয়কে বলত, বুঝলে বাবা, সংসারে সবাই তো ধর্ম করতে আসে নি—ঠগ্ জোচ্চোর বদমাইসদের রাজ্য এটা, এখানে টিঁকে থাকতে গেলে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে বাবা—তোমাকে ঠকাবার জন্যে সব লোক ওৎ পেতে বসে আছে, তা জান তো?

বিজয় বলত, হ্যাঁ—

—তবে? তবে কেন সব বুঝেও এমনি করে চুপ করে সব শোন? সেদিন যে লোকটা টাকা দিতে পারবে না বলে কান্নাকাটি করছিল, তার কথায় তুমি কেন অমন করে গলে গেলে?

ঘটনাটা মনে ছিল না বিজয়ের। জিজ্ঞেস করলে, কোন্ লোকটা?

—ওই দেখ, সেটাও তোমার মনে নেই? সমস্ত কিছু মনে রাখতে হবে বাবা। ভালকেও মনে রাখতে হবে, মন্দকেও মনে রাখতে হবে। সাবধানের মার নেই জগতে। তুমি একটু অসাবধান হয়েছ কি লোকে তোমাকে চাঁটি মেরে যাবে, বুঝলে? এই-ই জগৎ। আমি তোমার মত অত বই পড়ি নি, কিন্তু ভগবান যে-বুদ্ধি

দিয়েছেন সেই বুদ্ধি খাটিয়েই এই বাড়ি-ঘর-গাড়ি-সুগার-মিল, এই যাবতীয় সম্পত্তি যা-কিছু দেখছ, সমস্ত করেছি। ওই কর্তামশাই আমাকে কম ঠকাতে চেয়েছিল! আমাকে কত রকমে বানচাল করে দিতে চেয়েছিল তা তো তুমি জান না। কিন্তু আমি কি ঠকেছি? ঠকি নি। ঠকি নি বলেই এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি এমনি করে।

এমনি কত উপদেশ, কত সাবধান-বাণী শুনিয়েছে দুলাল সা'। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বিজয় ঠিক তেমনি আছে। বিলেত থেকে ফিরেও তার কোনও পরিবর্তন হয় নি। দুলাল সা' ভেবেছিল, ছেলে বিলেত থেকে সাহেব হয়ে ফিরবে। কিন্তু কিছুই না। লাজুক-গোবেচারা মানুষ। এতদিন সেখানে কাটিয়েও সেই মুখচোরা মানুষই রয়ে গেল।

ছেলে বলেছিল, একটা ডিস্‌পেন্‌সারি করে আমি দেশেই প্র্যাক্‌টিস করব বাবা—

—তা কর না। প্র্যাক্‌টিস কর। কত ফি নেবে?

—কিছু নেব না, টাকার তো আমাদের দরকার নেই—

এই রে! কথাটা শুনেই দুলাল সা'র মাথায় বজ্রাঘাত হল। এই সব দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে! এই রকম করলে এ-সম্পত্তি কি আর থাকবে শেষ পর্যন্ত!

—টাকা নেবে না? কেন?

—এ দেশে তো সবাই গরীব!

দুলাল সা' বললে, গরীব? গরীব তুমি কোথায় দেখলে?

—গরীব না হলে ওদের ভাল জামা-কাপড় নেই কেন? ওদের স্বাস্থ্য ভাল নয় কেন?

দুলাল সা' মুশকিলে পড়ল। বিলেতে গেলে ছেলেরা যে এমন হয় তা আগে জানত না। বিজয়ের মতি-গতি দেখে বড় দুর্ভাবনা

হল দুলাল সা'র। একদিন নিতাই বসাককে কাছে ডাকলে। কাছে ডেকে সব বুঝিয়ে বললে।

নিতাই বসাক বললে, ও তুমি কিছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে দেব—

—কি করে ঠিক করে দেবে?

—সে তোমাকে এখন বলব না—

এই পর্যন্তই হয়েছিল। এমন সময় পুলিসের দারোগা আসায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এতদিনকার সব আয়োজন এখন বুঝি সব পণ্ড হয়ে যায়। কোথাকার কে সদানন্দ এমন করে সব ভণ্ডুল করে দিয়ে যাবে কে জানত। নিতাই বসাক ভেবেছিল, সদানন্দকে সরিয়ে ফেলে দিলেই বুঝি ধুয়ে-মুছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সদানন্দই একমাত্র সমস্ত ব্যাপারটা জানত, তাকে যদি এ-পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আর দুলাল সা'র বংশের কোনও কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয় থাকবে না। কিন্তু দোলগোবিন্দ যে আবার সব প্রকাশ করে দেবে তা কারও মাথায় আসে নি।

তখনও পুলিস-দারোগা সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

দুলাল সা' নতুন-বৌ-এর দিকে চেয়ে বললে, তুমি আবার এখানে কেন এলে মা? তুমি নিজের কাজ করগে যাও না, বিজয় কি ঘুম থেকে ওঠে নি?

নতুন-বৌ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে, দারোগাবাবু, আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন আমি আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছি—

—তুমি আবার কি শুনেছ? দারোগাবাবু তো তোমার কথা কিছু বলেন নি!

—না বাবা, আমি সব শুনেছি, আমি তবু আর একবার শুনতে চাই—আমার বংশ-পরিচয় নিয়ে যদি কোনও কথা উঠে থাকে তা শোনবার অধিকার আমার আছে—

দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে নিতাই বসাক বললে, আপনি বাইরে চলুন দারোগাবাবু, বাইরে আপনার সঙ্গে কথা বলব—

দুলাল সা' বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই-ই চল, তুমি ভেতরে যাও নতুন-বৌ, আমি আসছি—

নতুন-বৌ সোজা এসে দারোগাবাবুর সামনে পথ আটকে দাঁড়াল।

বললে, না, আপনাকে আমার সামনেই বলে যেতে হবে—

দুলাল সা' বললে, তুমি মেয়েমানুষ, আবার এর মধ্যে কেন থাকবে নতুন-বৌ—?

নতুন-বৌ বললে, না, আমি নিজের কানে শুনতে চাই, আমি জেলের মেয়ে কি না।—আমি শুনবই, নইলে এখান থেকে আপনাদের যেতে দেব না।—

আসলে এর জন্যে হয়তো কেউই দায়ী নয়। কোথায় কেষ্টগঞ্জের কোন্ এক কর্তামশাই কোন্ এক অতীত বংশ-গৌরবের মিথ্যে আড়ম্বর নিয়ে দম্ভে আত্মগরিমায় অন্ধ হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন, আর সেই সুযোগ নিয়ে সেই রন্ধ্রপথে বুঝি কোন্ এক অশুভ সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ যেমন নির্মম, তেমনি মর্মান্তিক। মানুষের দৃষ্টিহীন নিয়তি যেমন তাকে হঠাৎ আকাশের উত্তুঙ্গ চূড়ায় তুলে অবিশ্বাসী করে তোলে, তেমনি কঠোর অন্ধকূপের বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেও তাকে নাস্তিক করতে প্ররোচনা দেয়। সে তখন বলে কিছুই সত্য নয়। ঈশ্বর, পৃথিবী, জীবন, জন্ম, বেদনা, সাফল্য সব মিথ্যে।

একমাত্র সত্য আমি। আমার সাফল্য, আমার ব্যর্থতা, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু, আমার অনুভব, আমার অনুরাগ ছাড়া আর সব কিছুকে আমি অস্বীকার করি।

এমনি করেই একদিন কর্তামশাই অহঙ্কারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে উঠে নিজের শরীর-মন-অনুভূতিকে ঘিরে একটা ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যেই বাস করছিলেন। তিনি ভাবতেন নিজের কথা, তিনি স্বীকার করতেন নিজের গৌরব, তিনি অনুভব করতেন নিজের অহঙ্কার। ভেবেছিলেন, সেইটুকু মূলধন দিয়েই তিনি গোটা বিশ্বটা না হোক, গোটা কেষ্টগঞ্জটাকে কিনে ফেলবেন। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষের সমস্ত বিস্মৃত গৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে একেশ্বর-অধিপতি হয়ে কেষ্টগঞ্জে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করবেন।

কিন্তু তা হল না।

হল না, কারণ, তেমন কখনও হয়নি, তেমন কখনও হবেও না।

সেদিন কি কারণে বৈঠকখানা ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন। যেমন রোজই ওঠেন, উঠতে গিয়ে বুকে ব্যথা লাগে, তবু ওঠেন। চিরকাল এমনি আসছেন বলেই ওঠেন। তাঁর ভাঙা বাড়ি আবার প্রাসাদ হয়েছে বলে আরও বেশি উৎসাহ নিয়েই ওঠেন। শুধু সিঁড়ি দিয়েই ওঠেন, তাই-ই নয়। ছাদেও ওঠেন। ছাদে উঠে সিংহাসনে ওঠার আনন্দে ডগমগ হয়ে যান। এ সব তাঁর। এই বাড়ি, এই সংসার, এই হরতন, এই ভট্টাচার্য-বংশ, এই বাংলাদেশ, এই ইণ্ডিয়াটাও যেন তাঁর নিজের মনে হয়। একমাত্র দুলাল সা' ছাড়া আর সবই তাঁর। আবার তাঁর সব হয়েছে। হয়তো দুলাল সা'র কাছে তাঁর অনেক দেনা। একলক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্তই যখন তাঁর, তখন দুলাল সা'র দেনাটাও আর দেনা নয়। দুলাল সা'ই থাকবে কি না আগে তাই দেখ! দুলাল সা' যখন থাকল না, তখন দুলাল সা'র দেনাটাও রইল না।

যত জমি তিনি বেচে দিয়েছেন, যত জমি তিনি দুলাল সা'র কাছে বন্ধক রেখেছেন সব আবার তাঁর হয়ে গেল। যতই তিনি ভাবেন, ততই পা দুটো তাঁর আরও দুর্বল হয়ে যায়! তিনি আরও জোরে জোরে পা ফেলেন।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ ব্যতিক্রম হল।

পা দুটো ঠিক জায়গায় ফেলতে গিয়ে বেঠিক জায়গায় পড়ে গেল। প্রথমে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিন দিন পরে যখন জ্ঞান হল তখন দেখলেন, তাঁর চারপাশে লোকজন। ডাক্তারবাবু তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে দেখছেন।

তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

নিবারণ সরকার চেয়ে চেয়ে দেখছিল এতক্ষণ। সামনে ঝুঁকে পড়ে কর্তামশাই-এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিছু বলবেন?

তিনি অনেক চেষ্টা করে ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে কি যেন বললেন।

কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারলে না কথাটা।

নিবারণ কানটা আরও মুখের কাছে নিয়ে গেল। তারপর বললে—হরতনের কথা জিজ্ঞেস করছেন তো?

সকলকে বলা ছিল হরতনের অসুখের অবস্থার কথাটা যেন না বলা হয়। কর্তামশাই-এর তখন ভাল করে খেয়ালই হচ্ছে না, কত-দিন তিনি পড়ে আছেন। এতদিন ধরে যে তাঁর চিকিৎসা করবার জন্যে এত টাকা খরচ হয়েছে, কলকাতা থেকে এত ডাক্তার এসেছে, তিনি তার কিছুই টের পাননি। মানুষ সৌভাগ্যের আশায় শুধু টাকা নয়, আয়ুও কামনা করে। সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে-সৌভাগ্য ভোগ করবার মত স্বাস্থ্যও চায়। কিন্তু কর্তামশাই-এর যেন সেই আশা করবার ক্ষমতাটুকুও চলে গিয়েছিল তখন। তিনি হয়তো

তখন ভাবছিলেন, আবার তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। আবার তাঁর সব ঐশ্বর্য ফিরে আসবে।

কিন্তু আর সকলে জানত ভট্টাচার্য-বংশ আবার হয়তো নিজের গৌরব ফিরে পাবে, কিন্তু কর্তামশাই হয়তো তা আর দেখতে পাবেন না।

বড়গিন্নীর দুঃখটা ছিল সেইখানেই। সে চিরকাল মুখ বুজে সবই দেখে এসেছে, বুঝে এসেছে। এ-সংসারের ঐশ্বর্যও সে দেখেছে, এ-সংসারের দুঃসময়ও সে দেখেছে। কিন্তু কোনওদিনই সে তাতে বিচলিত হয় নি। কিংবা বিচলিত হলেও বাইরের কেউ তা টের পায়নি কোনওদিন।

সেও ঘরের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

আর বঙ্কু? তার যেন কোনও দিকে দেখবার, কোনও কিছু ভাববারও সময় নেই। সে যে এ-বাড়ির কেউ নয়, সে-কথা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল। এতদিনে সে যেন এ-বাড়ির একান্ত আপন-জন হয়ে গিয়েছিল। তার খোঁজ কেউ রাখত না, কিন্তু সে সকলের খোঁজ রেখে রেখে সকলকে অস্থির করে তুলত।

বলত—মা-মণি, তুমি না খেলে আমিও খাব না কিন্তু।

বড়গিন্নী কিছু বলত না। বঙ্কুর বকাবকিতে খেয়ে নিত।

বঙ্কু বলত—আমিও তোমার মত মাঝে-মাঝে খেতাম না, জান মা-মণি, রাগ হলে ভাত ফেলে উঠে যেতাম—

তারপর একটু থেমে আবার বলত—রাগ তো করতাম অধিকারী মশাই-এর ওপর, কিন্তু তখন আমার পেটের মধ্যে হামান্ দিস্তের ঘা পড়ছে—

এমনি গল্প আর তার শেষ হত না।

বলত—অধিকারী মশাইকে চেনেন তো মা-মণি?

বড়গিন্নী বলত—না—

—বেটা বড় বদ্‌মাইস—জানেন মা-মণি, বড় বদ্‌মাইস—

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ মা-মণি, বড় বদ্‌মাইস, খেতে দিত না মোটে, হরতনকে কি কম জ্বালিয়েছে নাকি ?

—কেন ? তোমাদের কষ্ট দিত কেন বাবা ? তোমরা কি করেছিলে ?

বঙ্কু বলত—কিছুই করিনি মা ! আর কিই বা করতে যাব ! বলতে গেলে ওই হরতনের জন্যেই তো দল চলত—। পাছে হরতনের গ্যাদা বেড়ে যায় সেই জন্যেই আর কি অমন করে বকত খালি খালি—

বড়গিন্নী কথাগুলো শুনত চুপ করে। আর সারা সংসারটার দিকে নজর দিয়ে খেটে যেত। কর্তামশাই-এর বুকে সরষের তেল মালিশ করতেন রাত্তিরবেলা। দিনে দিনে সংসারের খাবার লোকও তো বেড়ে চলেছিল। কর্তামশাই-এর যখন আবার অবস্থা ফিরেছে, তখন পোষ্যের সংখ্যাও তো বেড়েছে।

নিবারণ সরকারের কাছে গিয়ে বঙ্কু বলত—দিন সরকার মশাই, টাকা দিন—

টাকার কথা শুনলেই নিবারণের বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠত। আবার টাকা ! কর্তামশাই তো টাকা চেয়েই খালাস ! হিসেব তো রাখতে হত নিবারণকেই। একমাত্র নিবারণই জানত কত টাকা চেয়ে আনতে হয়েছে দুলাল সা'র কাছারি থেকে। যত টাকা চেয়েছে নিবারণ, তত টাকাই দিয়েছে সা' মশাই। প্রত্যেকবার টাকা নিয়েছে নিবারণ আর মুচলেকায় সই করে দিয়েছে কর্তামশাই-এর ব-কলমায়।

দুলাল সা'র কাছে গিয়ে কাকুতি করতে কেমন যেন লাগত নিবারণ সরকারের।

কিন্তু দুলাল সা'র কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

বলত—আরে! তুমি কি পাগল হয়েছ নিবারণ? আমাকে তুমি কি সেই রকম লোক পেয়েছ?

নিবারণ বলত—না না, তবু তো লজ্জা করে হাত পেতে টাকা নিতে—

—দেখ নিবারণ—

দুলাল সা' তখন গম্ভীর হয়ে উঠত।

বলত—দেখ নিবারণ, তোমরা কর্তামশাইকে না চিনতে পার কিন্তু আমাকে চেনাতে এস না কর্তামশাইকে। আমি লোক চিনি—

—কিন্তু এত দেনা হয়ে গেল, এ তো আর চারটিখানি টাকা নয়—

—তা না হোক্, হরির দয়ায় টাকার আমার অভাব নেই, আর টাকা নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? আমিই তো সব টাকা—সম্পত্তি ফেলে রেখে চলে যাব রে বাবা; তখন কে আমার এত টাকা খাবে?

—আপনার এখন ছেলে দেশে ফিরে এসেছে, সে হয়তো···

—ছেলে? আমার টাকা আমি খরচ করব, আর ছেলে তাতে আপত্তি করবে? তুমি কি বলছ নিবারণ? তুমি তাহলে আমার ছেলেকে চেননি—

এসব কথা পুরনো। এ সব নিয়ে অনেক কথা হয়ে গিয়েছে দুলাল সা'র সঙ্গে। এ নিয়ে নিবারণ সরকার ভাবা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন আবার যথাসময়ে দুলাল সা'র বাড়ি গিয়ে সদর-গেটের সামনেই পুলিসের লোক দেখে কেমন অবাক্ হয়ে গেল। শুধু পুলিস নয়, মাঝে আর একজন লোক। লোকটা যেন কেমন পাগল-পাগল। পাগলের মত মুখে কি যেন সব বিড় বিড় করে বলছে।

তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুলাল সা' আর তার পাশে দুলাল সা'র ছেলে বিজয়। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নতুন-বৌ। নতুন-বৌ-এর এ-রকম চেহারা কখনও দেখেনি সরকার মশাই আগে।

নিবারণকে দেখে দুলাল সা' এগিয়ে আসছিল।

কিন্তু তার আগেই পুলিস পাগলটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সা'মশাই-এর সামনে হাজির হল।

দুলাল সা' নিবারণকে জিজ্ঞেস করলে—কি নিবারণ, তুমি ?

কিন্তু নিবারণ কিছু উত্তর দেবার আগেই নতুন-বৌ এগিয়ে এসেছে পুলিসদের সামনে।

বললে—এই সেই লোকটা ? কিন্তু এ তো সে নয়। বিয়ের সময় তো আমি একে দেখিনি—

—আজ্ঞে, মিসেস সা', এরই নাম দোলগোবিন্দ, এই লোকটিই আপনার বিয়ের ঘটকালি করেছিল, আপনি বেশ ভাল করে চেয়ে দেখুন—

পাগলটা যেন ঠিক আসল পাগল নয়। নতুন-বৌ-এর দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল।

নতুন-বৌ তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—বল তুমি, আমার বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে ?

দোলগোবিন্দ হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

নিবারণ সরকার এ-ঘটনা দেখবে আশা করেনি। পারিবারিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেছে নিশ্চয়। এর মধ্যে কেন সে আসতে গেল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বাড়ির দিকেই পা বাড়াচ্ছিল। দরজা পর্যন্ত এসেছে এমন সময় পেছন থেকে নতুন-বৌ ডাকলে—সরকার মশাই, আপনি যাবেন না, আপনার সামনেই সব কথা হয়ে যাক।—আসুন—

কেষ্টগঞ্জের গ্রাম্য-জীবনে এমন করে যে একদিন ঝড় উঠবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আগেও ঝড় উঠেছিল কিন্তু সে বড় আস্তে আস্তে। রাতারাতি দুলাল সা', নিতাই বসাক বড়লোক হয় নি। কর্তামশাইও রাতারাতি বাড়েন নি। ওঠা-পড়ার স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছিল। কূটচক্রের কারসাজিতে কিংবা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছে। লোকের চোখে তা সহ্য হয়ে গিয়েছিল, সবাই সেই নিষ্ঠুর সত্যিটাকে মনে-প্রাণে স্বীকার করেই নিয়েছিল।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার যেন হঠাৎ ঝড় উঠে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

বঙ্কু বরাবর নির্বিবাদী মানুষ। বরাবর যাত্রাগান গেয়েছে। অধিকারী মশাই-এর সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে জেলায়-জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছে। রাত জেগে, গান গেয়ে দিনভোর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তারপর কখন মনের কোন্ ফাঁকে একটা অচ্ছেদ্য শেকলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেও টের পায় নি।

যেদিন হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে গেল যে, অঞ্জনা যে-সে কেউ নয়, কেষ্টগঞ্জের জমিদার ভট্টাচার্যি মশাই-এর হারানো নাতনী, সেদিন তার মত আনন্দ বোধহয় কর্তামশাই-এরও হয় নি। বঙ্কুর মনে হয়েছিল তার নিজের যা হয় হোক, অঞ্জনাকে তো আর তাদের দলের সঙ্গে টো-টো করে মুখে খড়ির গুঁড়ো মেখে যাত্রা করে বেড়াতে হবে না!

বঙ্কু বলত—আমাদের যা হয় হোক, অঞ্জনার তো ভাল হল—

অন্য সবাই বলত—কিন্তু অঞ্জনা চলে গেলে দল কি আর টিকবে? আমাদের চাকরি কি আর থাকবে রে!

বঙ্কু বলত—ঐ তো তোদের স্বভাব, শালারা তোরা কারও ভাল দেখতে পারিস না।

অঞ্জনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বঙ্কুর মুখ দিয়ে সত্যিই গালাগালি বেরিয়ে যেত।

অন্য লোকরা কারণটা জানত।

বলত—তোর তো লাগবেই, তোর যে প্রাণের টান রে, লাগবে না?

বঙ্কু রেগে যেত। বলত—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবি—

অনেক সময় পাড়াগাঁয়ের আটচালার মধ্যে সবাই যখন দল বেঁধে ঘুমোত তখন এক-একদিন অমনি ঠাট্টা তামাশা করতে করতে মারামারি বেধে যেত। আগের দিন রাত জেগে চণ্ডীবাবু হয়তো নাক ডেকে বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ মারামারির শব্দ পেয়ে একেবারে সোজা ঘরে ঢুকে যাকে পেত তাকেই ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে বাইরে টেনে আনত।

বলত—যত সব হাড়-হাবাতের দল এসেছে আমার কাছে মরতে—চুপ কর, চুপ কর—

তারপর বঙ্কুর দিকে চেয়ে বলত—তোর এত তেজ কেন শুনি র‍্যা? তোর এত তেজ কেন শুনি? যেদিন তাড়িয়ে দেব সেদিন বুঝবি ঠেলাটা—

চণ্ডীবাবু জানত, বঙ্কুকে তাড়ালেও বঙ্কু যাবে না। মাইনে না পেলেও চণ্ডীবাবুর দল ছেড়ে বঙ্কুর কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। বঙ্কু বাঁধা পড়ে গেছে 'শ্রীমানী অপেরা'র দলে। তারপর যখন সেই

অঞ্জনা কর্তামশাই-এর বাড়িতে এল, বঙ্কুও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। জীবনে নিজের কিছু হল না বলে ভাবনা করবার মত লোক আর যে-ই হোক, বঙ্কুর কোনও দুঃখ ছিল না। অঞ্জনার অসুখটা সেরে গেলেই চলে যাবে এই রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু একদিন সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল রাতারাতি।

সরকার মশাই বাড়িতে আসতেই বঙ্কু সামনে গিয়ে হাজির।

বললে—টাকা দিন, টাকা দিন সরকার মশাই—

নিবারণ সরকার যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও যেন নেই আর তার।

—কই, টাকা দিন, ওষুধ আনতে হবে, দেরি করছেন কেন?

নিবারণ বরাবর দুলাল সা'র বাড়িতে যায় আর টাকা নিয়ে আসে। আর সেই টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা হয়, চিকিৎসা হয়। শুধু ওষুধ নয়, কর্তামশাই-এর বাড়ির যাবতীয় সংসার-খরচ সেই ধারের টাকায় চলে। কোথায় কোন্ কাগজে সই করে দিয়ে আসে, তা কারও জানবার প্রয়োজন হয় না, কেউ জিজ্ঞেসও করে না। এমনি করেই এতদিন এ-সংসার চলে এসেছে। কর্তামশাই-এর অসুখের আগেও যা, পরেও তাই। আগেও কখনও কর্তামশাই জিজ্ঞেস করেন নি নিবারণকে—কোন্ জমিটা বন্ধক দিয়ে এ-টাকা নিয়ে এলে। আর এখন তো সে-প্রশ্ন ওঠেই না। টাকা তো আসবেই। তাঁর ধারণা, এ-টাকা তাঁর প্রাপ্য। হরতন এ বাড়িতে আসার পর থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরে গেছে। তাঁর অনেক ঐশ্বর্য হয়েছে। এ সবই থাকবে। আবার তাঁর অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়েছে। সবই হরতনের জন্যে। হরতন যখন স্বয়ং লক্ষ্মী, তখন লক্ষ্মী তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকতে এসেছেন—নইলে এতদিন পরে তাঁকে ফিরে পাবেনই বা কেন?

বঙ্কু কিন্তু এত কথা জানে না। তার কাজ সে করে যায়। তার

হরতনকে সেবা করা কাজ, সে তাই-ই করে। কলকাতায় যায়, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে, ওষুধ কিনে নিয়ে আসে। আর টাকার যোগান দেয় নিবারণ।

কিন্তু আজ নিবারণকে চুপ করে থাকতে দেখে বঙ্কুও রেগে গেল।

বললে—আরে, কথাটা কানে যাচ্ছে না আপনার? আটটা বিয়াল্লিশের ট্রেন ছেড়ে গেলে আমি কখন যাব আর কখনই বা আসব?

নিবারণ এতক্ষণে যেন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেলে।

বললে—টাকা নেই।

—টাকা নেই মানে? টাকা নেই মানেটা কি? তাহলে ওষুধ আসবে না?

নিবারণ বললে—আমি জানি না—

—আলবৎ জানেন আপনি। হরতন কি ওষুধ না খেয়ে থাকবে বলতে চান?

নিবারণ যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—তুমি চুপ কর বঙ্কু, অত চেঁচিও না, টাকা যোগাড় করতে পারি নি, বিকেলবেলাটা পর্যন্ত একটু সবুর কর না, আমি চেষ্টা করে দেখি—

বঙ্কু বললে—কিন্তু আমি যে কাল থেকে বলে রেখেছি আপনাকে, হরতনের ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছে—

—কিন্তু বললে কি হবে? কর্তামশাই-এর ওষুধও তো ফুরিয়ে গিয়েছে, তাঁর ওষুধও তো আনতে হবে।

তারপর যেন বুড়ো মানুষটা কি করবে ঠিক করতে না পেরে মাথার চুলগুলো টানতে লাগল।

—তাহলে আমি মা-মণিকে গিয়ে বলিগে যে, টাকা নেই বলে ওষুধ আনতে পারলাম না—চিকিৎসা হবে না আর, হরতন তাহলে মরে যাক, এইটেই আপনি চান—

নিবারণের চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল। আর দাঁড়াতে পারলে না সেখানে। পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

বঙ্কু নিজের মনেই নিবারণকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল—ঠিক আছে, আমার কি! আমার কলাটা! ওষুধ না হলে আপনাদেরই চিকিৎসা হবে না, আপনারাই ভুগবেন, আমার বয়ে গেছে ভেবে মরতে—

বলে বঙ্কু সোজা উঠোনের দিকের রোয়াকে গিয়ে উবু হয়ে বসল। এইসব সময়েই বঙ্কুর বড় খারাপ লাগত। সারা জীবন কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে যে-মানুষটা, এতদিন পরে একটা আস্তানার আশ্রয়ে এসে সে যেন নিশ্চিন্ততার একটা আরাম পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরাম যার কপালে নেই, তার আরাম কেমন করে হবে। সবে একটু সেরে উঠছিল হরতন, ঠিক সেই সময়েই যত ঝঞ্ঝাট, যত ঝামেলা। ঠিক সেই সময়েই কর্তামশাই-এর অসুখ। অসুখ হবার আর সময় পেলে না বুড়ো। আমার কি! আমি খাবও না দাবও না, এই এমনি করে চুপ করে এইখানে বসে রইলাম। হরতন যদি ওষুধ না পায় তো আমিও ভাত খাব না। সাধাসাধি করলেও খাব না। দরকার নেই খেয়ে। কতদিন কতরাত না-খেয়ে কেটেছে, এবারও না-হয় না-খেয়েই কাটবে। হাজার খেতে বললেও খাব না। ওষুধ আনতে বললেও আর আনব না।

হঠাৎ নজরে পড়ে গেছে বড়গিন্নীর। বড়গিন্নী কম কথার মানুষ। সারা জীবন কর্তার বুকে তেল-মালিশ করেই কেটেছে। আর এখন তো তিনি শয্যাশায়ী। এখন রান্নার দিকটাও দেখতে হচ্ছে আবার কর্তামশাই-এর সেবা করতেও হচ্ছে।

বঙ্কুকে দেখেই অবাক্ হয়ে গেল।

ডাকলে—বঙ্কু, তুমি বাবা এখানে বসে আছ?

বঙ্কু উত্তর দিলে না।

বড়গিন্নী আরও একটু অবাক্ হয়ে গেল। এমন তো করে না কখনও বঙ্কু। ডাকলেই সাড়া দেয় বরাবর।

বললে—হরতন একলা রয়েছে নাকি ?

বঙ্কু এবার গর্জে উঠল, কেন একলা থাকবে না ? আমি কে ? আমি কেন তাকে দেখব শুনি ? আমার কোনও কথার যখন দাম নেই, তখন হরতন মরে যাক, জাহান্নমে যাক, আমি আর দেখতে যাচ্ছি নে।

—কি হল তোমার হঠাৎ ? রাগ করলে কেন ? হরতন কিছু বলেছে ?

—হরতন কেন বলতে যাবে ? সে সে-রকম মেয়ে নয়। আমি তাকে আপনার চেয়েও বেশি দিন চিনি, তার নামে কেন আপনারা মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন ?

—তাহলে তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ কেন বাবা ? কি হয়েছে তোমার ?

বঙ্কু বললে—সে আমার খুশি, আমি বেশ করছি বসে আছি—

বড়গিন্নী বললে—তোমার কি খিদে পেয়েছে বাবা ? আমি না-হয় ভাত বেড়ে দিচ্ছি আগে—

বঙ্কু বললে—খিদে পেতে আমার বয়ে গেছে, আমার অত নোলা নেই—ফটিকের মত অত খাই-খাই বাই নেই আমার—

—ফটিক ? ফটিক কে বাবা ?

—ফটিক কে সে আপনার জেনে দরকার কি ? সব কথায় আপনি কান দেন কেন ? আপনারা খেয়ে নিন্ গে যান, আমি আর খাবই না, আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শই করব না—

বড়গিন্নী ভয় পেয়ে গেল।

বললে—কেন বাবা ? আমরা কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ?

—না, আপনারা কেন অপরাধ করবেন, অপরাধ আমিই করেছি। আমারই হাজার অপরাধ—আমি লেখা-পড়া জানি না, মুখ্যু মানুষ, যাত্রা করে বেড়াই, সবই আমার অপরাধ।

—এ সব কি বলছ তুমি!

বঙ্কু এবার রেগে উঠল।

বললে—আমি বলছি বার বার যে আমি এখন চুপ করে বসে থাকব, কথা বলব না, খাব না দাব না, তবু কেন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন? আপনি কি চান যে আমি আপনাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

—তা কেন বলব বাবা? আমি কি কখনও তাই বলেছি তোমাকে?

—মুখে বলেন নি আপনারা, কিন্তু মনে মনে তো বলেছেন!

—ওমা, সে কি কথা! এমন কথা যে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!

বঙ্কু বললে, আপনি না ভাবেন, ওই বেটা ভেবেছে—

—কে বাবা? কার কথা বলছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে—

বঙ্কু বললে—তা কেন চিনতে পারবেন, নিজেদের লোক কি না, তাকে তো আপনারা চিনতেই পারবেন না, আর আমি যে পর, পর বলেই আমাকে এত অপগেরাহ্যি—আমি তো এ-বাড়ির কেউ নই, বসে বসে কেবল আপনাদের অন্ন-ধ্বংস করছি—

বড়গিন্নী ভাবলে সব বুঝি অভিমানের কথা। বললে, কার কথা বলছ তা বুঝতে পারছি না বাবা, তা সে যা-হোক, বুঝতে পারছি তোমার খিদে পেয়েছে, খিদে পেলে তো রাগ হবেই মানুষের—

বঙ্কু দাঁড়িয়ে উঠল এবার। আর থাকতে পারলে না।

বললে, খবরদার বলছি মা-মণি, আমাকে আর রাগিয়ে দেবেন না। আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায়, তার ওপর আর জ্বালাবেন

না আপনি! আমি এক কথা সাফ বলে দিচ্ছি, আমার খিদে পায় নি—

—তাহলে? তাহলে তোমার হয়েছেটা কি?

বঙ্কু বললে, তাহলে আপনি শুনবেন?

—হ্যাঁ, বল না, শুনব বলেই তো জিজ্ঞেস করছি—

—তাহলে যা বলব তা করবেন?

বড়গিন্নী বড় মুশকিলে পড়ল।

বললে, কি করতে হবে আগে তাই বল?

—না, আমি যা বলব তাই করবেন, কথা দিন—

—আচ্ছা বাবা, তাই করব, কথা দিলাম—

বঙ্কু পাশের বারান্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, তাহলে ওই বেটাকে আগে তাড়ান—

—কাকে তাড়াব? কার কথা বলছ তুমি বাবা?

—কেন? ন্যাকা আপনি? বুঝতে পারছেন না? ওই যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে কেবল গেরস্থর ভাত গিলছে!

—ও, নিবারণ সরকারের কথা বলছ?

—তা না তো কার কথা বলব? ও আপনাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনারা তো এখনও চিনলেন না—আপনাদের খেয়ে-পরে আপনাদেরই সব্বোনাশ করছে—

বড়গিন্নী বললে, ছিঃ বাবা, ও-কথা বলতে নেই, ওই নিবারণ ছিল বলে তবু যা-হোক এখনও বেঁচে আছি আমরা, নইলে কবে···

বঙ্কু বললে, তবে থাকুন, সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকুন আপনারা—আমার কথা যখন বাসি হবে তখন ফলবে!

—কিন্তু নিবারণের ওপর তোমার এত রাগ কেন বাবা? কি করেছে তোমার ও?

—কি করে নি আগে তাই জিজ্ঞেস করুন গিয়ে ওকে। আজ

তিন দিন হল পই-পই করে বলছি যে টাকা দিন, হরতনের ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, ওষুধ কিনে আনব। আটটা বিয়াল্লিশের গাড়িতে কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারকেও ডেকে আনব আর অমনি ওষুধও কিনে আনব। তা টাকাটা দেবার নামই নেই! ভেবেছে টাকা নিয়ে আমি চম্পট দেব? টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে যাব? আমি নিজের জন্যে এ-পর্যন্ত একটা টাকা কখনও নিয়েছি? এই যে আমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে, এর জন্যে কখনও বলেছি আপনাদের যে, একটা নতুন জামা দরকার? কখনও সে-কথা শুনেছেন আমার মুখে? আমার কিসের ভাবনা মা-মণি! আমি নিজের জন্যে জীবনে কখনও ভাবতে যাই নি, আজ ভাবব? আমি হরতনের কাছে যেতেই পারছি না সেই ভয়ে। পাছে হরতন সেরে ওঠে তাই টাকাটা ও দিচ্ছে না আমাকে, তা জানেন? আজ যদি আমার পকেটে টাকা থাকত তো আমি ওর টাকার পরোয়া করতাম? আমি নিজেই গিয়ে ডাক্তার আনতাম, ওষুধ আনতাম, তা জানেন?

বড়গিন্নী এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

বঙ্কু আবার বলতে লাগল—এতদিন পরে একটু শরীরটা সেরেছে হরতনের, আর ঠিক এই সময়েই ওর বদমায়েসী! আমি কিছু বুঝি না ভেবেছে? আমি বোকা? আমি আহাম্মক? আমি মুখ্যু বলে কি একেবারে গো-মুখ্যু ভেবেছে আমাকে?

বড়গিন্নী তখনও চুপ। তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই বড়গিন্নী চমকে উঠল। নিবারণের গলা।

—গিন্নীমা!

কেবল ওইটুকুই। তার বেশি কিছু বলবার ক্ষমতা যেন নিবারণ সরকারের নেই।

বঙ্কু দেখতে পেয়েছে। নিবারণকে দেখতে পেয়েই বড়গিন্নীর

দিকে চেয়ে বলতে লাগল, এই তো এসেছেন বিভীষণ, এবার জিজ্ঞেস করুন যা বলেছি আমি সত্যি কি না। প্রমাণ হয়ে যাক কে সত্যিবাদী আর কে মিথ্যুক। যাক্, মুখোমুখি প্রমাণ হয়ে যাক্—

বঙ্কুর কথাতে যেন কেউই কান দিলে না। দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করলে না। নিবারণ সরকার মাথা নীচু করে শুধু বললে—শেষ।

বড়গিন্নীও যেন পাথর হয়ে গেছে। একটু নড়লে না, একটু হেললে না, একবার আচম্‌কা আর্তনাদ করেও উঠল না। যেমন ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ধীর-স্থির হয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল মাথার ওপর সমস্ত ছাদটা ভেঙে পড়লেও যেন সে ওই রকম ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। পৃথিবীর কোনও শক্তিই যেন তার মাথা নুইয়ে দিতে পারত না।

শুধু বঙ্কু বোকার মত দুজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা মানে খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোনও মানে খুঁজে না পেয়ে নিবারণের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—শেষ মানে? কিসের শেষ? শেষ বললেই চলবে না আমাকে, কিসের শেষ বুঝিয়ে দিতে হবে!

কিন্তু কে আর সে-কথা বঙ্কুকে বোঝাবে তখন। দুজনের সমস্ত বোধশক্তি যেন বোধগম্যের বাইরে চলে গেছে।

এতটুকু কান্নাকাটি নেই, এতটুকু আর্তনাদ নেই, এ কেমন মৃত্যু! কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্যি বংশে কান্নারও যেন পরাজয় হয়েছে। কর্তামশাই নিজে জীবনে কখনও কাঁদেন নি, তাঁর মৃত্যুতেও কেউ কাঁদতে পাবে না। তোমরাও কেঁদ না কেউ। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এসেছে। আবার সব ঐশ্বর্য ফিরে আসবে। একদিন কেষ্টগঞ্জের লোক আবার দেখবে, এই ভট্টাচার্য-বাড়িই দুলাল-সা'র বাড়ির চেয়ে ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছে। আমি না-হয় চলেই গেলাম। কিন্তু হরতন তো রইল, লক্ষ্মী তো রইল। দুলাল সা' তার সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে কাশীবাসী হবে। এতদিনে তার সুমতি হয়েছে, সেটাও সুলক্ষণ। বেঁচে থাকতে কেউ আসে নি সংসারে। একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে। আজ আমি যাচ্ছি, কাল দুলাল সা', নিতাই বসাক সবাই যাবে। একদিন আগে আর একদিন পরে। কিন্তু দেখে নিও, সত্যের জয় হবেই। আমি সারা জীবন ধর্মের পথে থেকেছি, আমার পরাজয় কেমন করে সহ্য করবেন ঈশ্বর। পাপ যা তা কখনও চাপা থাকে না। পারার মত তা ফুটে বেরোবেই। দুলাল সা' যত পাষণ্ডই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

নিবারণের মনে হল যেন কর্তামশাই আবার কথা বলছেন।

—হোক মৃত্যু, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় না নিবারণ। তুমি রইলে, তুমি দেখে যেতে পারবে আমার কথা মিথ্যে হবে না, হবে না, হবে না—

সকাল থেকে নিবারণের অনেক ঝামেলা গেছে। কয়েক রাত নিবারণের ঘুমই হয় নি, সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কর্তামশাই-এর পাশে বসে থেকেছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে। কর্তামশাই-এর ঐশ্বর্যের দিনে যখন এসেছিল নিবারণ তখন তার বয়েস কম ছিল। অনেক আশা ছিল, আশাতিরিক্ত উৎসাহও ছিল। কিন্তু দিনে দিনে সব যখন একে একে গেল চোখের সামনে, তখনও একটা মাত্র ভরসা ছিল,—হরতন। সেই হরতনের জন্যেই হয়তো কর্তামশাই বেঁচে ছিলেন এতদিন। কিন্তু নিবারণ কেমন করে মুখ ফুটে বলবে তাঁর সব আশা, সব কল্পনা নির্মূল হয়ে গেছে? সব মিথ্যে, সব অসার?

কর্তামশাই-এর সেই শবদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে নিবারণ যেন বলবার চেষ্টা করলে—টাকা আমি পাই নি কর্তামশাই—

—কেন? পাওনি কেন টাকা?

নিবারণ বললে—দুলাল সা' দিলে না,—

—দিলে না মানে? বরাবর দিয়ে এসেছে আর আজ দিলে না কেন?

নিবারণ বললে—দুলাল সা'র কিছু নেই আর—

কর্তামশাই যেন চিৎকার করে উঠলেন—কি যা-তা বলছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিবারণ? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

—আজ্ঞে, না কর্তামশাই, আজ আপনি আর শুনতে পাচ্ছেন না, তবু আমি বলছি, দুলাল সা'র কিছু নেই আর—

—তার মানে?

—তার নিজের পুত্রবধূ, যাকে দুলাল সা' নিজে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে এসেছে, সেই তার নতুন-বৌই ভেজাল। সে জেলের মেয়ে।

—বলছ কি তুমি ?

—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি কর্তামশাই। আমি আপনার চিকিৎসার জন্যে, হরতনের চিকিৎসার জন্যে টাকা চাইতে গিয়েছিলাম আজ সকালে। গিয়ে দেখলাম তাদের সর্বনাশ হয়েছে, বাড়িতে পুলিস এসেছে, দারোগা এসেছে, সেই নতুন-বৌও এসেছে—সকলের সামনেই সব প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি চলে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু নতুন-বৌ জোর করে আমাকে সেখানে থাকতে বললে—আমি সব শুনে এলাম···

—কি শুনে এলে ?

—শুনে এলাম সেই ঘটক—যে ঘটকালি করেছিল ছুলাল সা'র ছেলের বিয়ের, সেই ঘটক নিজের মুখেই সব বলে ফেললে। সে-ও যে পাগল হয়ে গেছে কর্তামশাই। পনেরো ভরি সোনার লোভে সে ছুলাল সা'র এই সর্বনাশ করেছিল, তাও বললে। এ সমস্ত কিছুর মূলে সেই সদানন্দ। ছুলাল সা'র সেই পাটের আড়তের কয়াল। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে যে সমস্ত কিছু হ্যাঙ্গাম বাধিয়েছিল।

বলতে বলতে নিবারণের চোখ ছুটো জলে ভরে এল। বড়গিন্নী কর্তামশাই-এর বিছানার পাশেই নিঃঝুম নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। নিবারণ সেই দিকেও একবার চেয়ে দেখলে। আজ এত বড় ঝড় বয়ে গেল এ-বাড়িতে, অথচ কেষ্টগঞ্জের জনপ্রাণীটি পর্যন্ত তার আভাস পেলে না। কেউ জানতে পারলে না কেষ্টগঞ্জের কত বড় সর্বনাশ ঘটে গেল। এবার থেকে ছুলাল সা' যা খুশি তাই করবে, কেউ তার প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত রইল না।

হঠাৎ কর্তামশাই যেন বলে উঠলেন—চুপ করলে কেন ? বল, বল, তারপর বল—

—তারপর আমি আর কিছু জানি না কর্তামশাই, তবু বুঝতে

পারলাম সদানন্দ শুধু-শুধু মরে নি। শুধু-শুধু মরবার লোক নয় সে। তাকে খুন করা হয়েছে। পুলিস তার প্রমাণ পেয়েছে।

—কেন? কে তাকে খুন করলে? কেন খুন করলে? তাকে খুন করে কার কি লাভ?

নিবারণ বললে—তাকে না মারলে যে সব ফাঁস হয়ে যায় কর্তামশাই। সে যে সব জানত। কোথা থেকে তুলাল সা' কত টাকা আয় করেছে, সব যে তার নখদর্পণে। সে যে এককালে তুলাল সা'র খাতা রাখত। তুলাল সা' কত টাকা গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়েছে তা যে সব সে জানত—

—এখন তাহলে কি হবে?

নিবারণ বললে—সে তো পুলিস জানে কর্তামশাই। সদানন্দকে খুন করার জন্যে কারোর শাস্তি হবে কি না তা পুলিসই বিচার করবে। কিন্তু নতুন- বৌ যে তার নিজের বিচার নিজের হাতে নিয়েছে।

—তার মানে?

নিবারণ বললে—নতুন-বৌ আমার সামনেই বললে যে, যদি প্রমাণ হয় যে সত্যিই সে জেলের মেয়ে, যদি সে প্রমাণ পায় যে দোলগোবিন্দের ঠকানোর শিকার হয়েছে, তাহলে সে শ্বশুর, স্বামী, সংসার সব কিছু ত্যাগ করে চলে যাবে—

—কোথায় যাবে?

নিবারণ বললে—আমি আর শুনতে পারলাম না কর্তামশাই। আমি আর শুনতে চাইলামও না। নতুন-বৌ-এর মুখের দিকে চেয়ে, তুলাল সা'র ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আমার বড় তুঃখ হল। ভাবলাম, কেন আমি এখন ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে টাকা চাইতে না গেলে তো ও-সব আমাকে শুনতে হত না—। কিন্তু যতবার অমি চলে আসতে চেয়েছি ততবারই নতুন-বৌ আমাকে

বাধা দিয়েছে। কেবল বলেছে—আমি চাই সবাই শুনুক, সবাই জানুক—! বাইরের মানুষের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে দিয়ে হয়তো হাল্‌কা হয়ে যেতে চেয়েছিল নতুন-বৌ—

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল ?

নিবারণ বললে—শেষ পর্যন্ত সবাই নতুন-বৌ-এর বাপের বাড়ির দেশে যাওয়া ঠিক করলে, আমি সেই পর্যন্ত শুনেই চলে এলাম কর্তামশাই—সেখানে গিয়ে যদি প্রমাণ হয় নতুন-বৌ স্বজাতির মেয়ে নয়, তাহলে কি হবে তা আর বলতে পারছি না।

কর্তামশাই-এর প্রাণহীন নিষ্কম্প দেহটা তখনও বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বড়গিন্নীও তাঁর পাশে নিথর-নিশ্চল হয়ে বসে। বাইরে একবার গাড়ির শব্দ হল। হয়তো কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারবাবু এলেন। বঙ্কু ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে গিয়েছিল। গাড়িটা বাড়ির সামনে থামল। গাড়ির দরজা খুলে সেটা আবার বন্ধ হবার শব্দও হল। শেষবারের মত ডাক্তারবাবু এসে যথারীতি সার্টিফিকেট দিয়ে যাবেন। ওপরের ঘরের এক প্রান্তে হরতন শুয়ে আছে। তাকে খবর দেওয়া হয় নি। সে জানতেও পারে নি যে কর্তামশাই-এর জীবন-দীপ নিঃশেষ হয়ে গেছে। জানতে দিলে তার ক্ষতি হতে পারে। যখন জানবে তখন জানবে। তার আগে তাকে খবর দিলে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

নিবারণ ডাক্তারবাবুকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে ঘরের বাইরে যেতেই অবাক হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু নয়, সুকান্ত রায়, কেষ্টগঞ্জের ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার।

—আপনি কি করে খবর পেলেন সুকান্তবাবু ?

—কিসের খবর ?

সুকান্ত রায় কথাটা শুনে হতবাক্ হয়ে গেল।

নিবারণ বললে—আপনি শোনেন নি কিছু ?

—কি শুনব ?

ততক্ষণে ওদিকে কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারবাবুর গাড়িটা এসে বাড়ির সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে নামল ডাক্তারবাবু। আর তার পেছনেই বঙ্কু।

সুকান্ত বুঝতে পারলে না কিছু। নিবারণের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—অসুখ কার ? কর্তামশাই-এর নাতনীর ?

সুকান্ত রায় আসলে এসেছিল নিতাই বসাককে খুঁজতে। অনেক টাকা নিয়েছে নিতাই বসাক। এ পর্যন্ত কত টাকা যে দিয়েছে সুকান্ত নিতাই বসাককে তার হিসেব-নিকেশ নেই। রাজা করে দেবার ক্ষমতা আছে নিতাই বসাকের, এটা নিতাই বসাকই বার-বার প্রচার করেছে।

যখনই সুকান্ত বলেছে—কি দাদা, কি হল ? রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিলেন আর ?

নিতাই বসাক এমনিতে ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু ভদ্রতাতে নিখুঁত। বলেছে—সে কি কথা বলছেন মিস্টার রায় ? রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাব না ? তা হলে খাব কি ? আমাদের পেট চলছে কিসে ?

—না, না, আপনাদের সব বড় বড় পারমিটের ব্যাপার, আপনা-দের তো যেতেই হবে ! তা বলছি না, বলছি আমার ব্যাপারটার কিছু খবর নিয়েছেন ?

—বাঃ, এটা কি বললেন ? আপনার ব্যাপারের জন্যে ভাবছেন আমার মাথা-ব্যথা নেই ? কালীপদবাবুকে বলে এলাম। বললাম—

সুকান্ত বাবু আমার ক্যাণ্ডিডেট, তার জন্যে আপনাকে কিছু করতেই হবে স্যার, নইলে আমরা বাঁচব কি করে ?

—আপনি বললেন ওই কথা ?

—তা বলব না ? কালীপদবাবু এখন মিনিস্টার হয়েছেন বলে কি একেবারে পীর হয়ে গেছেন ? একসঙ্গে আমরা কত তাস খেলেছি দুজনে, মুড়ি-তেলে-ভাজা খেয়েছি, সে সব কি আর ভুলে যেতে পারে কেউ ?

—আপনারা কি একসঙ্গে আড্ডাও দিয়েছেন নাকি ?

নিতাই বসাক হো-হো করে হাসত। বলত—আরে শুধু কি একা কালীপদবাবু ? ওই এক আপনাদের ডাক্তার বিধান রায় ছাড়া আর যতগুলো মিনিস্টার আছে সকলের সঙ্গেই তো আড্ডা দিয়েছি এককালে। আমি ছিলাম মশাই এক নম্বরের আড্ডাধারী। জীবনে আমার যা-কিছু উন্নতি দেখছেন সবই ওই আড্ডার দৌলতে। তবে হ্যাঁ, লোক বেছে বেছে আড্ডা দিয়েছি। আমার ফোর-সাইট ছিল, এমন-এমন লোকের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি যারা একদিন বড় হবে জানতাম—

সুকান্ত বলত—সত্যিই আপনার দেখছি দূর-দৃষ্টি আছে—

নিতাই বসাক বলত—তবে মুশকিলটা কি জানেন, আজকাল মিনিস্টারদের সেক্রেটারিগুলো হয়েছে ত্যাঁদোড়! কথা শুনতে চায় না। আর তাদেরও দোষ নেই—ঘুষ-দেনেওয়ালা লোক যে আজ-কাল রাইটার্স বিল্ডিং-এর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এমন লোভ দেখিয়ে দিয়েছে যে টাকা না দিলে আর কলম ধরতে চায় না—

সুকান্ত বললে—তা যদি বলেন তো টাকা না-হয় দেব—কত টাকা দিতে হবে ? এক হাজার ?

নিতাই বসাক বলত—খবরদার, খবরদার! টাকার নামটি

করবেন না। আগে কাজ না হলে ওদের টাকা দিতে নেই। সব বেটা রাঘব-বোয়াল! টোপটা গিলে নিয়েই একেবারে মাটির নীচেয় গিয়ে ডুব মারবে, আর টিকি দেখতে পাওয়া যাবে না—

সুকান্ত জিজ্ঞেস করত—তা হলে কি করব?

প্রথম প্রথম নিতাই বসাক বলত—সে যা করতে হবে, আমি যথা-সময়ে বলব, আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার রায়—

কিন্তু আস্তে আস্তে পরিচয় যত পুরনো হতে লাগল, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল, ততই যেন নিতাই বসাক বদলে যেতে লাগল। বলতে লাগল—দিন, দুশো টাকা দিন, কাজটা পেকে এসেছে—

সুকান্তর অবস্থা এমন কিছু নয় যে দুশো বললে তখনি দুশো টাকা বার করে দেবে। কিন্তু চাকরির উন্নতির জন্যে লোকে সব কিছু করে। বৌ-এর গয়না বাঁধা দিতে হলেও কেউ পেছ্‌পাও হয় না। সুকান্ত নিজের উন্নতির জন্যে যে-ক'টা টাকা জমিয়েছিল, আস্তে আস্তে সবই নিতাই বসাকের হাতে তুলে দিয়েছিল। শেষকালে যখন বোঝা গেল তার হাতে আর টাকা নেই, তখন থেকেই নিতাই বসাকের আসাও কমে এল। তখন সুকান্তকেই নিতাই বসাককে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়। বার-বার গাড়ি নিয়ে এসে দুলাল সা'র বাড়ি এসে শোনে—নিতাই বসাক কলকাতায় গেছে, কিংবা দিল্লী গেছে, কিংবা বোম্বাই—

শেষকালে একেবারে আর দেখাই পাওয়া যায় না তার।

তখন সুকান্তর মনে সন্দেহ হতে লাগল। লোকটা কি তাকে ঠকালে নাকি?

তাই সেদিন দুলাল সা'র বাড়িতে এসে যখন শুনলে কলকাতায় গেছে নিতাই বসাক, তখন কি খেয়াল হয়েছিল, ভেবেছিল কর্তামশাই কেমন আছেন একবার দেখে যাবে। দুলাল সা'ও নেই, নিতাই বসাকও নেই। সব গেছে বেয়াই-এর দেশে!

কিন্তু এখানে এসে যা শুনলে তাতে হতবাক্ হয়ে গেল।

নিবারণের তখন পাগলের মতন অবস্থা।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে—শেষকালে কি হয়েছিল ?

ততক্ষণে বোধ হয় খবরটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে কেষ্টগঞ্জে। পিল্ পিল্ করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। কারোর মুখেই আর কোনও কথা নেই। সেই সবই হল শেষ পর্যন্ত। কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্যি-বাড়ি আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। সত্যিই আবার হরতন ফিরে এল। নাতনী আসার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তামশাই আবার বংশের আদি-গৌরব ফিরিয়ে আনলেন। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলেই হয়তো পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের ওপর ছুলাল সা'র নতুন সুগার-মিলটাও নিয়ে নিতেন। কর্তামশাই নিজেও সকলকে তাই বলতেন শুনিয়ে শুনিয়ে। সবাই-ই আশা করেছিল সেইটাই সত্যি হবে। কবে একদিন ছুলাল সা'র গুরুদেব এসে কি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, তার সবটাই যদি মিলল তো বাকিটা মিলল না কেন ? কেন তিনি বাকিটা দেখে যেতে পারলেন না ?

ভেতর-বাড়িতে বড়গিন্নী বুঝি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। এমনিতে বড়গিন্নীর গলা কখনও কেউ শোনে নি বা শুনতে পায় না। কিন্তু আজকের দিনেও কি সে না কেঁদে থাকতে পারে ?

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বললে—কর্তামা, চুপ করুন, হরতন শুনতে পাবে—

হরতনের নামটা শুনেই বড়গিন্নী সামলে নিলে বুঝি নিজেকে। আর কাঁদতে পারলে না। একমাত্র নিবারণ ছাড়া হরতনের কথা বুঝি সবাই ভুলেই গিয়েছিল। এতদিন এত যত্ন, এত চিকিৎসা, এত সেবা, এত অর্থব্যয় যাকে কেন্দ্র করে হচ্ছিল, তার কথা বুঝি আর কারো মনেই ছিল না। সে যে এই মৃত্যুর কথা জানে না,

তাকে যে এই মৃত্যুর সংবাদ জানানো উচিত নয়, তা যেন কারোর খেয়ালই ছিল না। সত্যিই তো, এ-খবর জানলে তার অসুখ তো আবার বেড়ে যেতে পারে। সে-দিকটা দেখছে বঙ্কু। বঙ্কু এতক্ষণ সব দেখে বোবা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খেয়াল ছিল তার সব দিকে। সে সিঁড়িটা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ যেন না ওপরে যেতে পারে, কেউ যেন না ওপরে গিয়ে খবরটা হরতনকে দিতে পারে, হরতনও যেন কর্তামশাই-এর খবরটা পেয়ে নীচেয় নেমে না আসে।

তবু সন্দেহ ঘোচে নি বঙ্কুর।

বঙ্কু আস্তে আস্তে ওপরে গেল। বাইরের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলে হরতন ঘুমোচ্ছে। মাথার ওপরে পাখাটা বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। সামনের টেবিলের ওপর ডাব, বেদানা, আঙুর, আপেল। সমস্ত কিছু তৈরি।

হঠাৎ হরতন চোখ মেলতেই দেখে ফেললে বঙ্কুকে।

—কি, লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছিলে?

থতমত খেয়ে গেল বঙ্কু। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। বললে —না, দেখতে এসেছিলাম তুমি কি করছ? ওষুধ খাবার টাইম হয়েছে কি না!

হরতন ঠোট বেঁকালে। বলল—ওষুধ আমি আর খাব না—

—কেন? কত কষ্ট করে কলকাতা থেকে ওষুধ আনি আমি তা জান?

—তা তো জানি! এত কষ্ট করে ওষুধ এনে তুমি কি ভাব তোমার লাভ হবে কিছু?

—আমি কি আমার লাভের জন্যে কষ্ট করি ভেবেছ? তুমি ভাল হয়ে যাবে বলেই তো এত কষ্ট করা!

—তা আমি ভাল হলে তোমার লাভটা কি? আমি ভাল হয়ে

গেলেই তো তোমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। তখন তোমাকে আর এ-বাড়িতে কেউ খেতে দেবে না বিনা পয়সায়।

বঙ্কু একটু হাসতে চেষ্টা করলে। নীচেয় যে-কাণ্ড হচ্ছে তা যেন হরতন টের না পায়।

বললে—আমি বিনা পয়সায় এখানে খাচ্ছি, এটা তোমার বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

হরতন বললে—তা বলছি না, বলছি আমি ভাল হয়ে গেলে তোমাকে আবার খেটে খেতে হবে চণ্ডীবাবুর অপেরায়—

তারপরে হঠাৎ নিজের কানটা খাড়া করে রইল হরতন।

বললে—নীচেয় কিসের গোলমাল হচ্ছে গো? অনেক লোক এসেছে বুঝি?

হরতন যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল।

বললে—অনেকদিন দাদুকে দেখি নি, দাদু আমার কাছে আর আসে না কেন বল তো? আমি ভাল হয়ে গেছি বলে?

বঙ্কু বললে—না না, অনেক কাজ-কর্ম পড়েছে যে! আরও একটা জমি কিনছেন তোমার জন্যে। সেখানে আর একটা বাড়ি তুলবেন কি না! রোজই তো তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন কর্তামশাই, এই তো এক্ষুণি জিজ্ঞেস করছিলেন হরতন কেমন আছে—

—তুমি কি বললে?

—আমি আর কি বলব? আমি বললাম খুব ভাল আছে। আর সত্যিই তো তুমি খুব ভাল আছ। আর তুমি ভাল হলেই তো আমি ছুটি পাব।

হরতন এবার হাসল। বললে—তাহলে আমি আরও কিছু দিন শুয়ে পড়ে থাকি, কি বল?

—কেন?

—তাহলে তুমি যা চাও তাই-ই হবে।

—আমি কি চাই তুমি জানলে কি করে ?

—এতদিন একসঙ্গে যাত্রাগান করে এসেছি, তুমি কি চাও তা আর জানি না মনে কর ?

—তুমি খুলে বল না, আমি কি চাই ?

—যাও, পারিনে বাপু তোমার সঙ্গে ! এ কি নল-দময়ন্তীর পালা যে পার্ট দেখলাম আর মুখস্থ বলে গেলাম !

বঙ্কু বললে—দাদু কিন্তু বলেছে একদিন তোমার প্লে দেখবে। তুমি ভাল হয়ে উঠলে একদিন এই বাড়ির সামনের বাগানে 'রাণী রূপকুমারীর' প্লে দেখবে তোমার—

হরতন বললে—এখন সব পাট ভুলে গেছি, সে-সব আর কিছু মনে নেই—

বঙ্কু বললে—আমি কিন্তু ভুলি নি। আমি তোমার পার্টটা এখনও গড়-গড় করে বলে যেতে পারি। আমার সব কথা মনে আছে।

হরতন হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আমি সেরে উঠলে তুমি কি করবে বঙ্কুদা ? আবার গিয়ে চণ্ডীবাবুর অপেরায় ঢুকবে তো ?

বঙ্কু বললে—সে-সব কথা এখনও ভাবি নি।

—কিন্তু এখন থেকে না ভাবলে চলবে কি করে তোমার ? চিরকাল তো আমার কাছে বসে থাকলে তোমার চলবে না।

বঙ্কু বললে—তা তো চলবেই না। তোমার বিয়ে হবে, সংসার হবে, তুমি গিন্নী-বান্নি হয়ে ঘর-সংসার করবে, তখন হয়তো এক-একবার দেখে যাব তোমাকে এসে। তুমি হয়তো ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে, তারপর ভেতরে চলে যাবে—

হরতন হাসল, বললে—বা রে, তুমি তো বেশ আমার ভবিষ্যৎ একেবারে ছক্ কেটে রেখে দিয়েছ দেখছি—তোমার তো বেশ দূর-দৃষ্টি আছে—

বঙ্কু বললে—সত্যি বলছি অঞ্জনা, তার বেশি দাবি করবার কি অধিকার আছে আমাদের ?

হরতন বললে—না বাপু, তুমি আর যাত্রা করো না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

বঙ্কু বললে—আমার 'রূপকুমারীর' পার্ট দেখে কত লোকে কত হেসেছে, কত লোকে কত দুয়ো দিয়েছে, তাতে আমি কিছু মনে করি নি। কিন্তু তুমি আমাকে দুয়ো দিলে যে আমার গায়ে লাগে।

হরতন বললে—তা অন্যায়টা আমি কি বলেছি! কেন তুমি ও-সব কথা আমাকে শোনাচ্ছ ?

—কি কথা ?

—ওই যে আমি বিয়ে করে সংসার করে ঘোমটা দিয়ে তোমার সামনে আসব, হ্যান্-ত্যান্ কত কি কথা বললে !

—তা আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি ? তুমি বিয়ে করবে না কোনওদিন ? সংসার করবে না কোনওদিন ? তাহলে এই এত বড় বাড়ি, এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য, এ-সব খাবে কে ? এ-সব দেখবে কে ?

হরতন বললে,—ও, তাই বল, আমি যে এত বড়লোক হয়েছি এ বুঝি তোমার সহ্য হয় নি ?

বঙ্কু বললে—সহ্য হয়েছে বলেই তো তোমার মুখের সামনে এত কথা বলবার সাহস হয়েছে আমার—তুমি যে এতদিন পরে আবার সেরে উঠেছ এতে আমার মত আর ক'জনের আনন্দ হয়েছে শুনি ?

হরতন বললে—কিন্তু সত্যি বলছি বঙ্কুদা, মনে হচ্ছে এত আরাম না পেলে হয়তো বুঝতে পারতাম না কাকে বলে কষ্ট সহ্য করা। তাই তো তোমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। এখান থেকে ফিরে গেলে আর কি চণ্ডীবাবু তোমাকে চাকরি দেবে ? আর চাকরি দিলেও তুমি কি আর সে-চাকরি করতে পারবে ?

বঙ্কু বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও তুমি, আমি কি আর একটা মানুষ!

হঠাৎ নীচে থেকে আর একটা গোলমাল কানে এল।

হরতন জিজ্ঞেস করলে—ও কিসের শব্দ? অত গোলমাল হচ্ছে কেন নীচেয়? ওরা কারা গো?

বঙ্কু বললে—ও কিছু না অঞ্জনা, কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না, দাদু বোধহয় সরকার-মশাইকে বকছেন।

আবার নীচে থেকে গোলমাল উঠল। হরতন বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল।

বঙ্কু বললে—তুমি উঠছ কেন? আমি দেখে আসছি, তুমি শুয়ে থাক—

কিন্তু নীচের গোলমালটা যেন আরও বেড়ে উঠল। কার যেন চাপা কান্না, কয়েকজন লোকের কথাবার্তা, যেন অনেক লোক এসে কি সব বলছে। বিরাট বাড়ি, সব কথা স্পষ্ট ওপরে এসে পৌঁছচ্ছে না।

—তুমি যেন চেপে যাচ্ছ আমার কাছে! বল কি হয়েছে? বল?

বঙ্কু বললে—না না, কিছু হয় নি। তুমি শুয়ে থাক চুপ করে—আমি দেখছি, আমি যাচ্ছি নীচেয়, আমি দেখে আসছি—

হরতন কথা না শুনেই উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে।

বললে, তুমি লুকোচ্ছ বঙ্কুদা আমার কাছে, আমি বুঝতে পেরেছি—

বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বঙ্কু হরতনের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—তুমি যেও না অঞ্জনা, নিচেয় যেও না, কথা শোন, তোমার শরীর খারাপ, তোমার অসুখ—

হরতন এক ঝটকায় বঙ্কুর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বঙ্কুও চিৎকার করে ধরতে গেল—অঞ্জনা, তোমার অসুখ, ডাক্তার বারণ করেছে তোমায় নড়া-চড়া করতে, শোন শোন—

কিন্তু ততক্ষণে নীচে থেকে গোলমাল আরও জোরে কানে আসতে শুরু করেছে। হরতন দুম দুম করে সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

বঙ্কুও পেছন পেছন নামছিল—অঞ্জনা, অঞ্জনা—

কিন্তু হরতন নীচেয় এসেই অবাক হয়ে গেছে। নীচেয় তখন অনেক লোক। ঘর-বারান্দা-বৈঠকখানা সব ভর্তি হয়ে গেছে।

বঙ্কুও সকলকে দেখে হতবাক হয়ে গেছে। বড়গিন্নী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। কর্তামশাই তখনও বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। ঠোঁটের ওপর একটা কালো মাছি বসে বসে পাখা নাড়ছে। আর নিবারণ সরকার পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে। তার যেন নড়বার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন।

আর যারা এতক্ষণ কথা বলছিল তারাও হরতনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে চুপ করে গেল।

হরতন সকলকে যেন চিনতে পারলে। ওই তো নতুন-বৌ, দুলাল সা', নিতাই বসাক। আর তার পেছনেই, দুলাল সা'র পেছনে, তার ছেলে বিজয়।

সুকান্ত রায় এদের পেছনে দাঁড়িয়ে সকলকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

আর সকলের শেষে কয়েকজন পুলিস, দারোগা, আর একজন অচেনা মুখ।

—দাদু, দাদু!

হরতনের গলার ডাকটা যেন আর্তনাদের মত শোনাল।

সকলের মনে হল যেন কর্তামশাই ওই ডাক শুনে এখনি জেগে উঠে বসবেন। কিন্তু তিনি তখন অসাড়, অচৈতন্য।

নতুন-বৌ হঠাৎ সামনে এসে হরতনকে ধরলে।

আজ এতদিন পরে কেষ্টগঞ্জের কথা মনে করতে গিয়ে শুধু বঙ্কু নয়, অঞ্জনাও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোথায় সে ছিল 'শ্রীমানী অপেরা'র রূপকুমারী। রাণী রূপকুমারী। রাণীই বটে। যাত্রাদলের মেকি রাণী থেকে একেবারে সত্যিকারের কেষ্টগঞ্জের রাজরাণী। যখন আবার জোড়হাট, গৌহাটি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়ের দিকে বঙ্কু যাত্রা করতে যায় নতুন দল নিয়ে, তখন স্টেশনের প্ল্যাটফরমে লোকের ভিড় জমে যায়। আগে যেমন 'শ্রীমানী অপেরা'র সময় হত, এখনও ঠিক তেমনি। বলে—শ্রীদাম অপেরা আসছে যাত্রা করতে গো, ডাকসাইটে দল—

বঙ্কু নিজের নামেই যাত্রা-দল করেছে। বঙ্কুবিহারী দাম। দামের আগে শ্রী কথাটা বসিয়ে 'শ্রীদাম অপেরা' নাম দিয়েছে। 'শ্রীদাম অপেরা'কে এখন এক মাস আগে থেকে 'বুক্' না-করলে আর ধরা যায় না। বড্ড নাম-ডাক।

অথচ সেদিন সেই কেষ্টগঞ্জের কর্তামশাই-এর মৃত্যুর দিনটাতেও এ-কথা কল্পনা করতে পারত না বঙ্কু। তুমি আমি এবং আরও পাঁচজন ভদ্রলোক যারা প্রতিদিন কেষ্টগঞ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে এসেছি, তারা দুলাল সা'কেও দেখেছি, কর্তামশাইকেও দেখেছি। আমাদের এই পায়ের তলার পৃথিবী কেমন করে শুরু

হয়েছিল তা দেখি নি বটে, কিন্তু না-দেখলেও কেষ্টগঞ্জকে দেখেই সেটা কল্পনা করে নিতে পারি। এই পৃথিবীটাও তো একটা বড়-সড় কেষ্টগঞ্জ। প্রতিদিন রাস্তায় ঘাটে আমরা দুলাল সা'দের দেখেছি, কর্তামশাইদের দেখছি। এখানে কেউ জেতে, কেউ বা হারে। কেউ মাটি মাড়িয়ে হাঁটে, কেউ বা মাটি কাঁপিয়ে হাঁটে। দু'দলের কেউই চিরকাল এখানে বাঁচতে আসে নি। কিন্তু তবু যতদিন তারা বেঁচে থাকে ততদিন একজনের উন্নতি হলে আর একজনের বুক ফাটে। একজনের বাড়ি থেকে লুচিভাজার গন্ধ এলে আর একজনের কষ্ট হয়। একজনের সর্বনাশ হলে আর একজন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে। এই-ই চলে আসছে অনাদি অনন্ত কাল ধরে।

এখনও যদি কেউ কেষ্টগঞ্জে যায় তো কর্তামশাই-এর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে চমকে যাবে। দুলাল সা'র বাড়ি থেকে কর্তামশাই-এর বাড়িতে যেতে গেলে আগে কাদা মাড়িয়ে ঘুর-পথ দিয়ে যেতে হত। এখন আর তা নেই। এখন ও-অঞ্চলটা একাকার হয়ে গেছে। একেবারে লম্বা পাঁচিল পড়ে গেছে এ-দিগর থেকে ও-দিগর পর্যন্ত। সমস্ত জমিটাই হরিসভার নামে ব্রহ্মোত্তর করে দেওয়া হয়ে গেছে। দুলাল সা'ও নেই, কর্তামশাইও নেই। বড়গিন্নীও নেই, নিবারণ সরকারও নেই। কিন্তু তবু কেষ্টগঞ্জ আছে, আর আছে কেষ্টগঞ্জের হরিসভা।

এই সেদিন পর্যন্ত নিতাই বসাকই শুধু ছিল। সারা-জীবন পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় থেকে শুরু করে যে-লোকটা সুকান্ত রায়ের প্রমোশনটা নিয়ে পর্যন্ত অত কাণ্ড করে গেল, তার এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও রইল না। কেউ জানতেও পারল না, কেমন করে কেষ্টগঞ্জের 'দি ইণ্ডিয়া সুগার মিল লিমিটেড' পত্তনি হল, কেমন করে পাটের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট পারমিট পেল, কেষ্টগঞ্জের উন্নতির মূলে

কার হাত-সাফাই ছিল। শেষের দিকে লাঠি হাতে নিয়ে বিকেল-বেলার দিকে একটু একটু হেঁটে বেড়াত। কখনও বা একটা গাড়িতে চড়ে সমস্ত অঞ্চলটা দেখতে বেরুত। ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাত ইছামতীর শান-বাঁধানো ঘাটটার কাছে। দুলাল সা' যত-দিন বেঁচে ছিল নিজের হাতে এই ঘাট ঝাঁটা দিয়ে ধুয়েছে। মনে পড়ে যেত প্রথম যৌবনের সেই সব দিনগুলোর কথা, যখন দুলাল সা' আর সে হরিসভার জন্যে মাঝি-মাল্লা-ব্যাপারীদের কাছ থেকে মাথা-পিছু চার পয়সা করে চাঁদা তুলেছে। শুধু মনেই পড়ত তার, কিন্তু সে-সব বলবার মত, শোনবার মত লোকও তখন আর কেউ ছিল না কেষ্টগঞ্জে। তখন পাকিস্তান থেকে নতুন নতুন লোক এসে কেষ্টগঞ্জে বসতি করেছে। যারা গঞ্জের দিকে জমি পায় নি বসবাস করতে, তারা মালো-পাড়ার দিকে গিয়ে ঘর বেঁধেছে। একেবারে ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে কেষ্টগঞ্জ। নতুন নতুন রিফিউজীদের কাপড়ের দোকান, হাঁড়ি কলসীর দোকান। তারা গঞ্জ, বাজার, রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে। তাদের জন্যে রাস্তায় মোটর চালানোও বিপদ। সাইকেলটা নিয়ে এক-একবার ঘাড়ের ওপরেই হয়তো লাফিয়ে পড়ল।

তারপর একদিন নিতাই বসাকও হঠাৎ মারা গেল।

খবরের কাগজে যখন নিতাই বসাকের মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছিল তখন সেই খবরটার সঙ্গে তার ছবিও বেরিয়েছিল। ছবির নীচেয় শোক-সংবাদে নিতাই বসাকের অনেক গুণাবলীর কথাও লেখা ছিল। লেখা ছিল—'তিনি কৃষ্ণগঞ্জের প্রাতঃস্মরণীয় সন্তান। তাঁর উদ্যোগেই কৃষ্ণগঞ্জে বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তিনি একাধারে কর্মী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিরাসক্ত চিত্তে আমৃত্যু কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর,

বিবেকানন্দের দেশ আর একজন কর্মবীর হারাইল। আমরা তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি এবং তাঁহার অগণিত গুণগ্রাহী ও ভক্তদের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাই।'

যারা এ-যুগের ছেলে, তারা খবরের কাগজটা পড়ে 'আহা' বলে উঠেছিল। সত্যিই দেশের একজন মহাপুরুষ চলে গেলেন। তাই সত্যিই যেদিন কেষ্টগঞ্জে নিতাই বসাকের জন্যে শোকসভা হয়েছিল সেদিন একজন শুধু অবাক হয়ে গিয়েছিল সব দেখে শুনে। সে সুকান্ত। এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব। সুকান্তর কাছে কতদিন কত টাকা নিয়ে গেছে কত লোককে দেবার জন্যে। কিন্তু কোনও টাকাই রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারও হাতে পৌঁছয় নি। সুকান্তরও প্রমোশন হয় নি, বদ্‌লিও হয় নি। সে তখন সেই কেষ্টগঞ্জের মালো-পাড়ায় ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসারই হয়ে রয়েছে। আর কিছু হতে পারে নি।

আর শুধু রয়েছে নয়, কর্তামশাই আর দুলাল সা'র যে ঝগড়া গোড়ার দিকটা থেকে দেখে এসেছিল, তার পরিণতিটাও দেখেছে।

পরিণতিটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভিনব।

আশ্চর্য, এমন করেই মানুষের জীবনের পরিণতি ঘটে। বঙ্কুবিহারী যেদিন হরতনকে নিয়ে কর্তামশাই-এর বাড়ি ছেড়ে গেল, সেদিন সুকান্তও সশরীরে সেখানে হাজির ছিল। শুধু সে কেন, সবাই। সবাই-ই হাজির ছিল সেদিন।

সমস্ত কেষ্টগঞ্জটাই যেন তোলপাড় হয়ে উঠেছিল তখন। মালো-পাড়া, উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, গঞ্জ, সব জায়গা থেকে লোক জড় হয়ে গিয়েছিল সেই কর্তামশাই-এর বাড়িতে।

যে শোনে সেই বলে, কি হয়েছে গো? কোথায় যাচ্ছ?

এ ওর মুখ থেকে শুনেছে, সে তার মুখ থেকে শুনেছে। কেউ দেখে নি তখনও আসল ঘটনাটা। সকলেরই শোনা কথা।

মুখের কথায় বিশ্বাস নেই, তাই দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে দেখতে। এমন তজ্জব ঘটনা না দেখে থাকতে পারা যায় নাকি ?

—সত্যি বলছ ?

—হ্যাঁ গো, সত্যি না তো কি কাজ-কর্ম ফেলে মিছি মিছি যাচ্ছি ?

দেখে নি কেউ বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সবাই-ই শুনেছে। শুনেছে, এতদিন পরে নাকি কর্তামশাই-এর আসল নাতনীকে পাওয়া গেছে।

—তাহলে এতদিন যে ছিল বাড়িতে, সে কে ?

—সে কে তা গেলেই বোঝা যাবে। আমরা কি সব দেখেছি ? আমরা তো শুধু শোনা-কথা বলছি।

সেদিন কেষ্টগঞ্জে সেই শোনা কথাটা সবাই একবার শুধু যাচাই করে দেখে নিতে এসেছিল। কিন্তু এসে যা দেখেছিল, তাতে হতবাক্ হতে তাদের বাকি থাকে নি। তারাও বলেছিল—আশ্চর্য ! এমন করেও মানুষের জীবনের পরিণতি ঘটে ! কর্তামশাই সে-ই গেলেন, কিন্তু এ সব দেখে গেলে কি এমন ক্ষতিটা তাঁর হত ? তিনি তো জানতেও পারলেন না কিছু। তিনি তো তাঁর ভাগ্যের দেবতাকে ডেকে একটা ক্ষীণতম অভিযোগ করে যেতেও পারলেন না। বলে যেতে পারলেন না যে, আমি যা চেয়েছিলাম সবই তুমি দিলে প্রভু, কিন্তু এমন মর্মান্তিক ভাবে তা না দিলে কি চলত না ? তা দিলে কি তোমার মহাসৃষ্টির কাজে বড়ই ক্ষতি হত ?

নতুন-বৌ তখনও পুরো সামলাতে পারে নি।

দুলাল সা'ও যেন এ দু'দিনে একেবারে চুপ্‌সে বেঁটে হয়ে গেছে। দোলগোবিন্দ ঘটককে নিয়ে পুলিসের দল যখন আবার ফিরে এল, তখন যেন সমস্ত কেষ্টগঞ্জের চেহারাটাই চোখের সামনে থেকে বদলে গেছে।

পুলিসের দারোগা দোলগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল—তা তুমি এমন সর্বনাশ করলে কেন ?

পাগল মানুষের মনেও বুঝি পাপবোধটা ছিল তখন।

বললে—আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল হুঁজুর তখন, আমি তখন পনেরো ভরি সোনার লোভ ছাড়তে পারি নি—

—তা বলে তুমি একবারও ভাবলে না যে, দুলালবাবুর মত একজন ধার্মিক লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে ?

—তা কি আর ভাবি নি হুজুর ?

—তাহলে এমন কাজ করলে কেন ?

—ওই যে বললাম হুজুর, পনেরো ভরি সোনার লোভে। সে সোনাও পেলাম না, আমারও সব্বোনাশ হয়ে গেল।

তারপর গ্রামের কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াল। নতুন-বৌয়ের এক দিদিমা ছিল, সে-ও নেই। মৃত্যুর পর সে সম্পত্তিও নতুন-বৌয়ের হাতে এসে পড়েছে।

নিতাই বসাক আর দুলাল সা' মিলে সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলেও নিয়েছে। সুতরাং এতদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা কেউ আশাও করে নি যে, আবার সেই নাতনী এদেশে আসবে।

—তা তুমি কি করে জানলে যে ইনি জেলের মেয়ে ?

—আজ্ঞে, বিয়ের আগে ওনার দিদিমার কাছেই শুনেছিলাম। সেই জন্যেই তো বিয়ে হচ্ছিল না।

নতুন বৌ হঠাৎ বলে উঠল—মিথ্যে কথা, তাহলে আমি জানতে পারতাম। তুমি মিথ্যে কথা বলছ !

—না মা, আগে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, আগে অনেক পাপ করেছি, সেই পাপের ফলও পাচ্ছি হাড়ে-হাড়ে। আমার নিজের মেয়েরাও মরে গেছে সেই পাপে। যাদের ভালর জন্যে আমি সদানন্দের কথায় ভুলে মিথ্যে কথা বলেছিলাম, 'সা'মশাই-এর

সর্বনাশ করেছিলাম, তারাই আর নেই মা এখন। এখন কাদের জন্যে মিথ্যে কথা বলতে যাব ? কে আছে আমার ?

—তাহলে কেন বলছ আমি জেলের মেয়ে ? আমার দিদিমা আপন দিদিমা নয় ?

দোলগোবিন্দ বললে, না মা, না—

—প্রমাণ দিতে পার তুমি ?

—সেই প্রমাণ দেব বলেই তো এসেছি মা এখানে।

—দাও, তাহলে প্রমাণ দাও।

দোলগোবিন্দ বললে, একটু দাঁড়ান আপনারা—

বলে কোথায় চলে গেল। তারপর একজন বৃদ্ধ লোককে ডেকে নিয়ে এল। প্রায় নব্বই বছর বয়েস লোকটার। লোকটা এসে সবাইকে প্রণাম করলে। কুঁজো হয়ে গেছে বয়েসের ভারে। ভাল করে চোখেও দেখতে পায় না।

—এই একেই জিজ্ঞেস করুন আপনারা।

দারোগা জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার ?

—হুঁজুর, কালীচরণ মাইতি।

—কোথায় থাক তুমি ?

—হুজুর, কোথায় আর থাকব, এই গেরামেই থাকি।

—তুমি এই দোলগোবিন্দ ঘটককে চেন ?

—খুব চিনি হুঁজুর।

—তুমি এই মহিলাকে চেন ?

—চিনি হুজুর। আমার মা-জননী। আমি কত কোলে-পিঠে করেছি ওনাকে। আমি তো ওনাদেরই ভুঁইদাস ছিলাম, আজ্ঞে। উনি এখন আমাকে আর হয়তো চিনতে পারবেন না, উনি এখন কত বড় লোকের ঘরণী হয়েছেন।

নতুন-বৌ-এর দিকে চেয়ে দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে—আপনি চিনতে পারেন একে ?

নতুন-বৌ বললে, না—

—ঠিক ভাল করে চিনতে চেষ্টা করুন।

কালীচরণ মাইতি বললে, আচ্ছা মা, তোমার মনে পড়ে, এখানে একটা ঘট্‌পেয়ারার গাছ ছিল, তুমি পেয়ারা খেতে চাইতে, আমি পেড়ে দিতাম—

নতুন-বৌ বললে, আমার কিছুই মনে পড়ছে না—

কালীচরণ বললে—তুমি তখন খুব ছোট মা, তোমার কি করে মনে থাকবে ? তোমার বিয়ের সময় আমি এসেছিলাম নেমন্তন্ন খেতে, গোঁসাই-মা আমাকে আসতে খবর দিয়েছিলেন। আমি ওনার দিদিমাকে গোসাঁই-মা বলে ডাকতাম।

—তা তুমি কি এ-বাড়ি ছেড়ে তখন অন্য জায়গায় চাকরি করতে ?

—না, আমাকে গোসাঁই-মা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কালীচরণ, তোর বয়েস হয়েছে, তুই চাটুজ্জেদের সঙ্গে কাশী চলে যা, তোকে আমি খরচ দেব। মা-জননী একটু বড় হতেই আমাকে কাশী পাঠাবার নাম করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গাঁয়ের চাটুজ্জেরা তখন কাশীধামে যাচ্ছিল কি না।

—তারপর ?

—তারপর চাটুজ্জেরা চলে এলেন সব্বাই, আমি সেখানেই রয়ে গেলাম, গোসাঁই-মা আমাকে কাশীধামে থাকতেই চিঠি লিখেছিলেন। আমিও ভাবলাম, বাবা বিশ্বনাথের চরণে পড়ে থাকব চিরকাল—

—তা এখন আবার কাশী থেকে চলে এলে কেন ?

—গোসাঁই-মা মারা যাবার পর আমাকে আর টাকা কে পাঠাবে, তাই যাত্রীদের সঙ্গে আবার গাঁয়ে চলে এলাম—

দারোদাবাবু বললে—তা গোসাঁই-মা তোমাকে কাশীতে পাঠাতে গেলেনই বা কেন ?

কালীচরণ বললে—ওই যে আমি সব জানতাম বলে—

—কি জানতে তুমি ?

—সেই কথা বলতেই তো আমাকে দোলগোবিন্দ এখেনে ডেকে এনেছে হুঁজুর। গোসাঁই-মার তো কেউ ছিল না হুঁজুর। ছেলে মারা গেল, নাতি মারা গেল, বাড়ি একেবারে খাঁ খাঁ করত। থাকবার মধ্যে কেবল ছিলাম আমি আর গোসাঁই-মা। আমি বাড়ির কাজ-কম্ম করি, খাটি-খুটি, আর গোসাঁই-মার সেবা করি। এমন সময় একদিন সকালে গোসাঁই-মা বললে, ওরে কালীচরণ, আজকে একটা ভারি ভাল স্বপ্ন দেখেছি রে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি স্বপ্ন গোসাঁই-মা ?

গোসাঁই-মা বললেন, ওরে কালীচরণ, দেখলাম মা-লক্ষ্মী করলেন কি, ওই পেয়ারা গাছতলাটা দিয়ে আমার বাড়ির দিকে আসছেন। রূপে একেবারে আলো হয়ে গেছে চারদিকটা। আমি প্রথমটায় চিনতে পারি নি। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে মা ? মা-লক্ষ্মী বললেন, আমি কমলা—আমি তোমার ঘর আলো করতে এলাম মা।—আমাকে তুমি রাখতে পারবে ?

আমি বললাম, কেন রাখতে পারব না মা, তুমি যদি আমার ঘরে অচলা হয়ে থাক তো রাখব—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? তারপর কি হল গোসাঁই-মা ?

গোসাঁই-মা বললেন, তারপর মা-লক্ষ্মী আমার কাছে আসতেই আমি কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। কি ফুটফুটে মেয়ে যে কালীচরণ, কি বলব—তারপর মা-লক্ষ্মীকে যেই আবার চুমু খেতে যাব, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—দেখি অন্ধকার ঘরে আমি একা শুয়ে আছি—বুঝলাম স্বপ্ন—

কালীচরণ মাইতি একটু দম নিয়ে তারপর বলতে লাগল, তারপর হুঁজুর, মা-লক্ষ্মীর কি নীলা, আগের দিন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, হঠাৎ পূব-পাড়ার দিক থেকে কে যেন আসছে দেখতে পেলাম—প্রথমে মনে হল তারিণী কলুর বউ নাতনীকে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। কিন্তু তা নয় হুজুর, কাছে আসতেই দেখলাম অন্য মেয়েলোক—

গোসাঁই-মা জিজ্ঞেস করলে—কে গা?

মেয়েলোকটা কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বললে, আমি পরাণে মালোর বউ, ঝড়-বৃষ্টিতে আমার ঘর ভেসে গেছে নদীর জলে, আমাকে থাকতে দাও মা তোমার ঘরে—

তখন আমিও চেয়ে আছি পরাণে মালোর বউটার কোলের মেয়েটার দিকে। গোসাঁই-মাও চেয়ে আছে। গোসাঁই-মা একবার আমার দিকে চাইলে। পরাণে মালোকে আমরা চিনতাম হুজুর। গোসাঁই-মা তো মাছ খেত না, কিন্তু মাছ ধরে গেরস্থ-বাড়িতে বেচে আসত পরাণে মালো, তাইতেই চিনত সবাই তাকে। তা আমি ভাবলাম, এত বাড়ি থাকতে গোসাঁই-মার বাড়িতেই বা এল কেন?

গোসাঁই-মা জিজ্ঞেস করলেন, এ কোলের মেয়েটা কে রে?

পরাণে মালোর বউ বললে, এ মেয়েটাকে কুড়িয়ে পেইছি গোসাঁই-মা—

—কুড়িয়ে পেয়েছিস?

গোসাঁই-মার তখন স্বপ্নের কথাটা হয়তো মনে পড়ে গেল।

পরাণে মালোর বউ-এর কোলের মেয়েটা তখন গোসাঁই-মার কোলে আসবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে। ছট্‌ফট্ করছে। গোসাঁই-মার মনে হল, স্বপ্নে যেন মা-লক্ষ্মী ওই রকম করেই তাঁর দিকে চেয়েছিল।

গোসাঁই-মা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন। চুমু খেলেন।

তারপর বললেন, মেয়েটাকে আমার কাছে রেখে যা বউ, বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে—

মালো-বউ বললে, তা আমাকেও থাকতে দাও না গোঁসাই-মা তোমার বাড়িতে, আমার তো ঘর-সংসার সব গেছে—আমিও থাকি তোমার কাছে—

—কিন্তু এ-মেয়েটা কাদের? খোঁজ নিস নি তুই?

—না গোঁসাই-মা, কেউ খোঁজ করে নি, আমিও খোঁজ নিই নি। আমাদের পাড়ার ক্ষেতের ধারে ভোর রাত্তিরে গেছি বেগুন তুলতে, সেখানেই পেইছি গোঁসাই মা, কাউকে যেন বলো না গোঁসাই মা তুমি। তারপর যখন কেউ-ই আর এতদিনে খোঁজ নিলে না, তখন থেকেই আমার কাছে রয়েছে—তা সেই থেকে আমি আর কারোর কাছে কিছু বলি নি গোঁসাই মা।

—তোদের পাড়ার সবাই জানে?

—আমি বলিছি এটি আমার বোন-ঝি, আমার কাছে আমার বোন মেয়েকে রেখে গেছে।

তা পরাণে মালোর কাছ থেকে গোঁসাই-মা মেয়েটিকে নিলেন সেদিন। সেদিন থেকেই সেই মা লক্ষ্মী রয়ে গেল গোঁসাই-মার কাছে। তারপর যতদিন পরাণে মালো আর তার বউ বেঁচে ছিল, ততদিন গোঁসাই মা তাদের চাল-ডাল-কাপড় দিতেন। তারপর যত দিন যেতে লাগল ততই গোঁসাই-মার অবস্থা ফিরতে লাগল। আরও জমি-জমা হল, আরও টাকা আসতে লাগল হাতে, কোঠা-দালান হল। আমি মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে থাকতাম, গোঁসাই-মাও তখন এই মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন—

তারপর যখন মা-লক্ষ্মীর বয়েস হল তখন এই দোলগোবিন্দ ঘটক একদিন এল গাঁয়ে। বললে, এক পাত্তর আছে, যদি বিয়ে দেন—

আমি বললাম, কিন্তু মা-লক্ষ্মী তো গোঁসাই-মার নিজের নাতনী নয়।

দোলগোবিন্দ বললে, তবে কার?

আমি সব ব্যাপার খুলে বললাম। দোলগোবিন্দ বললে, তা হলে জেলের মেয়ে?

গোঁসাই-মা আমার কথা শুনে রেগে গেলেন। বললেন, তুই কেন এ-সব কথার মধ্যে থাকিস? তুই কেন বলতে গেলি আমার নিজের নাতনী নয়? আমি তো ওর গোত্তর বদলে নিয়েছি, আমি তো ওকে পুরুত ডেকে আমার পুষ্যি করে নিয়েছি, এখন তো আমাদেরই স্বজাত ও—

তবু আমি কিছুতেই মত দিতে পারলাম না।

তখন গোঁসাই-মা রেগে গিয়ে আমাকে চাটুজ্জেদের সঙ্গে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন। আমিও কাশী চলে গেলাম। চাটুজ্জেরা একমাস পরে কাশী থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু আমি রয়ে গেলাম সেখানে। গোঁসাই-মা আমাকে সেখানে টাকা পাঠাতে লাগলেন।

শেষকালে মা-লক্ষ্মীর বিয়ের সময় আমি চলে এলাম সেখান থেকে।

গোঁসাই-মা আমাকে দেখে বললেন, কালীচরণ, তুই যেন কাউকে কিছু বলিস নে আবার, আমার নাতনীর বিয়ের সময় তুই আসতে চেয়েছিলি তাই তোকে খরচ-পত্তর দিয়ে এনেছি, বিয়ের পর তোকে আবার কাশীধামে পাঠিয়ে দেব—

তা দেবে তো দেবে। তা আমারই বা অত কথায় থাকবার দরকারটা কি! আমি মা-লক্ষ্মীর বিয়েতে পেট ভরে লুচি-মোণ্ডা খেলাম, প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম—

এতক্ষণ সকলে হাঁ করে কালীচরণ মাইতির গল্প শুনছিল।

দোলগোবিন্দ ঘটক, দারোগা-পুলিস, দুলাল সা', নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, সবাই।

কালীচরণ মাইতি কথা বলতে বলতে থেমে গেল। নব্বই বছর বয়েসের বুড়ো মানুষ। চোখেও ভাল দেখতে পায় না, কথাও ভাল করে বলতে পারে না। মুখের সব দাঁত পড়ে গেছে। গায়ের সব চামড়া ঝুলে থল থল করছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

কালীচরণ মাইতি বললে, মালো-বৌ প্রেথমে কিছু বলে নি আজ্ঞে, আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে যাবই বা কেন বলুন? মালো-বৌ গোসাঁই-মার কাছে থাকতো আর সংসারের কাজ কর্ম করতো। সত্যিই সে বছরে মালো-পাড়ায় খুব ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল কর্তা। আর নদীটারও যে কি হল, সেই থেকে এ-দিককার পাড় ভাঙতে লাগল আর মামারাকপুরের দিকে ক্ষেত গজিয়ে উঠল। মালো-পাড়াটাই উঠে গেল গাঁ থেকে—

নতুন-বৌ হঠাৎ বললে, তা আমি যে জেলের মেয়ে তার প্রমাণ তো দিতে পারলে না তুমি!

কালীচরণ বললে, আজ্ঞে সেই কথাই তো বলছি মা-জননী! গোসাঁই-মার অবস্থা তো তুমি আসার পর থেকেই ভাল হতে লাগল কি না, তাই গোসাঁই-মা তোমাকে মা-লক্ষ্মীর মত সেবা করতে লাগল। গোসাঁই-মা বলতো, এ মেয়ে আমার মা-লক্ষ্মী রে কালী-চরণ, একে কিছু বলিস নে তুই। তুমি যে তখন কি দুষ্টুই ছিলে মা-জননী। আমাকে কত আঁচড়ে দিয়েছ, কত খাম্‌চে দিয়েছ তার ঠিক নেই। আমি তোমাকে মা-লক্ষ্মী মনে করে বুকে তুলে নিয়েছি। গোসাঁই-মার জন্যে কিছু বলতে পারি নি, বকতে পারি নি।

দারোগাবাবু বললেন, ও-সব কথা থাক, আসল কথাটা বল—কিসে জানতে পারলে ইনি জেলের মেয়ে—

—বলি, দারোগাবাবু। বুড়ো মানুষ তো, তাই সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি নে। একটু ক্ষেমা-ঘেন্না করে নেবেন। সেই মালো-বৌ-এর একদিন অসুখ হল তারপর। অসুখ তো অমন গাঁয়ে কতোই করে, কিন্তু মালো-বৌ-এর সে-অসুখ আর সারল না আজ্ঞে।

—সারল না?

—না আজ্ঞে, সারল না। একদিন মারা গেল আজ্ঞে! আহা, সে-সব দিনের কথা যেন চোখের সামনে ভাসছে আজ্ঞে। মালো-বৌ মারা যাবার আগের দিন আমাকে ডাকলে। বললে, কালীচরণ, আমি তো চললাম, যাবার আগে দুটো কথা বলে যেতাম তোমাকে, না-বললে আর প্রাণটা বেরোচ্ছে না।

আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে বললাম, কি মালো-বৌ?

মালো-বৌ বললে, গোসাঁই-মাকে একবার ডাকো কালীচরণ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কি জন্যে ডাকছ তাঁকে? তিনি তো এখন ঘুমোচ্ছেন।

মালো-বৌ বললে, গোসাঁই-মাকে না বলে যে আমি যেতে পারছি নে কালীচরণ। আমার পাপের বোঝা যে আর লাঘব হচ্ছে না।

তা কি আর করব। গোসাঁই-মাকে ডেকে নিয়ে এলাম সেই অত রাত্তিরে। গোসাঁই-মা সারাদিন খেটে-খুটে ঘুমোচ্ছে তখন অঘোরে।

আমার ডাকাডাকিতে উঠে বললে, কি রে? ডাকছিস্ কেন?

বললাম, মালো-বৌ মর-মর, তোমাকে একবার ডাকছে।

গোসাঁই-মা এল মালো-বৌ-এর কাছে। মালো-বৌ-এর মুখের কাছে মুখ আনতেই মালো-বৌ কি যেন বললে গোসাঁই-মাকে।

গোসাঁই-মা আমার দিকে চেয়ে বললে, কালীচরণ, যা তো, হারাধন কবিরাজ-মশাইকে একবার গিয়ে ডেকে আন তো, বলবি গোঁসাই-মা ডাকতে পাঠিয়েছে, একেবারে মকরধ্বজ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলবি—

গোসাঁই-মার কথা শুনে আমি তো দৌড়ে হারাধন কবিরাজ মশাইকে ডাকতে গেলাম আজ্ঞে, কিন্তু কবিরাজ মশাই যখন এলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মালো-বৌ তখন এ-পারের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে। তারপর আর কি! সব শেষ!

কিন্তু তখনও জানি আজ্ঞে মালো-বৌ যা বলেছে তাই-ই সত্যি।

আমি একদিন গোসাঁই-মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মালো-বৌ কি কথা বলে গেল তোমাকে গোসাঁই-মা? মরবার আগে কি কথা বলতে তোমায় ডেকেছিল?

অনেক পীড়াপীড়ির পর গোসাঁই-মা বলেছিল, মালো-বৌ বলেছিল এই মা-জননী ওর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে নয়, ওর জ্ঞাতি কেষ্টগঞ্জের বসন্ত মালো, সেই বসন্ত মালোর ছেলে সত্য মালোর নিজের মেয়ে এ। পাছে জেলের মেয়ে বললে আমরা ঘরে ঠাঁই না দিই তাই মালো-বৌ বলেছিল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—

আমি গোসাঁই-মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা সত্য মালো নিজের মেয়েকে মালো-বৌএর কাছে ফেলে দিয়ে গেলই বা কেন?

গোসাঁই-মা বললে, সত্য মালোর বৌ মারা গিয়েছিল এই মেয়েটাকে সভ্য বিইয়ে, তাকে দেখবার তখন আর কেউই নেই, সত্য-মালো তখন ওদিকে আবার চাকরিও পেয়েছে হাওড়ার পাট-কলে, কোথায় রাখে মা-মরা মেয়েকে? তাই মালো-বৌ-এর কাছে রেখে গিয়েছিল—

সবই আজ্ঞে ভাগ্যের লিখন বাবুমশাই। আমি চাকর-মনিষ্যি, আমাকে যা বললে গোসাঁই-মা, আমি তাই-ই বিশ্বাস করলাম।

তারপর একদিন এই দোলগোবিন্দ ঘটকমশাই সম্বন্ধ আনলে বিয়ের। বিয়ে হয়ে গেল চুপি-চুপি। কেউ কিছু জানতে পারলে না। আমি আগেই কাশীধামে চলে গিয়েছিলাম হুজুর। বিয়ের সময় দুদিনের জন্যে এসে আবার চলে গেলাম। তারপর আজ্ঞে এই আপনারা এসেছেন। এতদিন পরে আপনারা এলেন বলে আমার মা-জননীকে তবু একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম।

বলে কালীচরণ থামল।

দারোগাবাবু যা লেখবার লিখে নিলেন।

দুলাল সা', নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, দোলগোবিন্দ, সবাই আবার কেষ্টগঞ্জের দিকে ফিরল।

দোলগোবিন্দ ঘটক আসবার সময় কেঁদে ফেললে হাউ হাউ করে।

বললে, আমিই এই সব্বোনাশ করেছি সা'মশাই, ভগবানও তার জন্যে আমায় শাস্তি দিয়েছেন, এবার আপনারা আমায় শাস্তি দিন হুজুর—আমি সব শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছি—

বলে সত্যি-সত্যিই দোলগোবিন্দ সেইখানে সেই রাস্তার মধ্যেই মাথা পেতে দিলে।

আজও কেষ্টগঞ্জে গেলে দেখতে পাবে 'দি ইণ্ডিয়া সুগার মিল লিমিটেডে'র অফিসের সামনে তিনটে বড় বড় স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে। তিনটেই পাথরের। শ্বেতপাথর। মধ্যেখানে কর্তামশাই-এর মূর্তি। কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্যের। দুপাশে আর দুজন। একপাশে দুলাল সা'র, আর একপাশে নিতাই বসাকের।

তিনটেই নতুন-বৌ-এর তৈরি করানো। তিনটি মূর্তির নীচেই তাঁদের নাম-ধাম-পরিচয় লেখা আছে কালো অক্ষরে।

কেষ্টগঞ্জের সে চেহারাও আর নেই। এখন রাস্তা-ঘাট-ইলেকৃট্রিক লাইট সব কিছু মিলে এ একেবারে অন্য জায়গা।

বড়-চাতরা থেকে এসে সেদিন তুলাল সা'র বাড়িতে সে এক থম্‌থমে ভাব ছিল ক'দিন ধরে। তুলাল সা', নিতাই বসাক, নতুন-বৌ যেন সবাই অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল তখন। এমন হবে যেন ভাবতে পারা যায় নি।

নতুন-বৌ সেই দিনই চলে যেতে চেয়েছিল বাড়ি থেকে।

বলেছিল, আমি আর এ-বাড়িতে জলস্পর্শ করব না বাবা, আমাকে আপনি মুক্তি দিন—

নিতাই বসাক বলেছিল, তা কি করে হয়? তুমি যাবে কোথায় নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ বলেছিল, যেখানেই যাই, এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার আমার আর নেই—

বিজয় অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল।

বললে, তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আমাকেও তোমার সঙ্গে চলে যেতে হয়—

—তুমি যাবে কেন? যেতে হলে একলা আমিই চলে যাব। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না—

তুলাল সা' কিছুই বলে নি। শুধু হরিনামের মালাটা নিয়ে ঘন ঘন জপ করতে শুরু করেছিল।

বলেছিল, সংসারে সবই মিথ্যে গো, একমাত্র হরিনামই সত্যি—পাপী-তাপীদের তরাতে হরিই একমাত্র ভরসা—

কিন্তু আশ্চর্য, হরিই শেষ পর্যন্ত যে একমাত্র ভরসা তারও প্রমাণ

পাওয়া গিয়েছিল। দুদিন পরেই দারোগা-পুলিস সবাই আবার এসে হাজির হয়েছিল কেষ্টগঞ্জের বাড়িতে।

এসেই দারোগাবাবু বললেন, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে সা'মশাই—

দুলাল সা' মালা জপতে জপতেই মুখে বললে, কি রকম?

দারোগাবাবু বললেন, এই কাকে এনেছি দেখুন—

—এ কে?

—এই হচ্ছে সত্য মালো, হাওড়ার জুট মিলে কাজ করত—এ সব জানে।

—কি জানে?

দারোগাবাবু বললে, সবই বলবে, তার আগে সবাইকে ডাকুন এখানে, আপনার নতুন-বৌমাকেও ডাকুন, নিতাইবাবুকেও ডাকুন, আপনার ছেলে বিজয়বাবুকেও ডাকুন—

দুলাল সা' কান্তকে বললে, ডাক তো সবাইকে কান্ত—

কান্ত ভেতরে চলে গেল।

শ্রীদাম অপেরা যেখানেই যায় সেখানেই 'রাণী রূপকুমারী' দেখতে রাজ্যের লোক সে-যাত্রা দেখতে ভেঙে পড়ে। চণ্ডীবাবুর 'শ্রীমানী অপেরা'র নাম আর কেউ করে না। সে দল ভেঙে গেছে। সে চণ্ডীবাবুও মারা গেছে। তার জায়গায় 'শ্রীদাম অপেরা' এখন বাজার গরম করছে। 'রাণী রূপকুমারী' আরাকান-রাজের মেয়ে। আরাকান রাজ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজ্যের ভেতরে বিদ্রোহ চলছে। সঙ্গে 'রাণী রূপকুমারী' আর মেয়ে বহ্নিবালা। কুমারী মেয়ে। পথ হারিয়ে তারা তিনজনে তিন দিকে চলে গেছে। খুব জমাটি নাটক। অঞ্জনা এসে এখন পালাটা আবার আরও জমিয়ে দিয়েছে। একবার শুনতে আরম্ভ করলে শেষ দেখে উঠতে হবে। দর্শকদের নট্-নড়ন-চড়ন অবস্থা। অঞ্জনার পাট দেখতে লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আসরে।

চণ্ডীবাবুর কাছে গিয়ে বঙ্কুবিহারী সেদিন খুবই তম্বি করেছিল।

সব লোক চিৎকার শুনে হৈ-হৈ করে এসে ঢুকে পড়েছিল সেই শ্রীমানী অপেরার চিৎপুরের অফিসে।

বঙ্কুরও তখন মাথা-গরমের অবস্থা। মাথা-গরমের অবস্থা না হয়ে উপায়ই বা কি!

—তা ওকে মারলে কেন তুমি?

—মারব না? অধিকারীমশাই মিথ্যে কথা বললে কেন?

—মিথ্যে কথা? মিথ্যে কথা আবার কখন বলতে গেল?

—ও কেন বলতে গেল অঞ্জনা হল আসলে হরতন। অঞ্জনা তো হরতন নয়।

—সে কি?

চণ্ডীবাবু তখন খানিকটা সামলে নিয়েছে বোধহয়। চোখ-নাক ফুলে গেছে বঙ্কুর ঘুঁষির চোটে।

বললে, আমি কি আর সাধ করে মিছে কথা বলতে গেছি। দেখলাম ভদ্রলোক নাতনী নাতনী করে পাগল হয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওদিকে আমার অঞ্জনারও তখন রাজরোগ হয়েছে। আমার দলেরও ক্ষতি হচ্ছে, ভাল মত চিকিৎসে করতে পারছি নে। দামী দামী ওষুধ-পথ্যি কে খাওয়াবে, কার অত পয়সা আছে? আমি ভাবলাম, কর্তামশাই-এর কি আর এমন লোকসান হবে, অথচ মশাই মেয়েটার লাভ! মিছে কথা বললে যদি মেয়েটার

চিকিৎসা হয় তো হোক না—! তা কি এমন অন্যায়টা করেছি আমি শুনি ?

—তা বলে একজন ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দেবেন ? অতগুলো টাকা দেনা করিয়ে দেবেন ? বুড়োমানুষের কি মনে শান্তি ছিল এতদিন ? তিনি যে দেনা করে করে ওই অঞ্জনাকে সারিয়ে তুললেন, এতে অঞ্জনার না হয় উপকার হল, কিন্তু তিনি যে এতগুলো টাকার দেনা বিধবা স্ত্রীর ওপর রেখে মারা গেলেন, এ শোধ করবে কে ? এ শোধ হবে ক'বছরে ?

তা এ-সব যুক্তি তখন শুনবেই বা কে আর বুঝবেই বা কে। তখন কারোর অত সময়ই নেই, চণ্ডীবাবুরও সে-সব শুনতে তখন আর ভাল লাগছে না।

কিন্তু কেষ্টগঞ্জে আসতেই আর এক কাণ্ড ঘটল।

কর্তামশাই-এর বাড়ির সামনে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। দুলাল সা' এসেছে, নিতাই বসাক এসেছে, সুকান্ত রায় এসেছে, বিজয় এসেছে, নতুন-বৌও এসেছে। আর এসেছে পুলিসের দারোগা। আর সঙ্গে একজন লোক।

—ও লোকটা কে ?

—ওরই নাম তো সত্য মালো।

দারোগাবাবু বললে— এই হচ্ছে সত্য মালো, এর কাছে আপনি সব শুনতে পাবেন মা, এই-ই আপনার নাতনী হরতনকে পেয়েছিল—

সামনে বসে ছিল বড়গিন্নী। তার চোখের জল তখনও শুকোয় নি। চিরকালই কম কথার লোক, কিন্তু সেদিন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল চিরকালের মত।

—বল সত্য, বল তুমি। বড়গিন্নীকে বল সব কথা।

সেদিন সত্য মালো যা বলেছিল তার অভাবনীয়তাটা যেন নাটকের মত শোনাবে। তবু সমস্তই সত্যি। গড়-গড় করে সে সব

বলে গেল। যারা শুনেছিল তারাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। এমনও হয় নাকি এ-যুগে ?

সত্য মালো বলেছিল— সবই আমার দোষ গিন্নী-মা, আমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী— সেদিন শ্মশানে আমিই একা ছিলাম, আর সবাই ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ক'দিন আগে আমার বউ-এর একটা মেয়ে মারা যায়। সেই মেয়ে মারা যাবার পর থেকেই আমার বউ-এর পাগলের মত অবস্থা চলছিল। আমিও হরতনকে সেই অবস্থায় শ্মশানে ফেলে রেখে একবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। বউটাকে দেখে আবার শ্মশানে এসেছি। তখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে একটু। কাছে গিয়ে দেখি অবাক্ কাণ্ড। দেখি হরতন যেন একটু নড়ছে। কেমন চম্‌কে উঠলাম। বেঁচে উঠল নাকি তবে ? বুকে হাত দিয়ে দেখলাম ধুক-ধুক করছে। আমি তাড়াতাড়ি করলাম কি একটা মতলব ঠাওরালাম। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আগুনের সেঁক দিলাম। যদি বাঁচে মেয়েটা। বউও দেখলাম খুব সেবা করতে লাগল।

আমার বউ জিজ্ঞেস করলে, এ কে গো ?

বললাম— কর্তামশাইয়ের নাতনী—

তারপর দু-তিন দিন কেটে গেল গিন্নী-মা, সেই ভাবেই। মেয়েটাও সুস্থ হয়ে উঠল, বউও যেন একটু ভালর দিকে গেল। মেয়েটাকে পেয়ে আর কোল থেকে নামাতেই চায় না।

—তারপর ?

সবাই হাঁ করে শুনছিল সত্য মালোর গল্প।

বললে—তারপর কি করলে ?

—তারপর, আজ্ঞে, সব বলছি। সবই বলব আপনাদের। পাড়ার আমাদের কেউ তখনও টের পায় নি তো, কেউই জানত না।

শেষকালে জানাজানি হয়ে গেলে তো কর্তামশাই তার নাতনীকে নিয়ে যাবে, আমার বউও আবার পাগল হয়ে যাবে হয়তো, তাই কাউকে আর জানালাম না কথাটা। কর্তামশাই-এর নাতনীকে নিয়ে একদিন রাতারাতি কেষ্টগঞ্জ ছেড়ে মোহনপুরে চলে গেলাম। সবাইকে বললাম, এ আমার নিজের মেয়ে—

কিন্তু ভগবানের মার কে খণ্ডাবে বলুন!

সে-বউও আমার একদিন মারা গেল গিন্নী-মা। যার জন্যে পরের নাতনীকে নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে দিলাম, সেই বউও শেষকালে রইল না।

শেষে কোথায় রাখি হরতনকে? আমার এক জ্ঞাতিবোন ছিল বর্ধমান জেলার বড়-চাত্‌রাতে। তার বাড়িতেই গিয়ে রেখে দিয়ে এলাম তাকে। বলে এলাম, কাউকে যেন না বলে দেয়। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আর তারপর হাওড়ার জুট-মিলে চাকরি করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে আবার একটা বিয়ে করলাম নতুন করে। আবার আমার ছেলে হল—নিকুঞ্জই সেই ছেলে। এখন আমার বয়েস হয়েছে, সব পাপ আপনার কাছে বলে গেলাম গিন্নী-মা। এখন দারোগাবাবু আমার কাছে গিয়ে যখন সব কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন আর কিছু গোপন রাখতে পারলাম না। এখন আমাকে যা দণ্ড দেবেন দিন—আমি মাথা পেতে নেব।

দণ্ড কে-ই বা দেয় আর কে-ই বা নেয়। এই সংসারের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তাকে যদি কেউ দেখতে পেত তো হয়ত তার সঙ্গে মোকাবিলা করতো একদিন। কিন্তু মজা এই যে, সেই কর্তাকে কোনওদিন দেখা যাবে না। আর দেখা যাবে না বলেই কোনওদিন এর মোকাবিলাও হবে না। মোকাবিলা হলে হয়ত এ-গল্প অন্য রকম করে শেষ হতো। অঞ্জনাই হয়ত আসল হরতন হতো,

কর্তামশাই হয়ত আবার ঐশ্বর্যবান হয়ে কেষ্টগঞ্জের হর্তা-কর্তা হয়ে বসতেন, আর তুলাল সা'ও হয়ত পুলিশের হাতকড়া পরে জেল-খানার ভেতরেই পচতো।

কিন্তু তেমন করে শেষ হলো না। আপনি আমি যেমন ভাবে সব জিনিষের শেষ দেখতে পেয়ে খুশী হই, তেমনি করে শেষ করতে পারলাম না এ-গল্প। কর্তামশাই নেই, তুলাল সা নেই, নিতাই বসাক নেই, নিবারণ সরকারও নেই। শুধু ব্লক্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার হয়ে আছে সুকান্ত রায়। আর আছে তুলাল সা'র ছেলে বিজয় সা আর নতুন-বৌ। নতুন-বৌ-ই কর্তামশাই-এর অত বড় বাড়িটার তখন মালিক। কোথা থেকে এই বংশের মেয়ে একদিন হারিয়ে গিয়ে আবার একদিন ঘটনাচক্রে ফিরে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে সমস্ত গল্পের মোড় ফিরিয়ে দিলে।

চলে যাবার দিন নতুন-বৌ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন চলে যাচ্ছো? আমি তো তোমাকে চলে যেতে বলিনি ভাই! তুমি থাকো না—

অঞ্জনা বলেছিল—আমি যাত্রাদলের মেয়ে, আমাদের কি ঘরে থাকতে ভালো লাগে?

নতুন-বৌ বলেছিল—যাত্রাদলের মেয়ে হলেও মেয়েমানুষ তো! মেয়েমানুষের সংসার করতে ভালো লাগে না, তা কি কখনও হয়?

অঞ্জনা বলেছিল—সংসারে কিছুদিন বাস করে তো দেখলাম সংসার কী জিনিষ। এর পর আর আমাকে সংসার করতে বোল না ভাই তুমি!

—কেন? সংসার কী দোষ করলো?

অঞ্জনা বলেছিল—আমরা যাত্রাদলের সংসার করা দেখেছি তাই বলছি, সে এর চেয়ে ঢের ভালো।

—তুমি আমার ওপর রাগ করে ওই কথা বলছো।

অঞ্জনা বলেছিল—না ভাই রাগ করিনি। সত্যি বলছি সে-সংসার আমার অনেক ভালো। সেখানে পিটুলি-গোলা জলকে আমরা দুধ বলে খাই বটে কিন্তু তা খেয়ে এত গুণোগার দিতে হয় না।

নতুন-বৌ খোঁটাটা বুঝলো। বললে—কিন্তু তার জন্যে তো আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে তৈরি আছি ভাই। অমন করে তুমি কথা শোনাচ্ছো কেন? আমি তো বলছি তুমি এখানে থাকো—

অঞ্জনা হেসে জড়িয়ে ধরলো নতুন-বৌকে।

বললে—তুমি আমার কথায় রাগ করছো কেন বলো তো? আমি কি তাই বলেছি?

নতুন-বৌ বলেছিল—তা রাগ যে করোনি তার প্রমাণ দিয়ে যাও—

—কী করে প্রমাণ দেব?

—একদিন এখানে যাত্রা-গান গেয়ে। বলো একদিন সময় করে এসে এই উঠোনে যাত্রা-গান গাইবে?

—এই কথা? বেশ তাই হবে!

—কিন্তু কথা দাও কোনওদিন স্বপ্নেও ভাববে না আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

অঞ্জনা বললে—ওমা, তা কেন ভাবতে যাবো? আমি তো নিজের থেকেই চলে যাচ্ছি। আমি কি তবে এতক্ষণ তোমাকে সব মিথ্যে কথা বললুম? সত্যি বলছি ভাই বিশ্বাস করো ওই যে দাদু মারা গেল, আমাদের যাত্রাদলের সংসারে অমন হয় না। সেখানে যাত্রার আসরে রাজা-রাণীরা মরে যায় বটে কিন্তু সাজ-ঘরে গিয়ে আবার তারা বেঁচে ওঠে। তোমাদের সংসারে কিন্তু নিয়ম-কানুন সব আলাদা। এ আমার ভালো লাগছে না ভাই—আমি চলি—

তারপরে যেতে গিয়েও আবার থামলো। থেমে বললে—আমাদের সে-সংসারে রাম-রাবণে যুদ্ধ হলে রামই বাঁচে, রাবণ বাঁচে না। কিন্তু তোমাদের এখানে সবই উল্টো ভাই, সবই এলোমেলো—

বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। পেছনে পেছনে বঙ্কুও গিয়ে উঠে বসলো।

তারপর গাঁয়ের সব লোকের চোখের সামনে দিয়ে তাদের গাড়িটা কেষ্টগঞ্জের রাস্তা ধরে সোজা সামনের দিকে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ তাদের ডেকে থামালো না, কেউ তাদের পিছু ডাকলে না, কেউ তাদের চলে যেতে বারণও করলে না। সংসারের ঘটনাচক্র দেখে তারা সবাই যেন তখন নির্বাক নিস্তব্ধ নিঃঝুম হয়ে গেছে।

তা এখনকার কেষ্টগঞ্জ আর সে কেষ্টগঞ্জ নেই, সে তো আগেই বলেছি। এখন দুলাল সা'র বাড়ি থেকে কর্তামশাই-এর বাড়ি পুরো এলাকাটা একটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্তটাই একটা বিরাট বাড়ি হয়ে গেছে একেবারে।

সেখানে একদিন যাত্রাও করে গেছে 'শ্রীদাম অপেরা'। বঙ্কু এসেছিল, অঞ্জনাও এসেছিল। সেই কর্তামশাই-এর বাড়ির সামনের উঠোনেই অঞ্জনা 'রাণী রূপকুমারী'র পার্ট করেছিল। আসরে গিয়ে সুর করে করে বলেছিল—

কোথা যাবো, কোথা যাবো অবলা রমণী
কে আছে আমার
কার কাছে মাগিব আশ্রয় বল অন্তর্যামী !

লোকে সে অভিনয় দেখে চোখের জল আটকাতে পারে নি। আর তার পরেই সখীর দল এসে গান গেয়ে আসর মাৎ করে দিয়েছিল—

পবনের পাল্‌কি চড়ে স্বর্গে যাব
ও হো হো হোঃ—

কিন্তু আশ্চর্য, এই কেষ্টগঞ্জের নামও একদিন বদলে গিয়ে দুলালগঞ্জ হয়ে গেল। কলকাতার কোন্‌ মিনিস্টার এসে আবার সেই নাম পরিবর্তনের উৎসব অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে গেলেন। সে-খবর সে-অনুষ্ঠানের ছবি সাড়ম্বরে খবরের কাগজের পাতায় ছাপাও হলো। তার পেছনে কার কত হাজার টাকা খরচ হলো তা গোপনই রইল। শুধু দুলাল সা যে কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন তার সবিস্তার কাহিনী প্রচারের কোনও ত্রুটি রাখা হলো না। সবাই নতুন করে জানলো দুলাল সা দরিদ্রের বান্ধব, অগতির আশ্রয় আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। ষ্টেশনের নাম দুলাল সা'র নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে তাই সেই মহাপুরুষকেই প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা কায়েম করা হলো। জয়, মহাপুরুষ দুলাল সা'র জয় !!!

আর জীবন যেমন কারও সুখ-দুঃখের পরোয়া করে চলে না, ইতিহাসও তেমনি কারও ভাল-মন্দের দিকে চেয়ে নিজের গতি নির্ধারণ করে না। সে নির্মম নিষ্ঠুর নির্বিকার। আজকের দুলালগঞ্জের মানুষ যখন ভোর বেলা সুগার মিলে কাজ করতে যায়, যখন দুলাল সা'র বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে ডিউটি করতে যায়, তখন জানতেও পারে না এই দুলালগঞ্জের বাইরের বৈভবের পেছনে আরও অনেকের হাসি-কান্না-দুঃখ-আনন্দ জড়িয়ে আছে। আর তা এমনি করেই চিরকাল জড়িয়ে থাকবে। শুধু ইতিহাসের পাতা-বদলের

মত তার ওপর একটার পর একটা প্রলেপ পড়ে পড়ে একদিন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেদিন আবার যারা আসবে তাদেরও হাসি-কান্না-দুঃখ-আনন্দ দিয়ে আবার অন্য উপন্যাস লেখা হবে। এই যাওয়া-আসা নিয়েই হয়তো মহাকাল তার নিজের বিচিত্র খেয়াল পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু কেন করে তা কেউ জানে না। আমি আপনি কেউই জানি না। জানতে চেষ্টা করলেও জানতে পারবো না। শুধু যা দেখবো তা নিয়ে কাব্য উপন্যাস লিখে জলের দাগ কেটে যাব কাগজের পাতায়। কারণ এরই নাম যে সংসার !

॥ শেষ ॥